কিন্নর দেশে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন







মহাপণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু রাহুল
(৯.৪.১৮৯৩ - ১৪.৪.১৯৬৩)

কিন্নর দেশে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ
প্রসূন মিত্র

ভূমিকা ও সম্পাদনা
যতীন সরকার


রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা)

ISBN : 978-984-8928-31-8

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

প্রকাশক : মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১১-৭৩৮১৯২, কম্পিউটার কম্পোজ : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১৯৩৪-৫৫২৯৫৬
প্রাপ্তিস্থান : বাতিঘর চট্টগ্রাম, বইবাজার নীরক্ষেত ঢাকা
পরিবেশক : স্বরবৃত্ত প্রকাশন

প্রচ্ছদ : অরুপ মান্দী

সম্পাদকের ভূমিকা

[illegible] সাংকৃত্যায়ন নামে আজ যিনি সর্বজন-পরিচিত, তাঁর পরিবার-প্রদত্ত নাম ছিল [illegible]নাথ পাণ্ডে। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ও মাতা কুলবন্তী দেবী।

[illegible] সালের ৯ এপ্রিল উত্তর প্রদেশের পন্দাহা জেলায় আজমগড় গ্রামে [illegible] বাড়িতে তাঁর জন্ম। মায়ের সঙ্গে মাতামহ রামশরণ পাণ্ডের অভিভাবকত্বেই [illegible] হয়েছে কেদারনাথ পাণ্ডের বাল্যজীবন। বাল্যেই মাতামহের কাছে তিনি [illegible] শেখেন, এবং উর্দুতেই কেদারনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শুধু উর্দুভাষা [illegible], মাতামহের কাছ থেকেই তিনি নানা দেশ ভ্রমণের প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর [illegible] এক সময়ে সৈন্যদলে কাজ করতেন। মাতামহের সৈনিকজীবনের নানা [illegible] গল্প ও বিভিন্ন দেশ দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে একান্ত বাল্য [illegible] কেদারনাথ রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে ওঠেন। দশ বছর বয়সেই (১৯০৭ [illegible]) বাড়ি থেকে পালিয়ে কাশীতে চলে আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ফিরেও যান। [illegible] সেই বছরেই কলকাতায় এসে রেলে কিছুদিন মার্কাম্যানের কাজ করার পর এক [illegible] খাতা লেখার কাজ নেন। সেই সঙ্গেই তিনি ইংরেজিভাষা শিখতে থাকেন। শুধু [illegible] নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তিনি [illegible] অনেক ভাষা শিখে ফেলেন ও সে-সব ভাষার ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের মণিরত্ন [illegible] করে আনেন স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত এই মানুষটি।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সন্তোষী নাম্নী এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। [illegible] বিয়ে তিনি মেনে নিতে পারেননি, সারা জীবন সন্তোষীর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক [illegible]। এর পর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি লোলা নাম্নী এক বিদুষী মহিলাকে বিবাহ [illegible], এবং এক পুত্রসন্তানের জনক হন। কিন্তু রাহুল রাশিয়া ছেড়ে ভারতে চলে এলে [illegible] রাহুলের সাথে আসতে রাজি হননি। এরও অনেক পরে— ১৯৫০ সালে— তিনি [illegible] বিবাহ করেন নেপালি মহিলা কমলা পেরিয়ারকে।

দুই

[illegible] প্রথম যৌবনে রাহুল ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মচর্চায় মনোযোগী। তাঁর [illegible] বিশ্বাস ও ধর্মাচরণে কখনো অন্ধতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। যুক্তিশীলতা ছিল তাঁর [illegible] মানস-বৈশিষ্ট্য। সেই মানস-বৈশিষ্ট্যের দরুনই বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির [illegible] যাচাই করে নিতে নিতে এক সময় ঈশ্বর ও ধর্মের নির্মোক পরিত্যাগ করে [illegible] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী।

বিশ বছর বয়সে—১৯১৩ সালে—ছাপরা জেলার পরসা মঠের মহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় বাবাজি রামোদার দাস। মহান্তের মৃত্যুর পর তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে লক্ষ লক্ষ টাকা ভোগের সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভোগসুখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই অনায়াসে তিনি মহান্তের গদি ছেড়ে দেন। এ-সময় তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং বেদ-অনুসারী আর্যসমাজের ভাবধারাকে সত্য বলে মেনে কিছুদিনের জন্য আর্যসমাজী হয়ে যান। আর্যসমাজে অবস্থান করেই গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি উপলব্ধি করেন যে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত সত্যের ধারক। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নাম ধারণ করেন। আজীবন এই নামটি তিনি পরিত্যাগ করেন নি, এবং এ-নামেই হন স্বনামধন্য ও বিশ্বনন্দিত।

বৌদ্ধ দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পরই তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং মার্কসবাদকেই গ্রহণ করেন তাঁর জীবনদর্শন রূপে। আমৃত্যু সেই দর্শনের তিনি অনুসারী ছিলেন, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জীবন ও জগতের সকল কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়,—

> "আমি কোনো এক সময় বৈরাগী ছিলাম, পরে আর্যসমাজী হয়েছিলাম, বৌদ্ধ ভিক্ষুও হই, আবার বুদ্ধের ওপর অপার শ্রদ্ধা রেখেও মার্কসের শিষ্য হয়েছি।"

মার্কসের শিষ্য ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়েও বুদ্ধের শিষ্যত্ব তিনি পরিত্যাগ করেন নি কেন তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। কয়েকবার তিব্বত অভিযান করে তিনি যে-সব হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন, সে-সবের মধ্যেই ছিল বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার ধর্মকীর্তির 'প্রমাণ বার্তিক' গ্রন্থটি। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে—

> "বেদকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা, কাউকে (ঈশ্বর) কর্তা বলে মানা, গঙ্গাদিতে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করা, উচ্চনীচ জাতির অভিমান করা, পাপ বিনষ্ট করার জন্য সন্তাপ—এই পাঁচটি বুদ্ধিহীন মূঢ়তার লক্ষণ।"

ধর্মকীর্তির গ্রন্থে প্রাপ্ত বুদ্ধের এই মতবাদ রাহুলের চৈতন্যকে তীষণভাবে আলোড়িত করে। আবার বৌদ্ধদর্শন পাঠ করেই উপলব্ধি করেন যে বুদ্ধ তাঁর সকল মতবাদকে চূড়ান্ত বা চিরকালীন বলে নিজেও গ্রহণ করেননি এবং অন্যকেও তেমন করার উপদেশ দেন নি। তিনি সকলকে 'আত্মদীপ' হওয়ার—অর্থাৎ নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেওয়ার— পরামর্শ দিয়েছেন। বুদ্ধের এই বক্তব্যও রাহুলকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে, এবং এক সময় মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে তিনি খুঁজে পান বৌদ্ধের দর্শনের ধারাবাহিকতার পরিচয়। 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে রাহুল বলেন,—

> "বুদ্ধ ছিলেন কালবাদী—দেশ, কাল, ব্যক্তি দেখে তিনি তাঁর সম্পদ দান করতেন, বাতাসে তলোয়ার চালনা পছন্দ করতেন না তিনি। বুদ্ধের এই নগণ্য শিষ্য রাহুলেরও নীতি তাই। বুদ্ধের শিষ্যত্বের যে অধিকার সেটা আমি ছেড়ে দিইনি। বুদ্ধ বলেছিলেন, 'আমার উপদেশিত ধর্ম নৌকার মতো, পারে পৌছানোর জন্যে, ঘাড়ে

করে বয়ে চলার জন্য নয়' (মজ্‌ঝিম নিকায়)। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেই আমি ক্ষণিক (দ্বন্দ্বমূলক) অনাত্মবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে এসে পৌঁছেছি।"

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীরা যেমন আত্মার অবিনাশিতায় বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ তেমনটি করতেন না। তাই তাঁর মতবাদের অভিধা 'ক্ষণিক অনাত্মবাদ'। কোনো কিছুই নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়, সব কিছুরই ক্ষণে ক্ষণে বদল ঘটে। এই বদল ঘটার দর্শনই প্রতীত্যসমুৎপাদ। বুদ্ধ তাঁর ধম্মপদে এই ক্ষণিক অনাত্মবাদ তথা প্রতীত্য-সমুৎপাদের দর্শনকে বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে,—

> "ভিক্ষুগণ, সবকিছু যা জীবিত থাকে তা মারা যায় বলে জানবে। প্রত্যেক কিছুর একটি কারণ আছে; যে বস্তু স্থায়ীভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাস্তবে এটা অস্থায়ী। তারা অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যাবে। গৌরবের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকলেও তার শেষ আছে। ঐক্য থাকলে বিচ্ছেদও আছে। যেখানে জীবন আছে সেখানে মৃত্যুও আছে।"

'কার্যকারণের নিয়মকে বিশ্ববিকাশের মূল হিসেবে চিহ্নিত করার ভারতীয় ধারার বড় মাপের বিকাশ'ই ঘটেছিল বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদে। রাহুল এ-দর্শনটির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সেই সীমাবদ্ধতাই তিনি নিরাকৃত হতে দেখলেন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনের নৌকা বা ভেলায় চড়ে তিনি মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলেই নিজেকে যুগপৎ বুদ্ধ ও মার্কসের শিষ্য বলে পরিচিত করেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান অর্জনে রাহুল বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ শাস্ত্রপীঠ 'বিদ্যালংকার পরিবেণ' থেকে। ১৯২৭ সালের ১৬মে থেকে ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর বিদ্যালংকার পরিবেণে অবস্থান করে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ও মূল পালি ভাষায় ত্রিপিটক শাস্ত্র ও অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালংকার পরিবেণ থেকে তিনি 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি পান, এবং কাশীর পাণ্ডিতসমাজ কর্তৃক ভূষিত হন 'মহাপণ্ডিত' উপাধিতে।

১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮— এই তিনবার তিনি তিব্বতে যান, সেখান থেকে তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেখক ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার লিখেছেন,—

> "রাহুলের বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতে লুপ্ত বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য সম্পদগুলিকে তিব্বত থেকে পুনরুদ্ধার এবং বিদ্বৎ সমাজের সামনে তুলে ধরা। এই কীর্তি তাঁকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দান করে।...নাগার্জুন, অসংগ, বসুবন্ধু, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি প্রমুখ বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের লুপ্ত মূলগ্রন্থ তিনি আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত আকারে পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁরই। রাহুলের তিব্বত অভিযান ছিল যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি রোমাঞ্চকর।...সংগৃহীত পুঁথিগুলি বহনের জন্য ২২টি ঘোড়া ও খচ্চরের প্রয়োজন হয়। সেই বিশাল সংগ্রহের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। সেগুলি পাটনা যাদুঘরে বিহার রিসার্চ সোসাইটির ও বিদ্যালঙ্কার মঠের গ্রন্থাগারে পড়ে আছে।"

প্রখ্যাত বৌদ্ধদর্শন-বিশারদ শ্চেরবাটস্কেইর আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালে রাহুল রাশিয়ায় যান, এবং ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে রাশিয়ায় গিয়ে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাহুল ও শ্চেরবাটস্কেই— এই দুই জ্ঞানব্রতী বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে উভয়েই যথেষ্ট সমৃদ্ধ হন, এবং উভয়ের প্রযত্নে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বের উন্মোচন ঘটে।

রাহুল শুধু পৃথিবী পরিব্রাজকই ছিলেন না, বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যে পরিব্রাজনাতেও ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিরলস।

তিন

রাহুল তাঁর অধীত জ্ঞান ও উপলব্ধিকে লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না-দিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতেন না। এর জন্যই তিনি প্রতিনিয়ত লিখে চলেছেন। প্রায় দেড়শত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রকৃতি ছিল একান্তই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ-ব্যাপারে গোপাল হালদার জানিয়েছেন,—

> তিনি একসঙ্গে চার পাঁচটা বই লিখেছেন। চার পাঁচজন লোককে বসিয়ে দিতেন তাঁর চারদিকে। খাবার জিনিসপত্র থাকতো, মাঝে মাঝে খেয়ে নিতেন, ছ'সাত ঘণ্টা তিনি একজনের পর আর একজনকে বলে বলে যেতেন। চারজন লোককে চার বিষয়ে একের পর এক বলে যাওয়া, খেই না হারিয়ে এবং ভাষা ঠিক রেখে, সামঞ্জস্য রেখে— এ অদ্ভুত প্রতিভাধারী মানুষের পক্ষেই সম্ভব।"

শুধু তাই নয়। অন্যকে দিয়ে এভাবে লেখানো ছাড়াও, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতেও তিনি অনবরত লিখে যেতেন। এ-ব্যাপারে রাহুলের বন্ধু ধর্মাধার মহাস্থবির একটি অভিনব তথ্য আমাদের জানিয়েছেন,—

> "একবার বেনারসে একসঙ্গে খেতে বসেছি, আমরা কয়েকজন খাচ্ছি ডালভাত, তিনি রুটি। কেন ভাত তরকারি খান না জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : 'রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে লিখতে পারি। হাত পরিষ্কার থাকে।' এর থেকে প্রমাণ হয় সময়ের অপচয় তিনি করতেন না। সেই জন্য সংস্কৃতি, রাজনীতির এত কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।"

এভাবে নিজের হাতে লিখে ও অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে রাহুল যে-সব বই প্রকাশ করেছেন, সে-সব বই প্রকৃতিতে ও বিষয়বস্তুতে যেমন বিচিত্রবিধ, প্রকাশরীতিতেও তেমনই অভিনবত্ব ও বিশিষ্টতার ধারক। বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কথা বিবেচনায় রেখে একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক বই একাধিক ভঙ্গিতে তিনি রচনা করেছেন। কোনোটি হালকাচালের, কোনোটি গম্ভীর। কোনো বইয়ে গল্পের মাধ্যমে সমাজসত্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট ও শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস, কোনো বইয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকের জন্য তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বকথন।

উদাহরণস্বরূপ 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' ও 'মানব সমাজ' বই দুটোর কথা বলা যেতে পারে। বিশটি গল্পের আধারে গণমনতোষিণী ভাষা ও রীতিতে 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'য়

বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিহাসটিকে তিনি তুলে আনেন। এর পরে লিখেন দুই খণ্ডের 'মানব সমাজ' গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকদের জন্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবসমাজের ইতিহাস রচনা করেন— বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও হাল্কা চালের 'ভোল্গা থেকে গঙ্গা' থেকে আঙ্গিকে ও প্রকাশ রীতিতে 'মানব সমাজ' একান্তভাবেই স্বতন্ত্র।

শাক্যেন্দু গুপ্ত নামক একজন আলোচক রাহুল-রচিত সাহিত্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। প্রথম ভাগে পড়ে 'অতি উচ্চস্তরীয় গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ।' যেমন, —'মধ্য এশিয়ার ইতিহাস'। দ্বিতীয়ভাগে আছে 'মানব সমাজ', 'বিশ্বের রূপরেখা', 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিক বাদ', 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলো প্রধানত রচিত হয়েছিল শিক্ষিত পাঠকদের কাছে ভারতীয় পটভূমিকায় মার্কসবাদকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে। রাহুল-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগে আছে ঐতিহাসিক কাহিনী এবং উপন্যাস। যেমন— 'সিংহ সেনাপতি', 'জয় যৌধেয়', 'ভোল্গা থেকে গঙ্গা' 'রেখা ভগৎ', 'মঙ্গল সিংহ', 'সফদর', 'সোমের' ইত্যাদি। এগুলোতে প্রাচীন কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি বিগত কালের রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গণমনের উপযোগী রূপে পরিস্ফুট করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। সর্ব শেষভাগে আছে তাঁর এমন কতকগুলো গ্রন্থ যেগুলো তিনি রচনা করেছেন একান্তই স্বল্পশিক্ষিত লোক সাধারণ ও শ্রমনিষ্ঠ প্রাকৃত জনের জন্য। যেমন— 'বাইসবীঁ সদী' (বাইশতম শতাব্দী), 'সাম্যবাদ হি কেওঁ' (সাম্যবাদই কেন), 'তুম্‌হারী ক্ষয়' (তোমার ক্ষয়') 'ভাগো নেহী, দুনিয়া কো বদলো' (পালিও না, দুনিয়াকে বদলাও) ইত্যাদি। এগুলোর বাইরেও আছে তাঁর পাঁচখণ্ডের বিশাল গ্রন্থ 'মেরী জীবনযাত্রা' শীর্ষক আত্মজীবনী।

সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থাবলির পরিচয় তুলে ধরা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' সম্পর্কে কিছু কথা না-বললেই নয়। 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'কে বলা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু, না। এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দর্শনের যে-সব ইতিহাস লিখেছেন সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বে অবশ্যই বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু রাহুলের বইয়ে দর্শনের সব তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের দর্শনের মূলমর্ম যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শন ও ইসলাম দর্শন রাহুলের হাতে নতুন আলোতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইসলামের প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাহুল লিখেছেন,—

> "ইসলাম বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল, সামন্ত-পুরোহিতদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেই যার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও দাসপ্রথা। একথা ঠিক যে ইসলাম এই মূল ভিত্তিকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য কখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু এই কাজে আরবের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির (কবীলগুলির) মধ্যে প্রচলিত সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর পায়ের নীচে পড়ে থকা সাধারণ জনতার এক বিরাট অংশকে আকৃষ্ট ও শোষণমুক্ত

> করতে সমর্থ হয়েছিল। যদিও ইসলাম ঐ নীতিকে কবীলগুলির সামাজিক কাঠামো থেকেই গ্রহণ করেছিল তবুও পরিণামে এটি একটি প্রগতিশীল শক্তির কাজ করেছিল।"

শুধু 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'-এ নয়। ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে এক সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় কোরান শরিফের অনুবাদেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'ইসলামের রূপরেখা' একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বর্তমানে কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান মৌলবাদী ভাষ্যের মাধ্যমে ইসলামের একটি বিকৃত রূপের প্রকাশ ঘটাচ্ছে যখন, তখন সেই বিকৃতিটাকেই অনেকে প্রকৃত ইসলাম বলে সাব্যস্ত করে বসেছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এখন ইসলামকে একান্তই মৌলবাদী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের সঙ্গে ইসলামকে একীভূত করে ফেলে সারা বিশ্বে ইসলাম-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। একান্তই অসঙ্গত এই বিদ্বেষ। এই বিরূপ সময়ে রাহুল সাংকৃত্যায়নের ইসলামচর্চা থেকে আমরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে পারি,— মহান্ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সকল ভুল ধারণার অপনোদন ঘটতে পারে।

চার

মহাপণ্ডিত রাহুল তাঁর পাণ্ডিত্যের ভাগ যেমন বিভিন্ন ধরনের বই রচনা করে সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য পরিবেশন করেছেন, তেমনই সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানকে কর্মে পরিণত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে চলেছে তাঁর বিশ্বপরিক্রমা, জ্ঞানান্বেষণ ও রাজনীতিচর্চা।

বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়াতেই তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখেন। এই আন্দোলনের জন্য দু'বার তাঁকে কারাবাসে যেতে হয়।

তিরিশের দশকের প্রায় শুরু থেকেই তাঁর চৈতন্যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এ-সময়েই তিনি মার্কসবাদকে তাঁর জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করেন, এবং তারই পরিণতিতে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৩৯ সালে বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ লাভ করেন তিনি। কিছুদিন পরেই বিহারে কৃষক-সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেফ্‌তার হন। এ-সময়ে মুক্তি পেলেও ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ভারতরক্ষা আইনে আবার তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয় এবং হাজারিবাগে তাঁকে ২৯ মাস কারাভোগ করতে হয়।

১৯৪৭ সালে ভাষা প্রশ্ন নিয়ে (হিন্দি-উর্দু বিতর্ক) কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিনি পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু কমিউনিজমের দর্শন পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই ১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাহুল কমরেড অজয় ঘোষের সঙ্গে দেখা করে আবার পার্টির সদস্য হন। রাহুল নিজেই লিখেছেন,—

> "এটা সকলেই জানতেন যে আমি পার্টি সদস্য না-থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলাম পার্টিরই লোক। আর কলমের সাহায্যে সে-কাজই তো করতাম। এখনও কলম

> দিয়েই সে-কাজ করে যেতে পারি। এ-কথা তাঁকে (কমরেড অজয় ঘোষকে) বলছি।"

আসলে ভাষা-প্রশ্নে মতানৈক্য সত্ত্বেও রাহুল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হননি। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই পার্টি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু সব সময় নিজেকে তিনি পার্টির লোক বলেই ভেবেছেন, এবং পার্টির বাইরে থাকা-যে সঠিক বা সঙ্গত নয় এক সময় এ-বোধে উপনীত হয়েই আবার পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

রাহুল দীর্ঘকাল ডায়বেটিসে ভুগছিলেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যান। কিছুদিন কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার পর তাঁকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সাতমাস ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাঁর স্মৃতির আর পুনরুদ্ধার ঘটে না। ১৯৬৩ সালের ২৩ মার্চ তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৪ এপ্রিল ৭০ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

পাঁচ

বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে রাহুলের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাহুলের যেমন বাঙালিদের জন্য ছিল গভীর ভালোবাসা, বাঙালিদেরও তেমনই রাহুলের প্রতি রয়েছে অন্তহীন প্রীতি ও শ্রদ্ধা। পশ্চিমবঙ্গে তো রাহুলকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ রাহুলচর্চায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে এ-ব্যাপারে এখানেও বেশ সচেতনতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে রাহুলচর্চায় অগ্রচারীর ভূমিকায় আছেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধসমাজের সুধীবৃন্দ।

বহু ভাষাবিদ্ রাহুলের বইপত্র মূলত হিন্দি ভাষাতেই লিখিত। তবে সংস্কৃত, পালি, তিব্বতি, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষাতেও বেশ কিছু বই তিনি লিখেছেন। বাংলা ভাষায় এ-পর্যন্ত রাহুলের অন্তত ত্রিশ/চল্লিশটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ-গুলোর মধ্যে আছে : দর্শন-দিগ্‌দর্শন (২ খণ্ড), বৌদ্ধ দর্শন, মানব সমাজ, ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা, সিংহ সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তিব্বতে সওয়া বছর, কিন্নর দেশে, আকবর, স্তালিন, মাও সে-তুঙ, বিস্মৃতযাত্রী, ইরান, জয় যৌধেয়, স্মৃতির অন্তরালে, বহুরূপী মধুপুরী, ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন, সপ্তসিন্ধু, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, অগ্নিস্বাক্ষর, ওরাংশ, মধুর স্বপ্ন, পুরনো সেই দিনের কথা (সতমী কে বঁচ্চে), কনৈলা কী কথা, রামরাজ্য ও মার্কসবাদ, নতুন মানব সমাজ, আমার লাদাখ যাত্রা, এবং পাঁচখণ্ডে লিখিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন যাত্রা' প্রভৃতি।

বাংলায় অনুবাদিত এই বইগুলো বর্তমানে খুব সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ রাহুলের গ্রন্থগুলোর সঙ্গে বর্তমানের তরুণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা-ধন্য তাত্ত্বিকবৃন্দ যখন 'ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্ব' প্রচার করেন কিংবা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেন, তখন সে-জাল থেকে বাইরে এসে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবার জন্য রাহুলের গ্রন্থপাঠ একান্তই জরুরি।

রাহুলের সব বক্তব্যই-যে পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই-যে তিনি সরলীকরণের প্রশ্রয় দিয়েছেন,—এ-কথা ঠিক। তবু, মানতেই হবে যে : প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের এই উপমহাদেশের ভাবনা-ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাহুল যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনটি আর কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি। তাই, একালেও, রাহুলের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আবশ্যকতা আমাদের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

এই অপরিহার্যতার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই 'রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স'-এর মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), বঙ্গানুবাদিত রাহুল-পুস্তকাবলির প্রকাশ ও প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক।

—যতীন সরকার

প্রাক্‌কথন

প্রথম সংস্করণ

'কিন্নর দেশে' (মে—আগস্ট, ১৯৪৮) ভ্রমণকাহিনী হলেও হিমালয়ের এই উপেক্ষিত অঞ্চলের একটা পরিচিত গ্রন্থও বটে। আমি এখানে নতুন ভারত গড়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত কিছুকে দেখেছি এবং তারই বর্ণনা দিয়েছি। যখন এ পথে গিয়েছিলাম তখন বই লেখার কোনো বাসনা মনে ছিল না, তাই যা কিছু দেখেছিলাম সে সব ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং পরে সেটিই আজ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও পুনরুক্তির ত্রুটি চোখে পড়তে পারে। তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে কোথাও কোথাও হয়ত পারম্পর্যের অভাবও অনুভূত হবে। এ সব মনে রেখেও আমার ধারণা, অবহেলিত হিমালয় অঞ্চলকে জানতে গ্রন্থটি কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। সব ত্রুটির জন্য দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমার কিন্তু বইটির যদি ইতিবাচক কোনো ভূমিকা থাকে তাহলে তার কৃতিত্ব সবটাই আমার সেইসব বন্ধুদের প্রাপ্য যাঁদের নাম এই বইয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

দ্বিতীয় সংস্করণ

আট বছর বাদে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম প্রকাশের সময় হিমালয়ের একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় দিয়েছিলাম। এরপর অবশ্য দার্জিলিং থেকে চম্বা পর্যন্ত হিমালয়ের এই সুদীর্ঘ অঞ্চল নিয়ে অনেক লেখাই লিখেছি— যার কিছু ছাপা হয়েছে, কিছু ছাপা হচ্ছে আর কিছু পাণ্ডুলিপিতেই আবদ্ধ হয়ে আছে।

লেখক পরিচিত

জন্ম সূত্রে তিনি ছিলেন, যাদের মেহনতে পরশ্রমজীবীদের দৌলত জমে জমে পাহাড় হয়, তাদের যথার্থ শরিক। তাঁর পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ছিলেন ধর্মভীরু, নিঃস্ব-প্রায় কৃষক। মাতা কুলওয়ন্তী। মাতামহের গৃহে তাঁর জন্ম। ভারতীয় মনীষার দেদীপ্যমান এই মহান্ পুরুষের বাল্যস্মৃতির ঝাঁপিয়ে সঞ্চিত হয়েছে ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; মায়ের ও একমাত্র বোনের অকাল-মৃত্যু, মাতামহ ও পিতার সংসার প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রয়াস। রক্ষণশীলতার প্রাকারে বন্দী ভারতীয় জীবনে সংস্কার আর গোঁড়ামি যে ঘেরাটোপ গড়ে তোলে মুক্তবুদ্ধির রাহুলজীর বাল্যজীবন তার আক্রমণে ছিল পর্যুদস্ত। ন' বৎসর বয়সে তিনি বিদ্রোহ করলেন। বিপুলা পৃথিবীর মাটিতে খালি পায়ে এসে দাঁড়ালেন।

প্রথমে গেলেন বারাণসীতে; তারপর কলকাতায়। বিশ্বজগৎকে চিনে নেওয়া ও জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় শুরু হলো তাঁর সেই জীবন—যে ক্ষেত্রে তিনি কিংবদন্তী-পুরুষ। প্রথাসিদ্ধ জ্ঞানচর্চা কিংবা তথাকথিত মানুষ হওয়ার প্রলোভন কখনোই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি; মূল সংস্কৃতে বেদান্ত পড়বার জন্য তিনি সাধু-সঙ্গ নিলেন। সাধু-সঙ্গে থেকে তিনি উপলব্ধি করলেন গোঁড়ামি আর অন্ধ-বিশ্বাসই জগদ্দল পাথর। পায়ে হেঁটে, ভিক্ষান্নে, অনাহারে অবদমিত না হয়ে তিনি পথ পরিক্রমা শুরু করলেন— দেশ-দেশান্তরে। হিমালয়ে পেরিয়ে গেলেন তিব্বতে (নিষিদ্ধ দেশে)। বিদগ্ধ পণ্ডিত রাম অবতার শর্মার সংস্পর্শে এলেন, তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষাদানে আকৃষ্ট হলেন। পিতৃদত্ত নাম কেদারনাথ পাণ্ডে বর্জন করে হলেন রামোদর দাস। কিছুকাল পরে আর্যসমাজীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। রাহুলজী তখন জ্ঞান তৃষ্ণার অস্থির। বহু বিচিত্রমুখী তাঁর জ্ঞান-সাধনা। আর তাঁর ভ্রাম্যমাণতা। ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি পরিচিত হলেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে। তাঁর অধীত গ্রন্থাদি ও জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন দিক অতি সংক্ষেপে বলতে গেলেও বিস্তর লেখা প্রয়োজন।

জীবন রসিক রাহুলজী ভারতের অবহেলিত মানুষদের দেখেছেন বড় কাছ থেকে। যে সৌভাগ্য আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অধিক সংখ্যকেরই পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। আগুনকে খুব কাছে থেকে দেখার ঝুঁকি আছে। জীবনপ্রেমী রাহুলজীর জীবনেও দুর্বিপাক কম আসেনি। কিন্তু আজন্ম সংগ্রামী রাহুলজী উন্নত মস্তকে তাঁর সত্তর বছরের পরমায়ুর প্রতি মুহূর্তকে ফলবতী করে তুলেছেন। ভ্রমণ আর ছকের বাইরে জীবন-যাপন এই দুটি বিশিষ্টতায় তাঁর জীবন অনন্য। এই অনন্যতার স্বাক্ষর তাঁর রচনাবলী।

অনলস ছিল তাঁর লেখনী। মাটি ঘেঁসা মানুষদের জীবনের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলি সম্পর্কে প্রখ্যাত এক হিন্দীভাষী লেখকের অভিমত, 'এমন সুন্দরভাবে দেহাতী-চরিত্র-চিত্রণ প্রেমচন্দ ব্যতীত আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

বহু প্রথিতযশার মতো রাহুলজীর জ্ঞানচর্চা বিদ্যাভ্যাসের অলস রোমন্থনে নিঃশেষ হয়নি। তিনি বারংবার নিজেকে অতিক্রম করেছেন। স্থির লক্ষ্যে তিনি প্রগতিকামী, শোষণ-মুক্তিকামীদের সংগ্রামের অস্ত্রশালায় অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছেন। জীবনী, আত্মজীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইতিহাস, দর্শন, উপন্যাস, গল্প, নাটক, বৌদ্ধ মতবাদ, লোকগাথা, বিজ্ঞান— সকল ক্ষেত্রে তাঁর রচনা সাবলীল। আদিম স্বতঃস্ফূর্ততা, আধুনিক গতিময়তা এবং ঐতিহ্যগত স্থিরতার সংমিশ্রণজাত এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি।

জীবন সুস্থতর করে তুলবার জন্য জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ও কৃষক আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন— কর্মীরূপে, নেতারূপে। তত্ত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগের উজ্জ্বল প্রয়াসে তিনি হয়েছিলেন কমিউনিস্ট। সে ক্ষেত্রেও তাঁর স্বীকৃতি ও অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মসূত্রে মেহনতী মানুষের শরিক, জ্ঞানের সাধনায় পরিব্রাজক, শোষণ-মুক্তির সাধনায় আপোষহীন এই সংগ্রামী মহামানবকে উপলব্ধি করতে হবে তাঁর রচনাবলী থেকে। সে কর্ম নিষ্কাম সাধনা হবে না। চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক অপদেবতার শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

'মেরী জীবনযাত্রা' নামে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে বারবার একটি উর্দু বয়েৎ উদ্ধৃত করেছেন রাহুলজী। সে বয়েৎ তিনি শিখেছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, উর্দু শিখবার সময়। বয়েৎটির মর্মার্থ— ওহে নির্বোধ, রে অলস বেরিয়ে পড়ো বিপুল বিশ্বে। এতে কিন্তু তুমি আর একটি জীবন লাভ করবে না। এমন কি যদি দীর্ঘায়ু হও তবু যৌবন ফিরে আসবে না। বুদ্ধদেবের একটি উক্তি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল— জ্ঞান পেরিয়ে যাবার তরণী, কাঁধে বইবার বোঝা নয়।

তাঁর রচনাবলীর সমালোচনার জবাবে একবার রাহুলজী বলেছিলেন— 'লেনিনও ঘোষণা করেছিলেন—কিছুই চূড়ান্ত নয়। আমি বিশ্বাস করি না কোনো মানুষই পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত। সত্য আমার একচেটিয়া নয়। আমি আমার কাজ করি। উত্তরসূরীরা পরিপূর্ণতা আনবেন সংশোধন করে।'

মহাপণ্ডিতের উপযুক্ত এই বিনয় স্মরণ রেখে তাঁর গ্রন্থাবলী পড়া প্রয়োজন।

মৃণাল চৌধুরী

যাত্রা হলো শুরু

কিন্নর বা কিম্পুরুষদের সম্বন্ধে জনমত এই যে, তারা দেবযোনিসম্ভূত। তাদের দেশে যাওয়াও যা আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়াও তাই— একই কথা। কাজেই যদি বলি, আমি স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছি লোকে স্বভাবতই আমার সন্দেহের চোখে দেখবে। তবে স্বর্গ বা দেবলোক বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা যা বুঝি, তা ছাড়াও আমার একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে, এখানে আমার ব্যাখ্যাটি শোনাতে চাই।

দেবভূমি আমরা তাকেই বলি, কোনো সময়ে যেখানে দেবতারা বাস করে গেছেন। তা ধরুন, একদা দৈব-অধ্যুষিত সেই ভূপৃষ্ঠে, এক সময় একদল অনুন্নত মানুষ এসে বসবাস করতে লাগল, এই হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সেই পিছিয়ে-পড়া জনপদ চিরকালই যে পিছিয়ে থাকবে এমনই বা কি কথা! সেই অনগ্রসর স্বল্পালোকিত লোকালয় একদিন দেববাঞ্ছিত অমরলোক হয়ে উঠবে না কেন? বরং আমি এই কথাই বলব যে, পিছনের দিকে পা করে হাঁটতে না চাইলে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। পিছিয়ে যাবেই বা কোথায়? মৃত্যুর গহীন কুয়াশায় অতীতের পথঘাটের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। এ দেশ থেকে মরণ-সাধনা যদি লোপ পায় তবে চলতি শতকের শেষাশেষি দেখবেন, এই পিছিয়ে-থাকা কিন্নরভূমিই আবার একদিন বহু ঈপ্সিত সুরলোকের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে উঠবেই— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিরহী যক্ষের বার্তা বহন করে মেঘ যখন তার প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়ার কাছে উড়ে গিয়েছিল, সে দিনও তাকে এই পথেই যেতে হয়েছিল নিশ্চয়ই। আজও, যদি কোনো কাব্যরসিক মেঘদূত-প্রেমিক পাটক ও পথে ছিটকে আসেন তো পথের দৃশ্য দেখে তাঁকে 'পণ্ডশ্রম হলো' বলে আফশোস করতে হবে না তা হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু তাই বলে কাউকে আমি এ পথে ভ্রমণের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। কারণ, প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের ভ্রুকুটি-শলাকা আমার মনকে বিদ্ধ করতে থাকবে, তাঁদের প্রেয়সীদের বর্ষাধিক কাল বিহরশাপ ভোগ করতে হবে আর তাঁদের অভিশাপ থেকে আমিও রেহাই পাব না। নাঃ, এ ব্যবস্থায় আমি রাজি নই। এ দিককার রাস্তা মোটেই সুগম নয়। চলতে চলতে এমন অনেক পথ সামনে আসে, যেখানে শঙ্কায় পায়ের কাঁপনি থামতে চায় না। মাটি ছেড়ে ওপরে তাকাবার সাহস থাকে না চোখের।

অধুনা প্রচলিত 'কনৌর' শব্দ, কিন্নর শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপ। এ দেশে আসার বিভিন্ন পথ আছে। অতীতে যে রাস্তাটি সবচেয়ে প্রচলিত ছিল সেটি বর্তমানে দেরাদুন জেলার মধ্যে। সেকালে এই জায়গায় একটি শহর ছিল—শহরের নাম কালসী (খলকিকা)। শহরটি ছিল ঠিক রাস্তার চড়াইয়ের মুখেই। সেই শহরের নিচে যমুনার তীরে এক

শিলাখণ্ডের গায়ে উৎকীর্ণ অশোকের ধর্ম-সূত্র আজও রয়েছে। সময়ের স্রোতে তার রেখা আজও মুছে যায়নি।

অতীতের সেই অতিপরিচিত পথে অবশ্য আজ আর কেউ চলে না। নিচের লোক ওপরে ওঠার অন্য রাস্তা আবিষ্কার করেছে। তবুও কনৌরের লোক কালসীকে একেবারে বিস্মৃত হতে পারেনি। দুরন্ত শীতের দিনে হাজার হাজার ছাগল ভেড়া সঙ্গে নিয়ে আজও তারা সেখানেই গিয়ে জড় হয়। সারা কিন্নর দেশ যখন বরফে বরফে ঢাকা পড়ে যায়, কালসীর মাটিতে তখনও নিবিড় উষ্ণতার মধুর স্পর্শ। তার পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজ পাতার রাশ। কালসীর সেই প্রাচুর্যে-ভরা পরিবেশ তখন কিন্নরদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পথ অবশ্য আরো একটা আছে—গঙ্গা-যমুনার পার্বত্য অধিত্যকাগুলির ধার ঘেঁসে। তবে সেই সুদুর্গম শৈলসঙ্কট শীতের দিনে পার হতে পারে একমাত্র কিন্নরেরাই, অন্যের পক্ষে তা অসাধ্য। ইদানীং এ দিকে যাতায়াতের চালু পথটা বরাবর সিমলা থেকে কোটগড় হয়ে শতদ্রু উপত্যকার মাঝ বরাবর চলে এসেছে।

পথের দুর্গমতার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। তা সত্ত্বেও সব কিছু উপেক্ষা করে—একবার নয়, দু'দুবার এ অঞ্চলে যে বেড়াতে আসে, তার সুবুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কি করব? কতকটা আমার স্বভাব-দোষ কতকটা অদৃষ্টলিপি!

হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ, এবং প্রয়োগ তীর্থের দুর্ধর্ষ গ্রীষ্মের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার জৈব তাগিদ—এই দুয়ে মিলে আমায় ঘর-ছাড়া করল। মে মাসের অগ্নাত্তপ্ত তেসরা তারিখে তীর্থরাজ প্রয়াগের একশো তেরো ডিগ্রী তাপমাত্রার আওতা ছাড়িয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা লাগল সিমলা পৌঁছাতে।

আঃ, কি বিপুল বৈষম্য আবহাওয়ায়। কোথায় তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে ভ্রূকুটিল ভয়াল কটাক্ষ, আর কোথায় সিমলার এই মৃদু মন্থর সমীরণ! কিন্তু এই মধুস্নিগ্ধ হিমানী-সৌভাগ্য ভোগ করবার বরাত করে কি এসেছি? আমার দুষ্টগ্রহ দিন দশেক কাটতে না কাটতেই আমার তাড়না করতে লাগল—অজানা বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে।

সিমলায় যাঁদের আতিথ্য ও সহৃদয়তা আমার দুর্গম-যাত্রাকে স্নেহসিক্ত করেছিল তাঁরা হলেন শ্রী লাজপৎ রায় নায়ার আর তাঁর সুযোগ্যা ভগ্নী কুমারী রজনী নায়ার। কুমারী নায়ার হিন্দী সাহিত্যে এক নবাগতা প্রতিভা। পরিচয়-পত্রাদি জোগাড় করে এবং আরো নানাভাবে আমার দুরূহ যাত্রাপথকে সরলতর সুগমতর করে তুলতে সাহায্য করেছেন এঁরা দু'জন। এঁদের ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। আরো একজনের কাছে রয়েছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ। তিনি শ্রী এন. সি. মেহতা। তাঁর করুণা-কণা আমায় আগেও একবার কুড়োতে হয়েছিল। সেটা আমার গত বারের তিব্বত যাত্রার সময়ে। সে'বারেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমার যাত্রার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর এ বারে তো কথাই নেই। তাঁরই শাসনাধীন হিমাচল প্রদেশ—তাঁর খাস এলাকায় বেড়াতে চলেছি। তাঁর দিক থেকে সহায়তার কোনোও কার্পণ্য দেখা যায়নি। তবে আমার বরাতে যদি যাত্রা অশুভ হয়ে ওঠে তাকে কে আর খণ্ডাবে। সময়ই নির্ধারণ করবে—যাত্রা সুখের হবে কি অ-সুখের।

এই সময়টায় সিমলায় পেট্রলের টানাটানি চলছিল। নইলে সিমলা থেকে নারকণ্ডা মোটরবাস সার্ভিস আছে। নারকণ্ডা থেকে ঠানাদার-কোটগড় পর্যন্ত বাস না পেলেও লরী পাওয়া যায়। এসব পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায়ই বাস-লরী ইত্যাদির অভাব লেগে থাকে। সবচেয়ে অসুবিধে হয় তাদের, যারা লটবহর নিয়ে চলে। এ বার আমাকেও অগত্যা নারকন্ডা থেকে বাকী পথটা হাঁটতে হলো।

বাইশ বছর আগে, যখন পশ্চিম তিব্বত ঘুরে এই পথেই ফিরছিলাম, সেই সময়কার একটা করুণ স্মৃতি মনে পড়ল। এখান থেকে কিছু নিচে নওলা বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে আমায় দিন তিনেকের মতো ডেরা বাঁধতে হয়েছিল। উঃ কি অভিশপ্ত গ্রাম! মাথা গোঁজবার আশ্রয় তো দূরের কথা, এমন একটা লোক পাওয়া যায়নি যে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে সঙ্গে যায়। সেই খাড়াই পাহাড়ী পথে প্রায় তিন মাইল রাস্তা আমায় মালপত্র মাথায় করে উঠতে হয়েছিল সে'দিন।

এ বারের যাত্রায় নারকণ্ডার ডাকবাংলোয় স্থান পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু থাকা ঘটে ওঠেনি। সহযাত্রী রামপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার পণ্ডিত দৌলতরাম নিজে উদ্যোগী হয়ে খচ্চর জোগাড় করে আনলেন। মালপত্তর তার পিঠে চাপানো গেলো। আমি পায়ে হেঁটে যাত্রা করার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে দিব্যি গেলে হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তার ফলও হাতে হাতেই পেয়েছি। ডায়েবেটিসের হাতে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে অনতিবিলম্বেই। জীবনের বাকী দিনগুলো বোধহয় এই কথাই জপ করে যেতে হবে— ডায়েবেটিস্‌কে আমি আমন্ত্রণ করে শরীরে এনে জায়গা দিয়েছি।

আহা, সময় থাকতে যদি একবারও সাবধান হতে পারতাম! যদি একবারও কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আমায় এর সম্বন্ধে কিছু বলতো। এর মহিমার কতা আগেভাগে জানা থাকলে হয়ত আমার মতোন অনেক অভাগাই বাঁচতে পারত। বেশী নয়, শুধু যদি একটা কথা জানা থাকে। একটা মোটা কথা— বেশী খেলে তাকে পরিশ্রম করতেই হবে। একটু শারীরিক শ্রম, একটু চলা-ফেরা—গুরুভোজীদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এলাকাড়ি দেওয়ার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। ডায়েবেটিসের অমোঘ দণ্ড নেমে আসবেই। তখন আর উপায় নেই—প্রস্রাবে চিনি, ছোটখাট আঘাত কি ছোট্ট একটা ফুসকুড়ি থেকে বিষাক্ত ক্ষতে পরিণতি!

রামপুর, জুব্বল প্রভৃতি একুশটি ছোটবড় দেশীয় রাজ্যকে এক করে হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে। অথচ প্রজাদের মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করেই বিলাসপুর ও আর কয়েকটা রাজ্যকে আলাদা রেখে দেওয়া হয়েছে। নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দশ লাখেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে একটি রাজ্যের পক্ষে তার নিজস্ব সব সমস্যার সমাধান করা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আমার মনে হয়, এ ভুল একদিন ধরা পড়বে। আর হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দাদেরই সে ভুলের সংশোধন করতে হবে।

সে যাইহোক, হিমাচল প্রদেশ স্বতন্ত্র হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু লাভবানই হয়েছি; এ কথা না বললে বেইমানী হবে। আমার ধারণা ছিল ঠানাদার (কোটগড়) পর্যন্ত

বাস বা লরী যা হোক কিছু একটা পাবই। কিন্তু কিছুই না পাওয়ায় অগত্যা নারকণ্ডা থেকে হাঁটতে হচ্ছিল। দিন দশেক সিমলায় থাকার ফলে অনভ্যাসটা কেটে গিয়ে, হাঁটা-চলা করার ক্ষমতা খানিকটা রপ্ত হয়ে এসেছিল। দৌলতরাম ওদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, যদি রামপুর থেকে ফিরতি ঘোড়াগুলোকে পথেই আটকে ফেলা যায়। হরিদ্বারের এক পাণ্ডা এ দিকে কোথায় যজমানের বাড়ি চলছিলেন, তাঁকে সঙ্গী পেয়ে গেলাম। বাসে উঠে আবার আর এক বিপত্তি। সঙ্গী পাণ্ডাজীর সেই যে মাথাঘোরা শুরু হয়ে গেলো, সে আর থামে না। আমি তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম, কি জানি বাবা যক্ষ্মা-টক্ষ্মা নেই তো। আশ্বাসের কথা ঘন্টা তিনেক বিশ্রামের পর তাঁর মুখ-চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

প্রথমটা আমরা ঘন্টায় চার মাইল করে চলতে শুরু করেছিলাম। সে ঐ প্রথম ঘন্টাটায় ব্যস। তারপর ক্রমশ গতি মন্দীভূত হয়ে এল। বোঝার ভারে কবজীর গ্রন্থি প্রায় দেহচ্যুত হবার উপক্রম; এমন সময় সহিস ঘোড়া নিয়ে দর্শন দিলো। ভালোয় ভালোয় বাকী তিন মাইল পথ কাটিয়ে সূর্যাস্তের কিছু আগেই ঠানাদার বাংলোয় এসে পৌছে গেলাম।

পাণ্ডাজীর তো তক্ষুনি নওলা গ্রামে যাবার ইচ্ছে। সেখানে পৌছে গেলে আহারাদির ব্যাপারটা ভালোভাবেই সমাধা হবে। কাজেই তিনি আর অযথা কালবিলম্ব না করে পাগডাণ্ডী দিয়ে রওনা হয়ে যেতে চান। আমি বললাম তথাস্তু। বিদায় নিয়ে পাণ্ডাজী চলে গেলেন নওলা গাঁয়ে। সেই নওলা গ্রাম। আমি যাকে 'অভিশপ্ত' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইনি। আর আজ একজন ছুটে চলেছে সেইখানেই—যেখানে তার জন্যে আছে সসম্মান আশ্রয়, আছে আহারের সুব্যবস্থা, নিরাপত্তার আশ্বাস। তার যজমানের বাড়ি। তার যজমান সেই বণিক-সন্তান—বাইশ বছর আগে এক নিরাশ্রয় অসহায় বিদেশী পথিককে একটু বসবার জায়গা দিতেও যিনি রাজী হননি। রাতের আশ্রয়, বাহকের ব্যবস্থা তো দূরের কথা। তাঁর বন্ধুর পরিচয় পত্রেরও কোনো মর্যাদা দেননি। অথচ সেই একই লোকের অকুণ্ঠ বদান্যতায় নির্ভর করে একজন লোক নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছে তার আশ্রয়ে। বিস্ময়ের কিছু নেই। মানব চরিত্রের এই বৈপরীত্য কতই তো দেখলাম। সারা জীবন দেখেই চলেছি। এই আমিই আবার দুর্দিনে কত মানুষের কত সহৃদয় সহানুভূতি পেয়েছি, কত মধুর মহানুভবতা।

ঠানাদারে ডাকবাংলোর চেয়ে বড় কোনো আশ্রয় পাব বলে আমি আশা করিনি। কিন্তু অভাবিতভাবেই পেয়ে গেলাম। শুধু আশ্রয় নয় বন্ধুও পেলাম। পূর্ব-পরিচিত ডক্টর ভগবান সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আর নতুন পরিচয় হলো রায়সাহেব দেবীদাস মহাশয়ের সঙ্গে। নরম-গরম উপাদেয় ভোজ্য, বিঠরী-রীতির রন্ধনশৈলী। সর্বোপরি সঙ্গীদের নিবিড় অন্তরঙ্গতার কবোষ্ণ সান্নিধ্য। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

রামপুরের পথে

ঠানাদার থেকে ১৪ মে সকাল ছ'টায় রওনা হলাম। রায়সাহেব দেবীদাসের কল্যাণে তখনই গরম পরোটা আর ফলের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হায় ডায়েবেটিস্, হায়

আমার চলে-যাওয়া দিন! সেই হজমশক্তি কোথায়! এখন এ-বেলা বেশী খেলে, ও-বেলা সতর্ক হয়ে হাত গুটোতে হয়।

সামনেই সাত মাইল উৎরাইয়ের পথ। সে পথে ঘোড়ায় চড়া, মানুষ বা ঘোড়া উভয়ের পক্ষেই সমান কষ্টদায়ক। বেলা সাড়ে ন'টায় নওলা গ্রামে পৌঁছালাম। কিন্তু এই সাত সকালে সেখানে বিশ্রাম করার কোনো প্রশ্নই আসে না। সাহু গোপাল চন্দের প্রতিষ্ঠা-করা ধর্মশালার সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইশ বছর আগের আর এক দিনের কথা মনে এল। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। বড় রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন ভদ্রলোক। আঘাত পাইনি বললে মিথ্যা হবে। তবে আজ তার গ্লানি মুছে গেছে। স্বর্গে গেছে মানুষটা। আহা, তার আত্মার কল্যাণ হোক।

পথেই একটা নদী পড়ল—ছোট্ট নদী। স্থানীয় ভাষায় বলে খদ্দ। নদী পেরিয়ে রামপুর পরগনায় পদার্পণ করলাম। এ অঞ্চলের সীমানা এখনো যথাযথ নির্ধারিত হয়নি। যেন একতাল গলানো ধাতু কড়ায় পড়ে রয়েছে, শুধু ছাঁচে ঢালা বাকী। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই ছোট নদীটিই সিমলা জেলা আর বুশহর রাজ্যের সীমারেখা ছিল। আজকাল সব বদলে গেছে। খদ্দ পার হলেই হিমাচল প্রদেশের এলাকা। অথচ নওলা গ্রাম পড়েছে পূর্ব পাঞ্জাবের আওতায়। সামান্য ধনুকের ছিলাকে অবহেলা করায় রাবণের সমূহ বিপদ এসেছিল। আর আবহমান বহে-চলা এই তটিনী—প্রকৃতির নিজ হাতে রচিত এই সীমারেখা, একে কি অবহেলা করা সম্ভব হবে! সম্ভব হবে মুছে ফেলা?

ভারত সরকার হিমাচল প্রদেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু এটা স্থির করলেন না যে, সেই নতুন রাজ্যের সীমা নির্ধারণ হবে কি হিসেবে? ভৌগোলিক-প্রকৃতি অনুযায়ী অথবা প্রকৃতির নির্দেশ লঙ্ঘন করে—ইংরেজদের মতো শাসনকর্তাদের স্ব-স্ব রুচি অনুসারে। অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে হিমাচল প্রদেশের সীমান্ত-ব্যবস্থা চলছে। খদ্দের পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাবের এলাকা, আবার তারই আশেপাশের ছোটবড় দেশীয় রাজ্যগুলিকে হিমাচল প্রদেশে সম্মিলিত করা হয়েছে। আবার তারই লাগোয়া দেশীয় রাজ্য বিলাসপুরকে অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। বিলাসপুরের এই স্বাতন্ত্র্যের সপক্ষে ভারত সরকার কি যুক্তি দেখাবেন জানি না। তবে আমার ধারণা, এটা নিছক স্থানীয় আবদারকে প্রশ্রয় দেওয়া। বিলাসপুরের গায়েই পাঞ্জাবের পার্বত্য জেলাগুলি। ঠিক তার পাশেই মণ্ডী রাজ্য—হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুধু হিমাচল প্রদেশ বলে কেন, এই একই সীমান্ত-বিশৃঙ্খলা তেহরী রাজ্য বা কুমায়ুন জেলায়ও দেখা যায়। ধন্য ভারত সরকার। জনসাধারণের শক্তি নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো অথচ রাষ্ট্রের কল্যাণদৃষ্টি রইল প্রজাদের ছেড়ে রাজন্যবর্গের প্রতি। সরকারী আস্কারা না থাকলে বিলাসপুরের রাজার ক্ষমতা কি যে আলাদা পাত পাততে চায়! তবুও বলব এ ব্যবস্থা সাময়িক; কখনোই এ চিরস্থায়ী হতে পারে না। রাজাও চিরজীবী নয়, তাকেও মরতে হবে—কিন্তু গণশক্তি অমর, সে মরবে না।

নদী পার হয়ে আমরা আধঘণ্টার মধ্যে নিরত পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে সিমলা মাত্র ষাট মাইল দূরে। আজ সকালে আমরা ৭২০০ ফিট উঁচুতে ছিলাম। নওলা খদ্দ

হলো ২৫০০ ফিট, এখন আবার উঠে এলাম ৩৬০০ ফিটের মতো। এখনো প্রয়াগের একশো দশ ডিগ্রীর কথা আমি ভুলতে পারিনি। সে তুলনায় আমার কাছে তো এ উত্তর মেরু। অথচ এখানকার লোক গরমে আইঢাই করছে। যে রকম ধরনে কথা বলছে যে মনে হয় বুঝি 'লু' চলল বলে।

আজ আর তাড়াতাড়ি নেই—রামপুর মোটে বারো মাইলের পথ। ঘোড়ায় যেতে অসুবিধে হবে না। দুপুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে ডাকবাংলোয়। বাইরে রোদে যতক্ষণ হাঁটছিলাম ততক্ষণ একটু কষ্ট হচ্ছিল। ডাকবাংলোর শীতল কামরায় প্রাণ জুড়িয়ে গেলো।

কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছি। দুই লাল পাগড়ির আবির্ভাব! কি ব্যাপার? সেলাম ঠুকে তারা জানাল যে, দেওয়ান সাহেব তাদের আমার সেবার্থে পাঠিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশের সরকারের তরফ থেকে এখানে একজন অস্থায়ী চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁকেই এরা দেওয়ান সাহেব বলে। আমি দেওয়ান সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে, আমার সেবার কোনো প্রয়োজন নেই। সিপাইদের সেবা গ্রহণে আমার অক্ষমতা জানিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলাম।

ছত্রিশ শো ফিটের ওপরে, এই আবহাওয়ায় যথেষ্ট ফলের চাষ হতে পারে। কিন্তু লোকের সে দিকে চাড় কম। লোকে দেখে কিসে দুটো পয়সা হবে। আমার কাছে রায়সাহেবের দেওয়া আপেল ছিল, খাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে এলে আমি ঘোল আনতে বলে দিলাম। এ সময়টায় হাল্কা কিছু খাওয়াই শরীরের পক্ষে ভালো বলে মনে হলো।

বাংলোর শার্সি-লাগানো জানালার ওপরে আবার পুরু জাল আঁটা দেখে মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। এখানে বলে নয়, তিব্বত থেকে হিন্দুস্থান এই সড়কের আগাগোড়া যতগুলো ডাকবাংলো আছে সবগুলোতেই ঐ এক ব্যবস্থা। আগে এর মাহাত্ম্য বুঝিনি। বুঝলাম পরে, যখন রাস্তায় দলে দলে মক্ষিকাকুলের আক্রমণে প্রাণ বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

বসে বসে আপেল ছাড়িয়ে খাচ্ছি—জ্বালাপুরের পাণ্ডাজী এসে হাজির। বেচারা সেই অভিশপ্ত পল্লীতে বসে আমার প্রতীক্ষা করছিল। আমি হাতজোড় করে মাফ চাইলাম নিজের ত্রুটির জন্য। তাকেও গোটা দুই আপেল দিয়ে সবিনয়ে খেতে অনুরোধ করলাম।

সাধারণত শিক্ষিত মানুষদের পাণ্ডাদের ওপর কেমন যেন একটা রাগ থাকে। কিন্তু এর কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। যদিও আমার দীর্ঘ ভ্রাম্যমান জীবনে আমি কোনো পাণ্ডার আতিথ্য স্বীকার করিনি, তাদের সঙ্গে লাভক্ষতির কোনো যোগাযোগই আমার হয়নি।

পাণ্ডাদের নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল একবার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তিনি বললেন, "মটনের (কাশ্মীর) পাণ্ডারা কিন্তু খুব ভালো মানুষ—এ কথা একশো বার বলব। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে খুব নজর। গয়ার পাণ্ডাদের মতোন দক্ষিণার জন্যে লালায়িত হয়ে থাকে না।" হয়ত তাঁর কথা সত্যি। মটনের পাণ্ডারা হয়ত খুবই ভদ্র। কিন্তু

যাত্রীদের আরাম আয়েসের দিকে কম-বেশী সব পাণ্ডারই লক্ষ্য থাকে, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। ভেবে দেখুন, পাণ্ডাদের সক্রিয় সহায়তা না পেলে, কাশীর মতো জায়গায়, যেখানে রাঁড়-ষাঁড়-সিঁড়ি আর সন্ন্যাসীর রাজত্ব—সেখানে যাত্রীদের কত কি অসুবিধা হতো! না পাণ্ডারা কোথাও যাত্রীদের অসুবিধেয় ফেলে না বা ফেলতে চায় না। তবে দক্ষিণার কথা যদি বলেন তো বলব, "সুর-নর-মুনিকী এহী রীতি। স্বারথ লাগ করে সব প্রীতি।" আপনার ভৃত্যই বড় আপনার জন্যে না খেয়ে কাজ করে যে পাণ্ডার কাছে নিষ্কাম সেবা আশা করছেন। হ্যাঁ, গয়ার পাণ্ডাদের একটু বদনাম আছে। তা তাদের দিকটাও একটু বিবেচনা করুন। অন্য পাণ্ডাদের মতো তারা তো শুধু তীর্থস্থান আর দেব-দর্শন করিয়েই খালাস হতে পারে না। আপনার চোদ্দপুরুষের গোষ্ঠীর গোরের খবর তাকে রাখতে হয়। কত লোকের পারিবারিক ঠিকুজী-কুলুজী খুঁজে বার করতে হয় নরক ঘেঁটে।

নিরতকে বাঁয়ে রেখে শতদ্রু বয়ে যাচ্ছে। শতদ্রু এখানে পশ্চিমবাহিনী। আমার মতে নদীর পশ্চিমবাহিনী হওয়াও উত্তরবাহিনী হওয়ার চেয়ে কম মাহাত্ম্যপূর্ণ নয়। নর্মদা, তাপ্তী এরাও পশ্চিমবাহিনী। সম্ভবত চিরকুমারীকাও তাই। নিরতা শতদ্রুর ধারে। এর মানে এ নয় যে, শতদ্রু নিরতের কোল ঘেঁসে বয়ে চলেছে। এখান থেকে শতদ্রুর দূরত্ব বেশ খানিকটা। নিরতে বসে শতদ্রু-কল্লোল শোনার কোনো সম্ভাবনা নেই।

নিরত—এই নামটা কানে যাওয়ার পর থেকেই আমি নিরত-নিরত জপ করছিলাম। নিরত মানে কি হতে পারে? নৃত্যের সঙ্গে তার কোনো শাব্দিক যোগাযোগ আছে না-কি। না-কি অন্য কোনো ভাষার শব্দ—এই সব সাত-সতেরো কথা যার কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। একটা তুচ্ছ পল্লীকে নিয়ে এত পাঁজি-পুথি নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানে হয় না। যাইহোক দু'তিন ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার বেরিয়ে পড়া গেলো। ঘোড়ায় চড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পেছন ফিরতেই একটা মন্দির নজরে পড়ল। মন্দিরের চুড়োটাই চোখে পড়েছিল। দেখালাম তাতে গুপ্তযুগীয় স্থাপত্যকলার ছাপ স্পষ্ট। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম যে ওটা সূর্যমন্দির। গুপ্তযুগের মন্দির শীর্ষ, তায় সূর্যের মন্দির এ কিছুতেই ষষ্ট কি সপ্তম শতাব্দীর চেয়ে বেশী পুরনো নয়। আবার যে ফিরে গিয়ে ভালো করে দেখব এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছি। দলবল নিয়ে আর ফেরা যায় না। মনে মনে ভাবলাম, এই পথ দিয়েই তো ফিরতে হবে। তখন না হয় ভালো করে দেখা যাবে। পরে যখন খবর পেলাম যে, রামপুরেও সূর্যমন্দির আছে, তখন মনে কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠল।

এ দিককার বাসিন্দারা 'খশ্' নামেও পরিচিত। 'খশ্', 'খছে' কি 'কশ্' এ সব নামই 'শক' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতের লোক আগেও অবশ্য সূর্যপূজা করেছে। কিন্তু এ দেশে বহুল পরিমাণে সূর্যমন্দির স্থাপন বা সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে শকেরাই প্রথম প্রবর্তন করে।

কিছু দূর যাবার পর, জনকয়েক গুজর সম্প্রদায়ের মুসলমান নরনারীর সঙ্গে দেখা হলো। মোষের পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দারুণ ঠাণ্ডার সময়টা নিচে কাটিয়ে

ভ্রাম্যমান মহিষ যূথ এ বার আহার্যের সন্ধানে ওপরের দিকে চারণভূমির উদ্দেশ্যে চলেছে। আমার সহিস লোকটা বেশী কথা বলে। বললে, "আমরা শপথ নিয়েছিলাম, পাহাড়মুলুক মুসলমান শূন্য করব। তা ক'জনই বা মুসলমান আছে। সবই তো হিন্দু হয়ে গেছে। গুজরদের চাপ দেওয়া হলো—হয় হিন্দু হও, নয় পাকিস্তানে থাকোগে যাও। তারা বললে, 'ভালোরে ভালো, পাকিস্তানের আমরা কি জানি। আমাদের চৌদ্দপুরুষের এখানে কেটে গেলো—পাহাড়ের ওপর নিচে ঘুরে। আমরা কোথাও যেতে পারব না। যা করতে হয় বল, তাই করব।" সুতরাং সব হিন্দু হয়ে গেলো।" এ কথার জবাবে কি আর বলব? বলতে পারতাম যে ওদের সম্প্রদায় তো আজও বেঁচে রয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে বেঁচে থাকবেও। কিন্তু এ সব কথা বলতে রুচি হলো না।

আমি ততক্ষণে আমার কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়েছি দূর অতীতের পথে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কথা। আর্যদের সগোত্র শকেরা তখন ভ্রাম্যমান যাযাবর। গোবি থেকে কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে তারা। হঠাৎ এল হুন আক্রমণের পালা। তাঁবু গুটিয়ে, ঘোড়া আর ভেড়ার দল তাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলো শকেরা। শকদ্বীপের পূর্বাঞ্চল হুনেদের অধিকারে এল। হলুদ-চুলো নীল-চোখো হুন—চীনেরা তাদের বানর বলে বর্ণনা করেছিল। তারা এসে শকদ্বীপে আধিপত্য করতে থাকল। বাস্তুহারা শকেরা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। কারাকোরামের দুর্লঙ্ঘ্য পথ পার হয়ে গেলো কেউ, কেউ গেলো সিস্তান বেলুচিস্তানের পথে—কেউ বা এল ভারতে ক্রমে দলের সর্দার রাজপদবী লাভ করল। মগ, কদাফিস্, কনিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব—(বাসুদেব!! হ্যাঁ, বাসুদেবও)—এঁরা তো সব রাজা হলেন। কিন্তু পশুপালকের দল আজও পশুই চরাচ্ছে। এক জাতি, এক শাখা একই শক রক্ত। এদের 'গদ্দী' সম্প্রদায় চম্বা-মণ্ডী-লাহুল প্রভৃতি অঞ্চলে মেষপালন করে। আর 'গুজর' সম্প্রদায় বুশহরে, তেহরিতে মোষ চরায়। গদ্দীরা কনিষ্ক-পৌত্র বাসুদেবের অনুকরণে হিন্দু হয়ে যাওয়ায় তাদের আর কোনো অসুবিধে হলো না। গুজর বেচারাদের শীতে সমতল ভূমিতে নামতে হয়। তাদের ওপর রীতিমতো পীড়ন শুরু হলো। তারা অগত্যা দাড়ি রাখতে শুরু করল। তবে দাড়িই রাখুক আর যাই করুক তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি কিন্তু আজও সেই শকদ্বীপের নিয়মে চলছে। সেখানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তনের মধ্যে ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার বদলে মোষ পুষছে, তাতে অবশ্য লাভই হচ্ছে। ঘি-দুধ বেশী পাচ্ছে। তার ফলে আয়ও বেশী হচ্ছে। কাজেই, যখন পাঞ্জাবের আগুন পাহাড়েও হল্কা ছড়াল—'বাঁচতে চাও তো হিন্দু হতে হবে।' তারা এক বাক্যে বলল, 'যা হতে বলা তাই হব—আমরা বাঁচতে চাই।' খুব একটা কিছু রকম ফের যে হলো তা নয়। দাড়ি যেমন ছিল, তেমনই রইল। বাড়তি জিনিস্, মাথায় শিখা চড়ল। হিন্দুদের রাজার দোষ আছে। উত্তেজনার বশে বা ক্ষণিক প্রলোভনের মোহে তারা হয়ত পশুত্বেও নেমে আসে, কিন্তু সেটা সাময়িক। আসলে হিন্দুমাত্রেই শান্তিকামী। হিংসাদ্বেষের চেয়ে শান্তিই তাদের প্রিয়।

তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়ক দিয়ে চলেছি। চলতে চলতে কত কথাই মনে হচ্ছে। অনেক যত্ন করে রাস্তাটা বানানো হয়েছিল। পথশ্রান্তি হ্রাস করার উদ্দেশে চড়াই-

[illegible] কমিয়ে সরল করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু হিমালয়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। এ অঞ্চলে মেওয়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। সারা দেশে খাওয়া ফল বা মেওয়ার ভীষণ চাহিদা। এ অঞ্চলে ফল পাওয়া যায় কিন্তু রপ্তানি ব্যবস্থা [illegible] অনুপযোগী—সেই আদিম যুগের মতো ঘোড়া-খচ্চর আর ছাগল-খচ্চরের পিঠে মাল চাপিয়ে রেলপথ পর্যন্ত আনা। তার ফলে সে মাল সোনার দরে [illegible] সাধ্য, কিনবে ক'জন? কাজেই মোটর চলাচলের রাস্তা তৈরি করা অবিলম্বে প্রয়োজন। কে যেন কথাটা সে'দিন বলছিলেন, 'যত শীঘ্র সম্ভব' জীপের রাস্তা তৈরি করা চাই।' কথাটা সত্যি জীপ প্রায় সর্বত্রগামী হয়ে উঠেছে। এই তো গতবার এপ্রিল মাসে প্রাচীন বৈশালীর কান্তারে-প্রান্তরে জীপের গর্তে বসেই নেচে কুঁদে এলাম। তবে কিনা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আর মাঠ-ঘাটের অসমান পথে—অনেক তফাৎ। তবু এখানে জীপ চলবার মতো রাস্তা তৈরি করতে হবে। বেশী চওড়া করা যাবে না—তবে [illegible] রাস্তাকে কম-বেশী কোথাও উঁচু কোথাও নীচু করতে হবে। হয়ত খুব একটা [illegible] কথা নয়। তবে এ কাজের দুরূহতাও ভেবে দেখার মতো। বহু জায়গায় পাহাড়ের কাঁচা মাটি, অল্প বর্ষাতেই ধ্বসে পড়তে পারে। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। পাথর পড়া ঠেকানো যায়, কিন্তু কাঁচা মাটি ঝুর-ঝুর করে ঝরতে থাকলে কি দিয়ে ঠেকানো যাবে? তবে, মানুষের ক্ষমতার অসাধ্য কিছু নেই, খরচ কিছু বেশী হবে। বার-বার ধ্বস নামবে—বার-বার মেরামত করতে হবে, উপায় নেই। মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত মানুষকেই করতে হবে। বছরের পর বছর ধরে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়েছে [illegible] পাহাড়ের বনস্পতি প্রায় নেই বললেই হয়। গাছ না থাকলে, গাছের শিকড় না থাকলে আলগা মাটি-পাথর আট্‌কে থাকবে কিসের টানে? ...এ সব কথা আজ চিন্তা করা নিরর্থক। অতীতের ভুলের খেসারত দিতে হবে। হিমালয়ের বুকে আজ নতুন [illegible] মোটরোপযোগী রাস্তার প্রয়োজন। তা হলেই এর খনিজ-সম্পদ থেকে, বনজ-সম্পদ থেকে সমগ্র দেশ লাভবান হতে পারবে।

কল্পনায় মশগুল ছিলাম। হঠাৎ ঘোড়াটা পাশের একটা পাথরে হোঁচট খেলো। এমন কিছু মারাত্মক চোট নয়। হাড়-টাড় ভাঙেনি, শুধু একটু ছড়ে গেলো। কিন্তু সেই সামান্য একটু ছড়ে যাওয়া—ডায়েবেটিসের কল্যাণে অসামান্য হয়ে উঠতে আর [illegible] তায় আমি এখন সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক, সাহিত্যচর্চা করি। আমার এ শরীরকে অবহেলা করা চলে না। একটু টিংচার আয়োডিন লাগাব বলে তাড়াতাড়ি নামলাম। দেখি সামনের রাস্তায় কুড়ি থেকে ষাটের মধ্যে বয়স জনা চারেক পুরুষ দাঁড়িয়ে শতদ্রুর দিকে মুখ করে অতি আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। কি ব্যাপার—কি দেখছে লোকগুলো! একটু এগিয়ে যেতেই কানে যেন একরাশ মিষ্টি সুরের ঝরণা ঝরে গেলো। দু-তিনটি তরুণী পাহাড়ের পাশে ঘাস কাটছিল—তারাই গান গাইছে। আমি কাছাকাছি আসতেই, কিন্নরকণ্ঠীরা চুপ করে গেলো, তারা চুপ করতেই এ বার অন্যদিক থেকে পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল। বুঝলাম এ ওই পথিকের দল। নিচে শতদ্রুর কলকল্লোল। সবুজ ঘাসের বুক চিরে লীলায়িত ছন্দে চলেছে কাস্তের হিল্লোল। আর তারই মাঝখানে কিন্নরকণ্ঠী তরুণীদের গানের জবাব দিচ্ছে পথচারী পুরুষের।—এই

তো জীবন, কোথায় চলেছিল। পথিকের দল—হয়ত কোনো কাজে। সুরের মায়ায় পথ ভুলিয়ে দিলো। ভাবলে, যাই না দু'দণ্ড জিরিয়ে। না হয় একটু দেরী করেই পৌছানো যাবে। জীবনের অমৃত-রস ওরাই জানে পান করতে। ওদের গানের ভাষা বুঝিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম যে ওরা এক অনুপম রস-মাধুরীর আস্বাদ নিচ্ছে। বুঝেছিলাম, ওদের মুখ-চোখের রঙ দেখে। রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখ, মলিন শীর্ণ চেহারা, ময়লা ছেঁড়া পোশাক। ওদের জীবনে যদি এমনি মধুক্ষরা মুহূর্তগুলো না আসে—তবে কি নিয়ে বাঁচবে ওরা! ওদের জীবনে এই ক্ষণিক মুর্হূতগুলোর দাম অনেক। বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই পরম মধুর ক্ষণগুলোকে। ওদের জীবনকে রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে ভরে দিতে হবে। কিন্তু সেটা সেদিনই সম্ভব যেদিন এই রুক্ষ পর্বতের কায়াকল্প হবে, বসুন্ধরা যেদিন তার বুকের ভাণ্ডার উজাড় করে দেবে।

রামপুর এখনও আসেনি। পথের বাঁ-পাশে খানিকটা জমি নিয়ে একটা বাগানবাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা একটু অস্বাভাবিক রকমের বড়। সহিস বললেন, কুলুর এক মহাজনের কারখানা। তেল, চাল, আটা—এই সবের কল। ওপারেই কুলু, পারাপারের জন্যে লোহার তার আর ঝোলানো খাঁচা আছে। এপারে হিমাচল প্রদেশ ওপারে পাঞ্জাব। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাণিজ্য-বুদ্ধি প্রখর বলতে হবে। পাশের খদ্দ থেকে একটা ছোট খাল কাটিয়ে নিয়ে তাই থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেছেন—খরচও এমন কিছু নয়। সেই বৈদ্যুতিক শক্তিতেই কারখানা চলছে। এ অঞ্চলে খুব অল্পবিত্তেরাও ঘরে বিজলী বাতি জ্বালাতে পারে।

আহা, কবে এমন দিন আসবে যেদিন এই পাহাড়ীদের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো দেখত পাব! শতদ্রু আর তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিপুল জলরাশিকে কবে মানুষ তার ঘরের কাজে লাগাতে পারবে? সময়ে বর্ষা না হলে চাষীর ক্ষেতের গম জোয়ার ক্ষেতেই শুকিয়ে যায়। নিরুপায় মানুষের অসহায় দৃষ্টি আকাশের করুণা ভিক্ষা করতে থাকে। কবে দেখব, নদীর স্রোতকে মোড় ফিরিয়ে দিগ্বিজয়ী মানুষ তার নিজের কল্যাণে নিয়োগ করতে পেরেছে!

কথা বলায় সহিসের ক্লান্তি নেই। এমনিতে এরা রাজ্যের সম্মানিত অতিথির সঙ্গে কথা বলার সাহস করে না। আমি কিন্তু প্রথমেই ওর ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম। ও আমায় ভালো মানুষ বলেই ধরে নিয়েছিল। অনেক কিছুই বলে চলেছিল লোকটা। তবে ওর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম মাস দু'য়েক আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার ব্যাপারে। কথায় কথায় জানলাম, দু-মাস আগে একটা গণ-সংঘর্ষ হয়ে গেছে তাতে 'কোলী'-রা না-কি খুব বাহাদুরী দেখিয়েছে। 'কোলী' জাতের লোকেরা পাহাড়ীদের মধ্যে সব থেকে সেরা শ্রমিক, সবচেয়ে বেশী খাটতে পারে। আবার সবচেয়ে বেশী উৎপীড়িত, অন্ত্যজ। একাধারে চামার, জোলা এবং মেথর। তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই নিজস্ব জমি আছে। মনিবেরা মরা জানোয়ারের ছালটার দাম না নিয়ে ছাড়েন না। উচ্চবর্ণের লোকের বাড়ি তো দূরের কথা বাড়ির উঠোন কি আস্তাবলের ছায়ার ত্রিসীমানায় যাবারও হুকুম নেই। স্বোপার্জিত অর্থে ভালো বাড়ি বানাবার অধিকারও নেই। কারণ তাতে বড় জাতের ওপর টেক্কা মারা হবে।

যদিও খড়কুটোর ঘর আগুনের আঁচে জ্বলে উঠতে দেরি লাগে না। তবুও ঘরে ঘরে নতুন হাওয়ার ঢেউ লাগল—লাগল আগুন। কোলীরা বললে, 'আমরা কি মানুষ নই?'—এ সব কথার আলোচনায় বিপদের ভয় আছে জেনেও সহিস নিজের আবেগ সম্বরণ করতে পারছিল না। তাই ইতস্তত করে সব কিছুই বলে ফেলল, সে যা বললে, সে'সব কথাই আমি আবার রামপুরের সরকারী মহলে শুনেছিলাম। ঘটনার দু'বারের বর্ণনায় কোনো তফাৎ ছিল না। তফাৎ ছিল অন্য জায়গায়। মেহনতী সহিসের হৃদয় জনতার প্রতি, তাদের নেতা অনুলাল মাস্টারের প্রতি সহানুভূতিতে ভরপুর ছিল। সে অবশ্য সরকারপক্ষকে তেমন দোষ দেয়নি। কিন্তু সরকারী অফিসারেরা আমায় যা বললেন, তাতে অনুলাল আর তার দলবলকে একদল লুচ্চা, মাতাল, দুর্বৃত্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টাই শুধু দেখলাম।

আমার ধারণা ছিল, রামপুর ছাড়িয়ে গিয়ে ডাকবাংলো পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজধানীর প্রায় মাইল খানেক আগেই দেখি একেবারে ডাকবাংলোর সামনে এসে হাজির হয়েছি। এ রাজ্যের ডাকবাংলো আর অতিথিশালা দুই-ই এক। কাজেই জায়গাটি সুন্দর করে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি নেই। শতদ্রুর ধারে ধারে এই রকম ফলে-ফুলে সজ্জিত বাগান-ঘেরা বাংলো একাধিক রয়েছে।

এ বাংলোটিতে বাগানের যত্ন কিছুটা কম মনে হলেও, আর সব বন্দোবস্ত যথেষ্ট ভালো। স্থানটি সুন্দর। ঘরগুলি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর করে সাজানো। এখানেই থাকতে হবে জেনে প্রথমে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কাঁধের ক্যামেরা নামিয়ে রেখে, আরাম চেয়ারটায় অঙ্গ ঢাললাম। কিন্তু যেই শুনলাম, রামপুরের আসল লোকালয় এখান থেকে এক মাইল দূরে, আমার মেজাজ বিগড়ে গেলো। আমার এখানে কিছু তপস্যা করতে আসা নয় যে নির্জনবাস করতে চাইব। আমি এখানের মানুষের সঙ্গে মিশতে, তাদের ঘরের কথা জানতে এসেছি। এখানের স্থানীয় স" খবর আমার জানতে হবে, আমায় কিন্নর দেশের পথের সন্ধান করতে হবে, চিনীদের বাসস্থানের ঠিকানা জোগাড় করতে হবে। আর যদি সারাদিনই শহরে রইলাম তো স্রেফ শুতে আসবার জন্যে আমার এই মহলের কি দরকার! এমনি সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় দেওয়ান সাহেবের লোক হাজির। কুশল প্রশ্নাদির পর জানানো হলো যে, ইচ্ছে করলে আমি দেওয়ান সাহেবের খাস বাংলোতেও থাকতে পারি। 'ইচ্ছে করলে' মানে? সেধো ভাত খাবি? না, হাত ধুয়ে বসে আছি। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ইচ্ছে জানিয়ে দিলাম—যদি তাঁর কোনো অসুবিধে না হয় তো তাঁর ওখানেই উঠি।

কর্মচারীটি বললেন, না তাঁর কিছুই অসুবিধে নেই। তাঁর পরিবার সিমলায়। তিনি একাই অত বড় বাড়িটায় বাস করেছেন।

আমার তো সঙ্কোচের কোনো বালাই নেই। কিন্তু দেওয়ান সাহেব, সর্দার বলদেব সিং, ভদ্রলোক প্রথমটায় বোধহয় একটু সঙ্কোচের মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁর বিভাগীয় প্রধান, হিমাচল প্রদেশের চীফ কমিশনার এন. সি. মেহতা চিঠিতে আমার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন, তা পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে এত বড় একটা লোককে তাঁর 'কুটিরে' রাখা মানে দস্তুরমতো কষ্ট দেওয়া। কিসে আমি তৃপ্তি পাব, কি করলে

আমার যথেষ্ট সেবা হবে—ভদ্রলোক ভেবেই আকুল। তবে সুখের কথা, কয়েক মিনিট পরেই তিনি তাঁর অতিথির স্বরূপ বুঝতে পেরে গেলেন। বুঝলেন যে, এর মধ্যেই আমি তাঁর বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছি। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম বাইরের ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনাই হচ্ছিল, ক্রমে আমরা ঘরোয়া কথায় চলে এলাম।

সর্দার বলদেব সিং লোকটির একটু পরিচয় দিই এখানে। আচার ব্যবহারে চাল-চলনে কথায়-বার্তায় অমায়িক ভদ্রলোক। বাড়ি ছিল কোয়েটায়—লক্ষাধিক টাকার পৈতৃক সম্পত্তি, বাড়িঘর, জায়গা-জমি। নিজে সরকারী চাকরি করছেন প্রায় হাজার টাকার ওপর মাইনে। সুখী পরিবার। স্বচ্ছন্দেই দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময় এল আগস্ট, ১৯৪৭-এর প্রলয়। এক আগুনে ভস্মসাৎ হলো বিশাল পুরী, মোটর, তছনছ হয়ে গেলো জীবনের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা। ভাগ্যের দয়ায় জীবনহানি হয়নি। সরকারী অফিসের কল্যাণে সময় মতো বিমানের সাহায্যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। রাতারাতি শরণার্থীদের দলে ভিড়ে গেলেন। চাকরিও একটা মিলে গেলো। কোনোমতে পায়ের তলায় মাটি পেলেন। কিন্তু সারাটা জীবন যার কেটেছে ভোগবিলাসে, কোয়েটার মতো জায়গায়, পৃথিবীর মধ্যে সেরা মেওয়া, দুম্বা আর ভেড়ার মাংসের ভাণ্ডার যেখানে, তার পক্ষে রামপুরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে থাকা যে কি কষ্টকর তা কে বুঝবে। ন'মাসে-ছ'মাসে মাংস পাওয়া যায় কি না যায়। ভালো তরিতরকারী জোটে না। পাবার মধ্যে, ডাল আর আলু। বেচারা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। বার বার বলতে লাগলেন—কি দিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করি। এ পোড়া-দেশে কিছুই পাওয়া যায় না। গৃহস্বামীর পক্ষে কথাটা হয়ত ঠিকই। অতিথি সেবার জন্যে, অভ্যর্থনার জন্যে স্থূল বস্তুর অভাব হয়ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অতিথির দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় কাম্য ছিল একটা সহৃদয় আন্তরিকতা আর সে বস্তুটার অভাব ছিল না গৃহস্বামী সর্দার বলদেব সিংয়ের।

সিমলায় থাকাকালীন একবার ইনসুলিন নিয়েছিলাম, নইলে এলাহাবাদ ছাড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত পানমেলিট্স বড়িতেই কাজ চলেছে। কিন্তু কথায় বলে, রিপু-রোগ-পাবক আর পাপ, এ সবকে ছোট করে ধরতে নেই ইঞ্জেক্সানের সরঞ্জাম যখন সঙ্গেই আছে তখন নিজেই নেওয়া যাক ফুঁড়ে। শুনলাম সর্দারজী এ বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, ওঁর পিতৃদেবেরও ডায়েবেটিস্ ছিল। পিতৃ-শুশ্রুষা করে করে এ ব্যাপারে নিপুণতা অর্জন করেছেন। দেখলাম সত্যিই তাই—কখন যে পুট করে ছুঁচটি ফুটিয়ে দিয়ে তুলে নিলেন, বুঝতেও পারা গেলো না।

রামপুর

সারা ভারতে অসংখ্য রামপুর আছে। উত্তরপ্রদেশেই এই নামে আর একটি দেশীয় রাজ্য রয়েছে। বোঝবার সুবিধের জন্য তাই এ রামপুরকে রামপুর-বুশহর আখ্যা দিচ্ছি। আসলে, রামপুরের অনেক আগেই বুশহর (বিসাইট) রাজ্যের সীমানা শেষ হয়ে গেছে। বুশহর রাজ্যটি নেহাত ছোট নয়. আয়তন প্রায় ৩৮১০ বর্গ মাইল। তবে জনসংখ্যা সে অনুপাতে কম, মাত্র এক লাখ বারো হাজার। চিনী পরগনা এ রাজ্যের দুই-

তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত। তারও লোকসংখ্যা নগণ্য, মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো। বর্তমান রাজধানী রামপুর—আজ থেকে দুশো বছর আগে স্থাপিত। তারও আগে পছন্দমতো রাজধানীর খোঁজে বংশের রাজারা কামরু, সরাহন, কল্যাণপুর প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছেন—অস্থায়ীভাবে রাজধানী স্থাপনও করেছেন। এমিনভাবে ঘুরতে ঘুরতে রামপুরে এসে দেখলেন, জায়গাটা সরাহনের (৬৭১৩ ফিট) থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু (৩৯৭০ ফিট) তার ফলে তুষারপাতও পরিমাণে কম হবে। তাঁরা এমনি একটা জায়গাই খুঁজছিলেন যেখানে বরফ আর হিমেল হাওয়ার উৎপাত থেকে কিছুটা সুরক্ষিত থাকা যাবে। শোনা যায় একটা তেল-ভরা প্রদীপ জ্বেলে রেখে দেখা হয়েছিল, সেটা নিভে যায় কি-না। পিদিমটা সারারাত জ্বলায় প্রমাণ হলো যে, এখানে ঝঞ্ঝার উৎপাত কম। সেই থেকে রামপুরের ভাগ্য ফিরল। তার রাজধানীত্বে প্রমোশন হলো। এটা দুশো বছর আগের কথা।

ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার উপায় হলো বটে কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় একটা নগর গড়ে তোলা সহজ কথা নয়। একদিকে শতদ্রু আর একদিকে পাহাড়। মাঝখানে অতি অল্পই জায়গা। তাও এর মধ্যে সব ভরে গেছে। রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় এ সব দিকে অত নজর করা হয়নি। যেমন তেমন করে একটা রাজপ্রসাদ খাড়া করা হলো। আজকের দিনে সে মহল দেখলে ছোটখাট একা মন্দির ছাড়া আর কিছু মনে হওয়া শক্ত। শেষ রাজা পদম্ সিংও প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন। তবু তাঁর তৈরি রাজপ্রসাদ যা রয়েছে সেও এই সঙ্কীর্ণ রাজধানীর পক্ষে বেমানান। কিন্তু এত কিছু অসুবিধে সত্ত্বেও রামপুরে শহর গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে রাজ্যপাট সবই আজ গেছে। আজ আর রামপুর কোনো রাজার রাজধানী নয় কিন্তু শহরটার অস্তিত্ব তো কেউ লোপ করে দিতে পারবে না। প্রাসাদ, ইস্কুল, কাছারী সরকারী অফিস লোকজনের বসতি, স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে এর তো একটা মূল্য স্থায়ী হয়ে রইল। সে তোমার কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এখান থেকেই কিন্নর দেশের রাস্তা আরম্ভ হয়েছে।

পনেরোই মে। সকালে ঠিক করলাম এখানে দিন দুই থেকে সামনের যাত্রাপথ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জোগাড় করে নেব। দ্বিতীয় দিন শহর দেখতে বেরোলাম। বাইশ বছর আগে এ দেশে এসেছিলাম। কিছুই মনে নেই—থাকবার কথাও নয়। রাস্তার মাথায় সর্দার সাহেবের বাংলো। নিচে নামতেই আগে পড়ে বৌদ্ধ মন্দির, ঠিক তার গায়েই পুরোনো রাজপ্রাসাদ। রাজপুরীর ভেতরেও একটি দেবমন্দির রয়েছে। বৌদ্ধ মন্দিরে কঞ্জুর গ্রন্থাবলী এবং ঢোলকাকৃতি 'মানী' জপ করার যন্ত্র—তার গায়ে অসংখ্য মন্ত্র চিহ্নিত। মঠের পূজারী আগ্রহ সহকারে মন্দির দেখালেন। সেখান থেকে বেরোতেই সামনে, রাস্তার অপর পারে, মেয়েদের ইস্কুর। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন চেহারার ক্ষীণাঙ্গী ক'টি মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়ছে। বড় রাস্তা থেকে নেমে গলিঘুঁজি পার হয়ে বাজারের পথে চলে এলাম। একে রাস্তা বলতে হয় তাই বলা। নইলে এ রাস্তার আমি কোনো চাকাওয়ালা গাড়ি কখনও দেখতে পাইনি। এর পর থেকে আবার যে-রাস্তা শুরু হয়েছে—তাতে গাড়ি চালাতে হলে তো গাড়ির খোল-নলচেই পাল্টাতে হবে। রাস্তার দু'ধারে দোকান। বেশীরভাগ দোকানই অস্থায়ী। নিচে থেকে সাময়িকভাবে ওপরে

আনা হয়েছে। বেশীরভাগই খালি পড়ে রয়েছে। সম্ভবত সীজন এলে খানিক খানিক ভরবে। তখন কেনা-বেচায় সরগরম হবে। পাহাড় মুলুকের ঘরে পাথরের দেওয়াল হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। জঙ্গল থাকায় কাঠের দাম সস্তা। তবে কাঠের প্রচলন এ দিকে তেমন নেই। কিন্নর দেশে আবার খুব বেশী।

বাজার থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পুবমুখো হয়ে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠেছে। একদিক দিয়ে ঢালু পথ সোজা শতদ্রুর কিনারায় নেমে গেছে। এখান থেকে শতদ্রু-তীর দূরে নয়। তবে এত অসম্ভব জলের তোড় যে চট করে নেমে একটা ডুব দিয়ে আসব—সে উপায় নেই। নিচের দিকে একটা বৈষ্ণব মঠ আছে। কোনো সময়ে দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে এক নির্মোহী সাধু এসে এখানে এই মঠ স্থাপন করেন। মন্দিরের পাশেই ছোট একটি কুণ্ড। কুণ্ডটি পাকা করে বাঁধানো। তার ওপর একটি আচ্ছাদনও দেওয়া হয়েছে। আজকাল দুই 'সাধু'-র নিবাসস্থল হয়েছে এটি। সাধুদ্বয়ের যে খুব একটা ধর্মকর্মের রীতিনীতির জ্ঞান আছে সেটা মনে হলো না। মোহান্ত মশায় এখন উপস্থিত নেই। দ্বিতীয় জন যিনি রয়েছেন তিনি নিরক্ষর। বোধহয় এঁরা দু'জনেই স্থানীয়। সুতরাং বাইরের জগতের পরিচিতি কম। সাধুসমাজে এঁদের প্রতিপত্তি নেই। 'রম্‌তা যোগী' বলে একটা কথা আছে। আংশিকভাবে সেটা মেনে নেওয়ার যোগ্য। সারা জীবন ধরে নাই ঘুরুক—অন্তত একবার ভারত-পরিক্রমা দরকার। তাতে শিক্ষার প্রসার হয়।

পাণ্ডাদের ওপর সাধারণত সবাই বিরূপ। কিন্তু তারা যাত্রীদের অনেক উপকারে আসে। এ কথাটা আমি ভুলতে পারিনি। তেমনি ভবঘুরেদের পক্ষে এই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের আড্ডাগুলোও ভারী নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। বলতে কি, পয়সা-কড়ির অসাচ্ছল্য থাকলেও, মঠের দৌলতে দিব্যি ভারতভ্রমণ করা যায়, আর বৌদ্ধ পরিব্রাজক হলে তো কথাই নেই। সারা এশিয়ার দরজা তার জন্যে খোলা। তবে হ্যাঁ, তাষা-ঘটিত অসুবিধের কথা স্বতন্ত্র।

মঠের সাধুরা মূর্তি দেখাতে চাইলেন—আমিও মূর্তি দেখতে চাই। তবে আমার আগ্রহ ভাঙা-মূর্তি দেখার। তা এখানে ভাঙা-মূর্তি পাব কোথায়? নেহাতই অর্বাচীন শহর!

এক পরম বন্ধু-বৎসল সুহৃদ লাভ করেছি। বিদ্যাধরজী বিদ্যালঙ্কার; আসলে অমৃতসরের লোক। গুরুকুল কাংড়ীর স্নাতক। আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ। কিন্তু চাকরি করেন বন-বিভাগের খাজাঞ্চিখানায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এখানেই রয়ে গেছেন। লোকের কাছে শুনলাম, নবাগতদের সাহায্য করায় উনি অদ্বিতীয়। দু'দিনেই আমার আপন লোক হয়ে গেলেন। যাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে, আটা, চাল, চিনি, মসলা ইত্যাদি কেনবার কথা ভাবছিলাম। কেনা-কাটার ভারটা তাঁরই ঘাড়ে চাপালাম, তিনিও আনন্দে কাজে লেগে গেলেন।

বিদ্যালঙ্কার মশায়ের ওপর সওদা করার ভার দিয়ে, বাজারে বেরিয়ে পড়লাম। গরম কম্বল ইত্যাদির দরকার তো রয়েছেই। মনে ভাবলাম, এ সব পশমী জিনিস যখন ওপর থেকেই আসে তখন এখানে না কিনে, ওপরে গিয়ে কেনাই তো ভালো। কিন্তু আমার গোড়াতেই হিসেবে ভুল হয়েছিল। যদিও পট্টু, গুদমা, পট্টিকনম্-সুংনম্ স্পুতেই

উৎপন্ন হয় কিন্তু এর বাজার রামপুরেই। এখানে বছরে তিনবার—তার মধ্যে একবার কার্তিক মাসে বেশ বড় মেলা বসে। তখন এখানে জিনিস যে দামে বিক্রী হয় তেমন সস্তা ওপরে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পশমী চাদর যা কিনতে পাওয়া যায় সে তো রামপুরেই তৈরি হয়। তিব্বত থেকে কাঁচা পশম আমদানি হয়।

গত পাঁচ বছর ধরে আমার এক অকর্মণ্য পুরাতন ভৃত্য আমার সঙ্গের সাথী হয়েছিল। এখানে এসে হিমালয় বৈরাগ্য হওয়ায় আমার মায়া কাটিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। খুঁজে পাচ্ছি না—আমার ছুরিটার কথা বলছি। সেটা দিয়ে না যেত ফল তরকারীর খোসা ছাড়ানো—না যেত পেন্‌সিল কাটা। কি যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ফেলে দিতেও মায়া হতো, আহা কত দিনের— কত দূর-দূরান্তের সঙ্গী। কোথায় না গেছে আমার সঙ্গে? রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, পৃথিবী ঘুরে এসেছে। এত দিনে গেলো ছাড়ি! মুসাফিরের শোক করা নিষেধ। কাজেই আরেকটি চাকু সংগ্রহের চেষ্টায় যাওয়া গেলো। কাঠের বাঁট-লাগানো হাতরাসের ছুরিগুলো আগে দু'পয়সা করে বিক্রী হতো, তার দাম চাইলে ছ'আনা। আরেকটা বললে, 'আসল ইস্পাতের ছুরি'—দাম পাঁচ সিকে। আগে হলে চার আনাও কেউ দিত না। আমি তো এমনিতেই হাত আল্‌গা। চারগুণ দাম দিয়ে জিনিস কিনতে অভ্যস্ত। এখানে আবার আটগুণও দাম। কিন্তু কি আর করা যাবে; কিনতে যখন হবেই, তখন খামোকা দর-দস্তুর করা।

সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আর পথের খবর নিয়েই কাটালাম। যা বুঝলাম তাতে বাইশ বছর আগের স্মৃতি এবং নিজের স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করা শ্রেয় বলে মনে হলো না। জনাকয়েক লোক পেলাম—তারা সবাই চিনী পরগনার লোক। স্বর্গীয় রাজাসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্যারেলালজীর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনিও এ দিককার লোক। আহার্য সম্বন্ধে যা শুনলাম—তাতে তো চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। শাক-সব্জী কিছুই এখন পাওয়া যাবে না। সে সব পেতে এখন ঢের দেরী। তবে হ্যাঁ, শুকনো মাংস পাওয়া যাবে বৈকি। না হলে চলবে কেমন করে। বেঁচে থাকো কিন্নরভূমি! জয় হোক।

রাস্তায় যা জ্ঞান হলো তা আরও অপূর্ব। মন বললে : চিনীকে গ্রীষ্মাবাস করতে চাইলে ফি-বছর নিচে নামবার আবদার যে ছাড়তে হবে!

বিকেলে হাইস্কুলের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে চা-পার্টির আয়োজন হয়েছিল। পার্টিতে রাজধানীর রাজপুরুষেরা ছাড়াও অন্যান্য গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। আলাপ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হলো। আজকাল থালাভরা মেঠাই দেখবার সুযোগ বড় একটা আসেনা; যদি বা এল, তা এমন সময়ে যখন তার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করা আমার নাগালের বাইরে। মেঠাই খাওয়া তো এখন গোমাংস তুল্য! বিধির বিধানে চা-টুকু পর্যন্ত বিনা চিনিতে খেতে হয়—এমনি বরাত। সে' দিন কথায় কথায় বন্ধুবর পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাসের কথা উঠল। রায় কৃষ্ণদাসজী তাঁর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। —হ্যাঁ, ডায়েবেটিসকে আচ্ছা জব্দ করেছেন ভদ্রলোক। ওঁর বাবা তো নেই। যাচ্ছি কাশী, আর কাশীর মিষ্টি খাব না! এ আবার কোন দিশী কথা? ইন্‌সুলিন ইঞ্জেক্‌সনের সরঞ্জাম সঙ্গেই থাকে— নিজের হাতেই ছুঁচটা ফুটিয়ে

নিলেন—ব্যাস লেগে গেলেন ডান হাতের ব্যাপারে। লাড্ডু, অমৃতির থালা দেখতে দেখতে লোপাট—এই না হলে মানুষ! তা তাঁর মহাপুরুষত্বে আমিও আস্থাবান। তবে কি-না আমার নিজের ওটা ঠিক সাহসে কুলোয় না। আর ছুঁচ-ফোটানো বিদ্যেটাও তেমন রপ্ত হয়নি। তার মানে এ নয় যে, অন্য লোককে মিষ্টি খেতে দেখলে জিভে জল আসবে। জিভ আমার তেমন বেয়াক্কেলে নয়।

অতিথিদের চা-পান শেষ হলে ইস্কুলের ছেলেদেরও লাড্ডু-মেঠাই বিলি করা হলো। আহা এমন ইস্কুল কি আর আজকাল হয়? হলে যে সবাই পড়ুয়া হতে চাইত। সব শেষে প্রধান অতিথির ভাষণ। তা সে আর এমন কি কঠিন কর্ম। কলমবাগীশ হবার আগে থেকেই এ শর্মা বাক্যবাগীশ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে ভাবনার কথাটা এখানে এই যে, শ্রোতার দল পাঁচমিশেলী। একদিকে আছেন, উচ্চশিক্ষিত অফিসার মহল তথা শিক্ষকবর্গ আরেক দিকে ছেলের দল। ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, ছেলেপুলেদের লাড্ডু-মেঠাই যথেষ্ট পরিমাণেই দেওয়া হয়েছে কাজেই বচনামৃতটা ওদের নাই-বা পরিবেশণ করলাম; ওটা বাকীদের জন্যই থাক। কিন্তু তাতেও সমস্যা কম হলো না।

আগস্ট উনিশ-শো সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজাদের রাজত্ব ঘুচেছে। আটচল্লিশের মার্চে প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে এ সব কথাই সত্যি। আমি নিজেও এ সব সত্যি বলে মানছি। কিন্তু এখানকার লোক কি এ সব কথার অর্থ বুঝেছে? এরা যে এখনো প্রধান কর্মকর্তাকে (চীফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার) 'দেওয়ান সাহেব' বলে ডাকে! আর অশিক্ষিত জনসাধারণকে কি বোঝাব? স্বয়ং রাজকর্মচারীরাই কি পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন? আমলাতান্ত্রিক সরকারী কর্মচারী আর প্রজাশাসিত রাষ্ট্রের কর্মকর্তার ভূমিকায় যে মৌলিক পার্থক্য—সে সম্পর্কে তাঁরা কি ওয়াকিফহাল? সে যাইহোক—আমার স্বপ্নের কথা, আমি তাঁদের দু'চার কথায় শোনালাম। বললাম, হিমাচল প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ইস্কুল খোলা হবে। কেউ নিরক্ষর থাকবে না। ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো জ্বলবে; ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলবে। রুক্ষ পাহাড়ী উপত্যকা ফুলে ফলে সবুজে ভরে থাকবে। মাটির তলা থেকে লুকানো খনিজ সম্পদ কুড়িয়ে আনা হবে। দেশ ঐশ্বর্যে ভরে যাবে— ইতস্তত চলমান মোটরের ভেঁপুতে মুখর হয়ে উঠবে পাহাড়তলীর রাজপথ। তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের যাত্রার কথাও কিছু কিছু বললাম।

পরের দিন রবিবার ছিল-- তারিখ ষোলই মে। তবে আমার ছুটি ছিল না কুঁজো চিৎ হয়ে শোয় না। কনৌর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু লেখবার রয়েছে। লেখার যে এত সাত-সতেরো ঝামেলা তা আগে ভাবিনি। এখন পথের মাঝখানে ইতিহাস এসে চোখ রাঙাচ্ছে। ফাঁকি দেবার পথ নেই। আগে জানলে, সময় থাকতে কিছু কিছু সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে নিতাম। এখন আর উপায় কি? যা হাতের কাছে আছে উল্টে পাল্টে দেখা যাক। সর্দারজীর সঙ্গে তোষাখানা দেখতে চললাম। মহারাজ পদম্ সিংহের আমলের নতুন মহলের সীমানার মধ্যেই তোষখানা। চিন্তাধারার দিক দিয়ে মহারাজ প্রাচীনপন্থীই ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর অনেক আলাপ হয়েছিল ১৯২২

গাগে। ভারী সাদাসিধে স্বভাবের লোক। আশ্চর্য লাগে, প্রাচীনপন্থী হয়েও এমন নবরীতির প্রাসাদ তৈরি করালেন কেমন করে? তবে প্রসাদের কাঠামো যত নতুনই হোক না, তোষাখানা কিন্তু সেই পুরনো ধাঁচের। তার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতির ছাপ ঠিকই বজায় রয়েছে। সেই কাঠের খুপরীর মতো ছোট ছোট অন্ধকার ঘর, সেই মান্ধাতার আমলের তালা। তোষাখানায় সম্পত্তির মধ্যে কিছু রূপোর বাসনপত্র, কতকগুলো বর্শা-বল্লম, পুরনো মরচে-ধরা ক'টা তলোয়ার আর কিছু গদী, মসনদের জরির খোল, এই পড়ে ছিল। নতুন সরকারের ইচ্ছে সেগুলো বেচে কিছু পয়সা করা। বিধবা রাণীমা তাতে রাজী নন। তাঁর মতে ওতে রাজবংশের অপমান হয়। নতুন করে এ সব কিনতে গেলে অবশ্য খরচ আছে। তবে এগুলো নিলামে তুলেই বা সরকার ক'টা পয়সা পাবে? চার-পাঁচ হাজার টাকার বেশী দাম উঠবে না। তোষাখানার গালভরা নাম শুনে হয়ত ওপর ওয়ালাদের খুব একটা জাঁকজমকের ব্যাপারে মনে হয়েছে। বোধহয় তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, এখানে দ্বাপরের কুরুকুলের রাজৈশ্বর্য আর কলিযুগের সমস্ত ধনদৌলত জমা হয়ে আছে; মণিমাণিক্য যা আছে তার ইয়ত্তা নেই! আমার তো দেখে-শুনে মনে হলো সবই ভুয়ো। ঐশ্বর্য যদি কোনোকালে কিছু থেকেও থাকে আজ আর কিছু নেই। থাকলেও রাণীমার হাতে পড়েনি। এ সব জিনিসের মধ্যে থেকে বাছাই করে পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়ে রাখার উপযোগী দু-শ'টা জিনিস সরিয়ে রেখে বাকী সব রাণী বেচারীকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

সরকার এ দিকে তোষাখানার ওপর বেশ কড়া নজর রেখেছেন। ওদিকে রাজ-আস্তাবলের ভালো ভালো খচ্চরগুলো কোন দিক দিয়ে যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো সে খবর কেউ রাখে না। হিমাচল সরকারের ভোগেও এল না—রাণীও পেলেন না। সব 'ন দেবায় ন ধর্মায়' হয়ে গেলো।

রাণীমা চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। ইনি ছিলেন পরলোকগত রাজসাহেবের বড়রাণী (দুয়োরাণী)। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা প্রাণাদপিগরীয়সী'। ছোটরাণীর বয়স কাঁচা। কাজেই স্বভাবতই রাজা তাঁর বশম্বদ হয়েছিলেন। চন্দ্রবংশের কথা জানি না, সূর্যবংশের ধারাই এই। রাজা তাই যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তিই যে শুধু ছোটরাণী আর তাঁর ছেলেকে দিয়ে গেলেন তাই নয়, সিমলায় এখানে ওখানে যা দু-চারখানা বাড়িঘর, জমি-জায়গা ছিল, তারও অধিকাংশ ছোট-কুমারের নামে লিখে দিয়ে গেলেন। বেচারী বড়রাণী সারা জীবন উপেক্ষিতা হয়ে রইলেন। অবশ্য এ কথা রাজাসাহেব কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাঁর চোখ বোঁজার পর বছর না ঘুরতেই ইংরেজ ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে দেশে পাড়ি দেবে। আর সূর্যবংশ—চন্দ্রবংশাবতংশ-শাসিত বুশহর রাজ্য স্বত্ব বিসর্জন দিয়ে হিমাচল প্রদেশ বনে যাবে। এ কথা ভাবলে তিনি বড়রাণী বা বড়কুমারকে এভাবে পথে বসিয়ে যেতেন না। তাঁর মন এমন নিষ্ঠুর ছিল না। তিনি সহজ বুদ্ধিতে বুঝেছিলেন, বড়কুমার তো রাজ্যের উত্তরাধিকারীই হচ্ছেন কাজেই তাঁর জন্যে আর ভাবনার কি আছে?

বেচারী রাণীমা! তোষাখানা আর খচ্চরের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেলো। আজ তাঁর সম্বলের মধ্যে সম্প্রতি হাতে-আসা বিশ ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু তাতে আর ক'দিন যাবে? দুশ্চিন্তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও আছে তাঁর। চোখের

সামনে দেখলেন, এক মৃত রাজপুত্রের বিধবা পত্নীর দু'শো টাকার মাসোহারা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। ভদ্রমহিলার সে কি দুর্গতি! বেনের দোকানে ধার জমে গেছে। সেও মালপত্র দেওয়া বন্ধ করেছে। হাতের টাকা যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখনও যদি পরমায়ুর কোঠা শেষ না হয়? সেদিন তিনি কার দোরে হাত পাতবেন? এই সাতমহলা ইন্দ্রপুরী তো তাঁকে বসিয়ে খাওয়াবে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সরকার তো পেনসন দেবেই। তার পরিমাণ ষাট হাজার টাকা হবে। আপনার বা আপনার ছেলের জীবনের পক্ষে তা যথেষ্ট। সর্দারজীও অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। রাণী এ কালের নব্য শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়ে নন যে, বুদ্ধি দিয়ে, আইন কানুন তলিয়ে বুঝে ধৈর্য ধরবার চেষ্টা করবেন। ছেলেটিও নেহাত নাবালক তের-চৌদ্দ বছর মাত্র বয়স। তার সতীন তো ঝগড়ার জন্যে তৈরি হয়েই আছেন। রাজ্যপাট চলে গেছে কিন্তু রাজা-রাজড়ার আদব-কায়দা তো রাতারাতি যায় না! তার জন্যে সময় লাগে। সুতরাং আয়ের পথ যতই সঙ্কুচিত হোক—খরচ কমছে না। সব দিক দিয়ে বড়রাণীর অবস্থা কাহিল।

যেখানে যাই মার্চ-বিপ্লবে কথা। সেই ঘটনার বিবরণ আমিও সংবাদপত্রে পড়েছিলাম—বুশহরের এই সর্বার্থ-সার্থক প্রজা-বিদ্রোহের কথা। রাজার তরফে দমননীতির প্রয়োগ বা দাবিয়ে দেবার চেষ্টা যে কম হয়নি তা বলতে হবে না কিন্তু সফল হয়নি। উল্টে, রাজ্যের সব পুলিশ-সিপাই মায় অফিসার গোষ্ঠী সবাই প্রজাদের হাতে কয়েদ হয়ে পড়ে। চৈহরীতেও অনুরূপ গণবিদ্রোহ হয়েছে জেনে আন্তরিক খুশি হয়েছিলাম। বুশহরের বিদ্রোহ তো রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে এটি বোধ হয় সবচেয়ে অনুন্নত। তবুও যে এখানে এমন একটা বিদ্রোহ হলো, আর শুধু হলো তাই নয়—সাফল্যের গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হলো—এর পেছনের ইতিহাসটা ভালো করে বোঝা দরকার।

স্বাধীনতার পরে পরেই ভারত সরকার দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গকে দিল্লীতে ডেকে এনে একটা সলা-পরামর্শ করলেন। তাতে সরকার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রাজা এবং প্রজা উভয়েরই হিতার্থে সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্যগুলির প্রায় সবগুলিকেই একত্র করে একটি নতুন প্রদেশের রূপ দেওয়া হবে। নাম দেওয়া হবে—হিমাচল প্রদেশ এবং রাজ্য বিলুপ্তির ফলে রাজন্যবর্গের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে, সরক্যর তা অর্থ দিয়ে পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন। বলা বাহুল্য, রাজাদের মধ্যে এ রকম প্রস্তাবের ফলে মক্ষিকা-গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। ক্ষমতার নেশা, স্বেচ্ছাচারিতার নেশা চট করে কি ছাড়া যায়? তবে এ ক্ষেত্রে রাজাদের একটি প্রধান আতঙ্কের কারণ ছিল, তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন, এখন আর ইংরেজ প্রভু নেই যে বিপদ আপদে রক্ষা করবে। একবার একটু ঢিলে পেলে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অত্যাচারের শোধ তুলতে প্রজারা ক্ষেপা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই তাঁরা মনে করলেন, দরকার কি বাবা ঝামেলায়—শেষে কি দু'কুল যাবে? তার চেয়ে পেনসনের নামে যে টাকাটা পকেটে আসছে, তাই নিয়ে মানে মানে সরে দাঁড়ানোই শ্রেয়। আস্তে আস্তে, ইতস্তত করতে করতে প্রায় সবাই মাথা নোয়ালেন। কেবল, বিলাসপুরের মতো দু-একটা রিয়াসৎকে স্বতন্ত্র থাকার অনুমতি দেওয়া হলো, কেন যে অনুমতি দেওয়া হলো,

সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমার মতে, এ একটা ঘোরতর অন্যায় কাজ। হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলের একটা প্রাকৃতিক অখণ্ডতা, একটা ভৌগলিক ঐক্য রয়েছে। খামখেয়ালী করে সেটা ভাঙতে চাওয়া অযৌক্তিক।

এ সব বিষয়ে যে-কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে স্থানীয় প্রজাদের সঙ্গে দস্তুরমতো আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন; তাদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাজাদের স্বার্থের খাতিরে যেমন তেমন করে ভাগাভাগি করার কুফল সুদূর-প্রসারী হতে বাধ্য। সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে যে প্রশংসনীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। ভারত ত্যাগের ঠিক আগে ইংরেজরা যে চাল চেলে গিয়েছিল—তিনি অনমনীয় দৃঢ়তায় তাকে প্রায় বানচাল করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালের চেহারায় আবার সেই পুরনো বৃটিশ কায়দার ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত এর পেছনে আছে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের বয়ঃক্লান্ত মনের শৈথিল্য। হয়ত এই ছেঁড়া ন্যাতার ব্যাপারটা তাঁরা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাইছেন। তাঁদের শিরঃপীড়া অবশ্য এতে হ্রাস হবে কিন্তু আগামী দিনের জন্য, তাঁদের সন্তান সন্ততিদের জন্য তাঁরা কি বিষবৃক্ষ রোপণ করে যাচ্ছেন না?

বেশ তো, হিমাচল প্রদেশ যদি গঠন করাই দরকার মনে হয়ে থাকে তো এ অঞ্চলের সমগ্র পার্বত্য ভূ-ভাগকেই (যা স্বাভাবিকতাবেই ঐক্য বজায় রেখে চলেছে) এক সঙ্গে নাও, তার মধ্যে দেশীয় রাজ্য সব ক'টি তো সম্মিলিত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে আলমোড়া, নৈনিতাল, গাড়োয়াল, সিমলা এবং কাংড়া উপত্যকার সমস্ত জেলা, উপরন্তু পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর আর গুরুদাসপুর জেলার পাহাড়ী এলাকাগুলিও সম্মিলিত হওয়া চাই।

সে যাইহোক, আমরা বলছিলাম—বুশহরের প্রজা-বিদ্রোহের কথা। সেই কথায় ফিরে আসা যাক। যখন দিল্লীতে বসে মহারথীরা দেশীয় রাজ্যসমূহের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন এমন সময় বুশহরের জনসাধারণের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো। তাদের নেতা, সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে দিল্লীতেই ছিলেন। ব্যস—নেতৃস্থানীয় লোকেরা দিল্লী থেকে খবর নিয়ে সোজা রামপুরে এসে জনসংহতির কাজে নেমে পড়লেন। দাবী হলো—বুশহরে প্রজাতন্ত্র চাই। বুশহরের (মনে রাখতে হবে, সমগ্র হিমাচল প্রদেশের কথা নয়, কেবল মাত্র বুশহর রিয়াসতের কথা) প্রজারা নিজেদের নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডল চায়। তেহরীতে যদি সম্ভব হয়ে থাকে তো এখানেই বা অসম্ভব কিসে? বুশহরের স্বাধীনতাকামী প্রজাদের জনপ্রিয় নেতা হলেন, মাস্টার অনুলাল। পেশা, অধ্যাপনা। এখানে তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারার একটু পরিচয় দিই।

রাজধানী রামপুরে পাছে বিদ্রোহ সফল না হয়, বা প্রস্তুতির পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়, এই ভেবে অনুলালজী রাজধানী ছাড়িয়ে কুড়ি মাইল দূরে সরাহনে গিয়ে ঘাঁটি করলেন। ব্যস—সেখানে গিয়েই গরম-গরম বক্তৃতার ফুলকি ছড়ানো শুরু হলো। গোলাম শাহী ধ্বংস কর, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা কর ইত্যাদি। লোকটি যে বেশ উর্বর-মস্তিষ্ক ছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ, এই তো মওকা! কোনোমতে একটু জনপ্রিয় হতে পারলে আর ভাবনা কি? মুখ্যমন্ত্রীত্ব আর কে আটকায়? সুযোগ তিনি আর হাতছাড়া করলেন

না। আর পুলিশ কর্মচারীরাও সব তেমনি। সব তো সেকালের হস্তিমূর্খের দল। নিজেরাই কিছু বোঝে না তো অপরকে কি বোঝাবে? বেশ তো লোকটা বলছে—তাকে বলতে দাও না। তার কথার মালসা শেষ হোক। তারপর তোমারও প্রচারের ফুলঝুড়ি ছড়াও না। লোককে বোঝাও যে—সে'দিন আর নেই, দেশের শাসন-ব্যবস্থা বদলে গেছে। এখন রাজার কোনো তোয়াক্কা করতে হবে না। প্রজাতন্ত্রে প্রতিটি প্রজার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। হিমাচল প্রদেশ—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতোই একটি প্রদেশ মাত্র—অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের শাসনভুক্ত। তা এত কথা কি নিজেরা বোঝে যে লোককে বোঝাবে? শেখবার মধ্যে শিখেছে এক মোসাহেবী। বৃটিশ আমলের খয়ের খাঁ এক-একটি। আর শিখেছে কোথাও কেউ কিছু বেসুরো বলেছে কি অমনি তার গলা টিপে ধরো। এ ক্ষেত্রেও সেই একই ওষুধ কাজে লাগানো হলো। মহান্ নেতা অনুলালের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বরুলো। অনুলালকে রামপুরে চালান দেওয়া হলো আর জনতার উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেলো। পুলিশ অনুলালকে নিয়ে গওরা গ্রামে পৌঁছাবার আগেই সেখানে তিন চার-শো লোকের জমায়েত হয়ে গেলো। মাস্টার সেখানে আরেক দফা অগ্নিবর্ষণ করলেন। জনতা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের হাত থেকে নেতাকে ছিনিয়ে নিয়ে, উল্টে গ্রেপ্তারকারীদেরই গ্রেপ্তার করে ফেলল। খবর দাবানলের মতো রাজধানীতে পৌঁছালো।

খবর শুনে, পরের দিন জজসাহেব, ডি.এস.পি, এ.এস.পি. পুলিশ-ফৌজ নিয়ে এসে হাজির। জনগণ নেতাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। আর কি? চালাও গুলি! চলল গুলি—কিছুসংখ্যক লোক আহত হলো, সুখের বিষয় একজনও মরেনি। লোকেরা তখনকার মতো গা ঢাকা দিয়ে দূরে রইল। যেই পুলিশের গুলি ফুরিয়ে গেলো ব্যস, অমনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অফিসারের বাঁশি কেড়ে নেওয়া হলো। অফিসার বিদ্রোহীদের সঙ্গে কথা বললেন। অস্ত্রশস্ত্রসহ পুলিশ-পুঙ্গবেরা অতঃপর বিদ্রোহী জনতার হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

বুশহরের মুকুটহীন সম্রাট মাস্টার অনুলাল পুলিশ অফিসারের বিরাট দলকে বন্দী করে শোভাযাত্রা করে রামপুর অভিমুখে রওনা হলেন। এ সব নমুনা দেখে কারো মনে আর সন্দেহ রইল না যে, জনতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ন'মাইল ব্যাপী পাহাড়ী সড়কের দু'ধারে দর্শক একেবারে ভেঙে পড়ল। সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলে গতকাল যারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল, আজ তারা আর তাদের দলবল সব বন্দী অবস্থায় চলেছে। মাস্টার অনুলালজীর জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাশ ভরে গেলো। মাস্টার প্রকৃত নেতা। অত উত্তেজনার মধ্যেও জনতাকে তিনি শান্ত করে রেখেছেন। একটা লুঠতরাজ হয়নি, বন্দীদের ওপর একটা আঘাত আসেনি। শহরের বণিক-মহাজনের দল তো সে'দিন জীবনসংশয় জেনে বসেছিল। কিন্তু অনুলালের সুযোগ্য নেতৃত্বে সব দিকে স্বাভাবিকতা বজায় ছিল। যারা তাঁকে বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তাদের এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার দিনে কি অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে সে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল—কিন্তু এ কৃতজ্ঞতা আমলাতন্ত্রের কাছে আশা করাই বৃথা।

রামপুরের বিদ্রোহের খবর সিমলায় পৌঁছাতেই, সেখান থেকে সর্দার বলদেব সিং সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশ-ফৌজ সমেত রওনা হয়ে পড়লেন। তিনি রামপুরে পা দেওয়ার আগেই প্রজামণ্ডলীর সভাপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পুলিশ ফিরে যেতে শেখেনি। আর এখানে তো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে—সীমান্তবর্তী এলাকা। শেষে ভারত ইউনিয়নের হাতছাড়া হয়ে যাবে? ব্যাপারটা যতদূর মনে হয় আপোষেই মিটে গেলো। তবে অনুলালের দল এ কথা স্বীকার করে না। তারা বলে কয়েকজনকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। পুলিশরা একটা বাছুরও না-কি মেরে ফেলেছিল। যারা নিরপেক্ষ তারা বলে, ও সব মানুষ মারা-টারা বাজে কথা, পুলিশ মোটেই গুলি চালায়নি। গণ্ডগোলের মধ্যে একটা বকনা বাছুর পাথর চাপা পড়ে মরে যায়। সে যাইহোক—ভাগ্যে পাকিস্তানী পুলিশ নয় তাই বাছুর মারার ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবুও এ ব্যাপারে নিয়ে কিছুটা বাকবিতণ্ডা হয়েছিল।

বন্দীরা সব বন্ধন মুক্ত হলো আর অনুলাল মাস্টার বন্দী হলেন। বেচারার আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হলো না। তবে বুশহরের ইতিহাসে পাঁচদিনের জন্যেও রাজা হিসাবে তার নাম থাকবে—সম্ভবত অন্তিম রাজা। তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক তাঁকে আর কিছু দিতে পারলে না। বিদ্রোহের অপরাধে তাঁর সাত বছরের কারাদন্ড হয়। তবে সে আদেশ পরে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মাস্টার সত্যিকার জনসেবক ছিলেন—তাই চিরদলিত পাহাড়ী কোলী জাতের লোকও তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। হিসেব মতো, পুলিশের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের ফিরে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তবে আর পুলিশ বলেছে কেন। নিরাপরাধ জনসাধারণের ওপর সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। বহু জায়গা থেকে তাদের বিরুদ্ধে জুলুমবাজি, লুণ্ঠন এমন কি নারী-ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। এমনি করে বুশহরের বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে গেলো এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সজাগ হয়ে উঠল। বিদ্রোহ সফল হলে বলা যায় না, তিব্বত-সীমান্তের এই ছোট্ট রাজ্যটি হয়ত একদিন ভারত রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে রাষ্ট্রসংঘের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াত। সেই সাংঘাতিক সম্ভাবনা থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে, সীমান্তবর্তী কোনো এলাকাতেই এই ধরনের খামখেয়ালী বিদ্রোহ—যার পেছনে কেবল ব্যক্তিগত শাসন ক্ষমতার লোভ— তা চলতে দেওয়া যায় না। সে বুশহরই হোক বা তেহরীই হোক—কিম্বা আর অন্য কোনো জায়গাই হোক।

কিন্নর দেশের পথে

সতেরই মে রামপুর ছাড়লাম। আমার কাছে মালপত্র যা ছিল তার পরিমাণ এমন কিছু নয়। একটা খচ্চর নিলেই চলত। কিন্তু পাহাড়ের পথে একলা একটা খচ্চর সঙ্গীহীন হয়ে চলতে চায় না। কাজেই আরও একটা খচ্চর নিতে হলো। নিজের জন্যে একটা ঘোড়ারও ব্যবস্থা করতে হলো। ঠানাদার থেকেই আমি সরকারী ঘোড়া আর খচ্চর ব্যবহার করছি। এ দিকে ঘোড়া, খচ্চর ভাড়ায় পাওয়া যায় না তা নয়, আর সে ভাড়াও এমন কিছু একটা বেশী নয়। সরকারী খচ্চরের যা খরচ তার চেয়ে বেশী খরচ তাতে

পড়ে না। তবে ঐ একটা কথা—পাওয়া যাবে কি যাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই ভরসা করা যায় না।

কাল সন্ধ্যেবেলাই জানিয়ে দিয়েছিলাম—আজ খুব ভোরে রওনা হব। ভোর হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মালপত্তর নিয়ে খচ্চর রওনা হয়ে গেলো। সর্দার সাহেব আর বিদ্যাধরজীর কাছে বিদায় নিয়ে আমিও ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে পড়লাম। এবার আসল সমস্যা শুরু হলো— ঘোড়া কিছুদূর হাঁটে আর থমকে দাঁড়ায়। ভাবলাম প্রথম প্রথম ও রকম করেই থাকে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে আবার যে-কে সেই। সঙ্গে যে ছেলেটা চলছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে ঘোড়টার পিঠে ঘা-টা আছে না-কি? সে তো গোড়ায় কিছুতেই স্বীকার করবে না। সরকারী চাকর তো, শেষে জোর করে চেপে ধরতে বলল— হ্যাঁ, পিঠে কাটা ঘা আছে। বুঝুন অবস্থাটা! এখন কি করা যায়? এই সব দেশীয় রাজা-রাজড়ার কর্মচারীরা ভারী সাংঘাতিক চরিত্রের হয়। আমার এক বন্ধুর অভিজ্ঞতা বলি। তার নিজের বোন কোনো একটা দেশীয় রাজ্যের রাণী। ছোটভাই বেড়াতে এসেছে, রাণীর আনন্দ আর ধরে না। যত্ন-আত্তি যা করার সে সব ভো হলো। ভাই চলে আসবার সময়ে, তার সঙ্গে নানারকম উপঢৌকন মেঠাই-মন্ডার সঙ্গে দেওয়া হলো নতুন একটা সাফা (শিরস্ত্রাণ)। তা সে'সব জিনিসপত্র তো আর রাণীর ভাই নিজে গিয়ে তদারক করতে পারেন না, সেটা ভালোও দেখায় না। ও মশাই! জিনিসপত্র যখন গাড়িতে উঠল, দেখা গেলো পাগড়ির চিহ্ন কোথাও নেই। চাকর-বাকরের এমনি মহিমা। তারা এ সব ব্যাপারে খুব সেয়ানা। রাজ পরিবারের অতিথি কুটুম—তারা নিশ্চয়ই জিনিসের খোঁজে রাস্তা থেকে ফিরে আসবে না, এটা তারা বিলক্ষণ জানে। সে না হয় যা হোক হলো কিন্তু আমার এখন কি উপায়? আমায় তো আর ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়নি যে ভাববো, পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। আবার ভাবি আমায় ঠকিয়ে আস্তাবলের প্রধান সহিসের লাভটা কি হলো? এ তো সাফা মুরেঠা নয় যে কিছু নগদ হাতে পেয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আসল কথা, ভালো ঘোড়া পেতে হলে সহিসের হাতেও কিছু ভালো রকম দিতে-থুতে হয়। আমি এ সব ব্যাপারে মাথা মোটা, আগে এটা আমার মগজে আসেনি।

এখন উপায়? ঘেয়ো ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই পাহাড়ী পথে চার-চারটে দিন চলব কি করে? চিনী পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে তো। অন্যে হলে কি করত বলতে পারি না। আমার তো বুকে অত সাহস নেই। যে ছোঁড়াটা সঙ্গে আসছিল তার হাতেই ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ফেরৎ পাঠালাম। বরে দিলাম, সে যেন এটা বদলে একটা ভালো ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে 'গওরা' চটিতে দেখা করে। আমি সেইখানে থাকব। ঘোড়া যে গওরায় গিয়ে পাবই তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে কথা হলো, ছেলেটা যদি ভয় পেয়ে সহিসকে গিয়ে কিছু না বলে তা হলেই মুস্কিল। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর পথে একজন কনৌরা (কিন্নরবাসী) লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তার হাতে সেক্রেটারীবাবু প্যারেলালজীকে একটা খবর পাঠিয়ে দিলাম।

ন'মাইল রাস্তা একটা তেমন কিছু দূর নয়। অবশ্য শরীর আমার খুবই দুর্বল পাহাড়ের চড়াই-উৎরায়ের সঙ্গে এখনও খাপ খাওয়াতে পারিনি। তবু ঘোড়া আসবে

ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েই চলতে লাগলাম। গওরার ডাকবাংলায় যখন পৌছালাম তখন তিনটে কি সাড়ে তিনটে বাজে।

গওরার উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৬,৫১৮ ফিট। অর্থাৎ রামপুর থেকে আরও আড়াই হাজার ফিটের ওপর চড়াই ভাঙতে হয়। দুপুরটা ওখানেই জিরোবার ব্যবস্থা করলাম। আশা ছিল, ঘন্টা-তিনেকের মধ্যে ঘোড়া এসে যাবে। বসে আছি তো আছিই। ঘোড়ার আর পাত্তা নেই। দৌলতরাম এল। সে খচ্চরের সঙ্গে চিনী পর্যন্ত যাবে। তাকে জিজ্ঞেস করতে বললে, হ্যাঁ, ঘোড়া ভালোয় ভালোয় আস্তাবলে পৌছে গেছে। কি আর বলব, মেজাজ তিরিক্ষি করেও তো আর কিছু লাভ নেই। রিয়াসতি আতিথ্যের নমুনাই এই! তিন ঘন্টা ঠায় বসে থেকে বুঝলাম ঘোড়ার আশা নেই। এইবেলা সময় থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়াই ভালো। সামনে পাক্কা বারো মাইল রাস্তা। সে রাস্তায় সাংঘাতিক সব চড়াই-উৎরাই।

গওরায় যে ডাকবাংলোয়ে আমি উঠেছিলাম, কোলী বিদ্রোহের সময়ে সেইখানেই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা আশ্রয় নিয়েছিল। সেইখান থেকেই জনতার ওপর গুলি চালিয়েছিল। শেষকালে হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল বিদ্রোহীদের হাতে, সেও ঐ ডাকবাংলার ভেতরেই। গওরাতেই মাস্টার অনুলালকে তার দলের লোকেরা পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

দশ মাইল পথ দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। রাস্তা কোথাও সমতল, কোথাও বা একটু উৎরাইয়ের মুখে। চলতে কোনো কষ্টই নেই। এতখানি পথ যে এলাম, সে যেন গায়েই লাগল না কিন্তু মালুম করিয়ে দিলো শেষের চার মাইল চড়াইয়ের রাস্তায়। একে তো ডায়েবেটিসের রোগী, এমনিতেই তালু শুকিয়ে থাকে তার ওপরে কড়া রোদ। এই শেষের দিকের চার মাইল পথ চলতে আমার যা হাল হলো সে আর নাই শুনলেন। প্রতি মুহূর্তে জপ করে চলেছি 'কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

অসহ্য কষ্ট হলেও কিন্তু হাল ছাড়িনি। যেন তেন প্রকারণে সরাহন না পৌছে আর উপায় নেই—এই ভেবে মনে জোর করে হাঁটতে লাগলাম। মেলা দেখে ফিরে আসছে একদল বৃশহরী নারী তাহাদের সাজসজ্জার ছটায় পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে রঙীন আলোর ঝলকানি লাগছে। গুন্-গুন্ করে গান গাইতে গাইতে আসছে কিন্তু কে বা দেখে, কে বা শোনে! আমার তো অবস্থা কাহিল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, পায়ের সঙ্গে কেউ যেন পাঁচসেরী বাটখারা বেঁধে দিয়েছে। শরীর আর বয় না, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু সে যাত্রাও ফুরালো। দিনের শেষে সরাহনের ডাকবাংলোয় যখন পৌছালাম, সূর্য তখন ঢলে পড়েছে। সিমলা থেকে এখানকার দূরত্ব হলো ৭৯ মাইল। এতখানি পথ চলে এলাম! ভাবতেও অবাক লাগছে।

ডাকবাংলোয় পৌছে যা দেখলাম, তা তো আরও চমৎকার। বাংলো বন্ধ করে চৌকিদার কোথায় গেছে। নিশ্চয় মেলায় গেছে। কাছে-পিঠে কোথাও মেলা হবে, আর পাহাড়ী জোয়ান ছেলে সেখানে হাজির থাকবে না, এ আবার কখনো হয়? মেলা অবশ্য

কোনো দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে। কিন্তু তার প্রধান অঙ্গ হলো, নাচ-গান আর ভূরি ভূরি সোমসুধা পান। এ না হলে মেলা জমে না। আশেপাশে তনুদেহের সুষমাও বড় অপ্রতুল হয় না। অতএব তরুণ মন যদি 'আর কোথা নয়, এইখানেতেই স্বর্গ আমার রাজে' বলে বিবেচনা করে, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

আশার কথা, বাংলোর ভাংগী (শুদ্ধ কথায় জমাদার) লোকটা কোলী জাতের বুড়ো মানুষ তায় অসুস্থ ছিল। তার আর মেলায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি—তাই বাঁচোয়া। নইলে, এই সাত হাজার ফিটের উঁচু পাহাড়ী জায়গায় ঠাণ্ডায় সারা রাত ঘাসের ওপর বসে কাটাতে হলে যে পরম মধুর অভিজ্ঞতা হতো তা আর বলে কাজ নেই। কোলী বুড়ো কোথা থেকে একটা চৌকি এনে দিলে। তাতে দেহভার এলিয়ে দিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে মেট-এর কাছ থেকে চাবিও পাওয়া গেলো। আর আমায় পায় কে? এখন চৌকিদার সারারাত ধরে মনের সুখে মেলা দেখুক, আমার কোনো আপত্তি নেই।

খানিক পরেই দৌলতরাম খচ্চর হাঁকিয়ে এসে পড়ল। তবে তার ফ্যাকাসে মেরে-যাওয়া মুখ দেখে আমার আর কিছুমাত্র উৎসাহ রইল না। বুঝলাম ও আমার চেয়েও বেশী ক্লান্ত হয়েছে। জানোয়ারদের জন্যে দানাপানি যা লাগবে তার বন্দোবস্ত করে দিলাম। এই হয়েছে আর এক ঝকমারি। প্রত্যেকটা খচ্চর পিছু কম করেও দশটাকা রোজ খরচ হচ্ছে।

দুপুরে শুধু ঘোল খেয়ে কাটিয়েছি। কাজেই খিধে তো পাবারই কথা। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন এখন বিছানার। একটু হাত-পা টান করে গড়িয়ে পড়তে পারলে ভালো হয়। আমি যে এখানে আসছি এ খবর এখানকার মিড্ল স্কুলের শিক্ষক সোহনলালের কাছে পৌছে গিয়েছিল। নেগী ঠাকুরসেন তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সরাহন গ্রামটা এখান থেকে ফার্লংখানেকের ওপরে। সেই গ্রামেই থাকেন সোহনলাল মাস্টার। খবর পেয়েই তিনি দৌড় এলেন।

ভেবেছিলাম দৌলতরামের সঙ্গেই নৈশভোজন করব। তা মাস্টারজী পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁর ঘর থেকেই খাবার আর দুধের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। তথাস্তু। সে তো যা হোক এক রকম হলো, কিন্তু আমার চিন্তা এখান থেকে কাল যাওয়া যাবে কেমন করে। পায়ে তো উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। হাঁটা তো দূরের কথা। ঘোড়ার কথা বলতেই মাস্টারজী অবশ্য আশ্বাস দিলেন—হ্যাঁ পাওয়া যাবে। তিনি যতটা চট্ করে বলে ফেললেন, অতটা তাড়াতাড়ি তাঁর কথায় আমার আশ্বাস যদি আসত। আমি পাহাড়বাসীদের যতটা চিনেছি তাতে বুঝেছি কোনো কিছুতেই 'না' বলতে তারা অভ্যস্ত নয়। তবে সব প্রতিশ্রুতিকেই কার্যকরী করাও তাদের ক্ষমতার বাইরে। তাই কথাটা আবার পাড়লাম। সোহনলাল বললেন, ঘোড়া আছে এবং তাঁদের এক পরিচিত বেনের ঘোড়া। বেনে মহাজনদের কথা শুনলেই আমার মনে আতঙ্কের ছায়া দেখা দেয়। সেই বাইশ বছর আগে নওলা গ্রামে মহাজন বাড়িতে অবাঞ্ছিত আতিথ্যের কথা স্মরণ হয়। তারই পুনরাবৃত্তি হবে না তো? মনকে শক্ত করলাম, যা হয় হবে। জলে তো আর পড়ে নেই। এখানে দিব্যি ছাতের নিচে রয়েছি। পি.ডব্লিউ.ডি.-র খাসা বাংলো, পরিপাটি খাট-পালঙ্ক—ঢালা বিছানা। টেবিল চেয়ার আসবাবেরও অভাব নেই। সরাহন থেকে

দুধ, খাবারও পাওয়া যাবে। নিয়ে দিয়ে খচ্চরগুলো আর লোকটার খরচ বাবদ টাকা কুড়ি-বাইশ বেশী পড়বে। তা আর কি করা যাবে। সঙ্গে যা টাকা-পয়সা আছে তাকে সব সময়েই আমি চার দিয়ে ভাগ করি খরচ করার সময়ে। উনচল্লিশ সালের তুলনায় চারগুণ জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এটা ভুলতে পারি না। সে দিন যা চার আনায় পেতে পারতাম আজ তার মূল্য এক টাকা।

খাবার নিয়ে মাস্টার ফিরে এলেন। বললেন, ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বেনে দিতে রাজী হয়েছে। তা আর রাজী না হয়ে পারে! মাস্টারজী বোধহয় ওর ছেলেকে পড়ান। তা'ছাড়া নেগী ঠাকুরসেনের চিঠিরও মাহাত্ম্য আছে। লোকটা বোধহয় লিখেছে, এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি যাচ্ছেন টাচ্ছেন বলে খুব জবর একটা চিঠি। মাস্টারজী বললেন, নাচার পর্যন্ত অর্থাৎ এখান থেকে তেইশ মাইল ঘোড়ার ভাড়া কুড়ি টাকা চাইছে। আমি ভেবে দেখলাম আমার ফর্মূলা অনুযায়ী কুড়ি, মানে, কুড়ি ÷ চার অর্থাৎ পাঁচ টাকা। কুচ পরোয়া নেই। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। ঘোড়া ঠিক করে দিতে বললাম।

একটা রাত সরাহনে কাটিয়ে গেলাম ডাকবাংলোয় বসে। তা বলে ডাকবাংলোর বাইরে সরাহনের বিষয়ে কিছু বলবার নেই, এমন উপেক্ষণীয় জায়গা নয় কিন্তু। রীতিমতো সত্যযুগীয়, ইতিহাসেও খুঁজলে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে তখন এর নাম ছিল অন্য। দ্বাপরের শেষভাগে যখন পরমানন্দ মাধব শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসবাস করছেন, সেই সময়কার ইতিহাসে এর নাম ছিল শোণিতপুর। প্রবল প্রতাপ বাণাসুরের রাজধানী ছিল এখানে। বাণাসুর তনয়া উষা, চিত্রলেখা অঙ্কিত ছবির মধ্যে নিজের স্বপ্নের চিরারাধ্য প্রিয়তম অনিরুদ্ধকে আবিষ্কার করেন। সেই অনিরুদ্ধেরই বংশপরম্পরা ভূতপূর্ব মহারাজা পদম্ সিং আর বর্তমানে তাঁর উত্তরপুরুষ বীরভদ্র সিং। প্রাচীন শোণিতপুর আর বর্তমান সরাহনের ঐতিহ্যের এর চেয়ে আর বড় কি প্রমাণ চাই? প্রমাণ তো রয়েছে নামেই—সরাহন নামটাই তো শোণিতপুর নামের অপভ্রংশ। আর তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, ভাষাতত্ত্বের বা ব্যাকরণের প্রশ্ন তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেন তো চলে যান পণ্ডিতপ্রবর মূর্খদুপাটানন্দের সমীপে। এই তো খানিক নিচেই রাবী গ্রামে তিনি বাস করেন। তিনিই আপনাকে পুথি দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে সত্যযুগের পুথি আছে। সে পুথির ভাষা অবশ্য তাঁর ঊর্ধ্বতন হাজার পুরুষেও কেউ কখনও পড়ে বুঝতে পারেনি কারণ পুথিটা খোলাই হয়নি। রাশীকৃত কাপড় জড়িয়ে তাকে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে রেখে দেওয়া হয়েছে কলিযুগের হাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে। শ্রীরামের কৃপায় হয়ত সে অমনিই থেকে যাবে। নয়ত আগুন টাগুন যদি লেগে যায় তো কয়লা হয়ে অমরত্ব লাভ করবে। তা বলে কলিযুগে সেটা খোলা হতে পারে না তো।

সরাহন অনেক দিন পর্যন্ত বুশহরের রাজধানী ছিল। তারপর রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রামপুরে। তখন গ্রীষ্মে অনেক লোকের পায়ের ধুলো পড়ত এখানে। এখানেই ১৯২৬ সালে মহারাজা পদম্ সিংহকে দর্শন করেছিলাম। তখন এখান থেকে রামপুর পর্যন্ত টেলিফোন ছিল। ইদানীং টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। টেলিফোনের খুঁটিগুলোও প্রায় সব পথিপার্শ্বে ধরাশায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। একুশ মাইল লম্বা তার

ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোনো অফিসারের গা নেই। অথচ হিমাচল সরকার স্বপ্ন দেখছেন শতদ্রু উপত্যকায় ফলের কারখানা বসাবেন, কিন্তু তাকে সফল করতে হলে অবিলম্বে ঐ পথে তার সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাতে বহু মাইল ব্যাপী তারের প্রয়োজন।

রাজার গ্রীষ্মাবাস বলেই নয়, এমনিতেই সরাহন একটা বেশ বড়-সড় গ্রাম। সমগ্র বুশহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীমাকালীর আদি নিবাসও এখানে। বুশহরীগুলোর ওপর আমার মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হয়। আমাদের দেখাদেখি গাড়োয়ালীরা প্রায় আধ ডজন নকল কাশী, নকল প্রয়াগ মায় নকল বদ্রীনারায়ণ পর্যন্ত বানিয়ে ছেড়েছে। নকল বদ্রীনাথের ব্যাপারটা আমি আবার শুনি, গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের গুরু বৈদিক মহারাজের কাছে। তাঁর মতে আসল বা 'আদি বদ্রীনাথ' না-কি রয়েছেন তিব্বতে থোংলিং মঠের ভেতর লামাদের তত্ত্বাবধানে। তারাই পুজো-আর্চা করে। ভীমাকালী যে আদ্যাশক্তি ভগবতী, তাতে সন্দেহ নেই। শোনা যায়, দেবীর কোষাগার না-কি রাজা রামচন্দ্রের আমলের টাকা-কড়ি রাখা আছে। তা'হলে তো ত্রেতাযুগের হিসেবও পাওয়া যাচ্ছে এখানে। ফিরে আসবার সময়ে মায়ের দর্শন লাভ করার বাসনা তো খুবই রয়েছে। এখন সমস্যা হলো, এখানকার নিয়ম অনুযায়ী যত বড় আস্তিকই হোন না কেন, বুশহরের বাসিন্দা নয় এমন লোককে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমি তো একে বহিরাগত, তায় পাষণ্ড নাস্তিক! কি আর করা যাবে। ঢুকতে না পাই, চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়েই ফিরে যাব। আর সূর্যদেবের কৃপা থাকলে, আর্যাবর্তের পুণ্যলোভাতুর দর্শকদের মাতৃ-মন্দিরের চিত্ররূপও দর্শন করিয়ে দেবো (অর্থাৎ রোদ থাকলে ফটো তোলা হবে—অনুঃ)। তবে কোষাগারে রক্ষিত রামচন্দ্রী টাকা-পয়সা দেখার সৌভাগ্য আর কারুরই হবে না। কারণ, অনুলালের ক্ষণস্থায়ী সরকারের প্রচারে বলা হয়েছিল, সর্দার কোষাগার ভেঙে টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়েছে।

আঠারোই মে, মঙ্গলবার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত। মাস্টার সোহনলালের আবির্ভাব, তাঁর হাতে কিছু প্রাতরাশের আয়োজন, সঙ্গে শুভ সংবাদ, ঘোড়া আসছে। কিন্তু সে ঘোড়া আজকের মধ্যেই নাচার থেকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। পাহাড়ী পথে তেইশ মাইলের লম্বা সফর। তা হোক, কাল তো একুশ মাইল হেঁটেই এসেছি। বুক বাঁধলাম। ঘোড়ার বিবরণ যা দিলেন মাস্টারমশায় তাতে মনে হলো ভোজরাজের কল দেওয়া কাঠের ঘোড়ার চেয়ে কিছুমাত্র কম যাবে না দৌড়ের বাজীতে। যাইহোক, জলখাবার খাওয়া হলো। দৌলতরামকে তাগিদ দিয়ে সকাল সকাল রওনা করে দিয়েছি। তার দিনভরের খাবার কাল রাত্তিরেই বানিয়ে রাখতে বলেছিলাম—সম্ভবত তাই করেছে। আমার নিজের আহার তো বেশ অনায়াসেই জুটছে। অবশ্য এক একখানি রুটির ওজন এক সের দেড় সের করে। তা হোক তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু সারাটা পথ কণকসূর্য যেভাবে তেতে পুড়ে থাকেন, দেখলেই মনে কষ্ট হয়। জীমূতদেবের প্রসন্নতার কোনো লক্ষণই নেই। শতদ্রু মাতা। থুড়ি, বাবা শতদ্রু বলাই ভালো। কারণ স্থানীয় লোকেরা তাঁকে সমুদ্রজ্ঞানে পুজো করে, তা বাবা শতদ্রুর অগাধ জলরাশির যদিও কার্পণ্য দেখছি না কিন্তু তাঁর স্রোতের তীব্রতায় কার সাধ্য কাছে যায়।

সূর্যদেব উদিত হলেন। আকাশে মেঘের বিন্দুবাষ্পও নেই। আর কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াও এল। রূপের বর্ণনা আমি সাধারণ লোক কি আর করব? কাদম্বরী-বর্ণিত ইন্দ্রায়ুধের থেকে কোনো অংশে কম নয়। পাহাড়ী জাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘোড়া এটি। শোনা যায়, রারকন্দের কোনো সওদাগরের কাছ থেকে স্বয়ং মহারাজা পদম্ সিং এটি নিজের জন্যে ক্রয় করেছিলেন। আপাতত বাণাসুর রাজধানীর অধিবাসী এক বণিকের হাতে পড়েছে। এর ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখিত হচ্ছি, কে জানে এ হয়ত চেঙ্গিজ খাঁর সেই ঐতিহাসিক শ্যামকর্ণ অশ্বিনীকুমারের বংশধর। আজ আমার মতো হতভাগা তার পিঠে চড়তে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত এত লাঞ্ছনাও ওর অদৃষ্টে ছিল!

বলতে ভুলে গেছি, চৌকিদার সাহেব কাল রাত্রেই ফিরেছিলেন। তার মারফৎ ডাকবাংলোর রেজিস্টারটা আনালাম। জানলাম, বাংলোটি পি.ডব্লিউ.ডি.-র। যতক্ষণ জানিনি বেশ ডাঁটেই ছিলাম। এখন জেনে ফাঁপরে পড়লাম। এ শর্মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়কের পথিপার্শ্বস্থ সমস্ত ডাকবাংলোই বুঝি ওখানকার জঙ্গলবিভাগের অধীনে। এ বিশ্বাসের মূলে ছিল বাইশ বছর আগের স্মৃতি। সেই হিসেবে পাঞ্জাবের চীফ কনজারভেটরের অনুমতিপত্র জোগাড় করা হয়েছিল পরম যত্নে। এখন দেখি, এখানে যে অনুমতিপত্র চাওয়া হয়েছে তা জঙ্গল-অধ্যক্ষের নয়, চিফ এঞ্জিনিয়ারের। বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। কারণ, যে চৌকিদার সম্বন্ধে খুব গরম গরম মেজাজ দেখিয়েছি, সে-ই আমাকে পাসপোর্ট-এর জন্যে চ্যালেঞ্জ করতে পারত এবং না পেলে স্বচ্ছন্দে অর্ধচন্দ্র দিতে পারত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সরকারী কর্মচারীরা সব সময়ে সরকারী নিয়ম কানুনের মতো অত কঠোর হয় না—তাই রক্ষে।

একটা কথা আমার মাথায় আসে না। এই সমস্ত ডাকবাংলোগুলো যে সারা বছর বন্ধ পড়ে থাকে এর সার্থকতা কি? ন'মাসে সরকারী অফিসারবর্গ কি সরকারী কৃপাপ্রাপ্ত কোনো যাত্রী এলে তবেই খোলা হয়—এর কারণটা কি? অফিসারদের কিম্বা অনুমোদন-প্রাপ্ত অতিথিদের প্রথম সুযোগ পাওয়া উচিত—এটা মানি। কিন্তু যখন তাঁরা কেউ থাকেন না, বাংলো খালি পড়ে থাকে; তখনও যাত্রী-সাধারণের জন্যে এগুলো খুলে রাখলে কি এমন লোকসান হয়! সরকারী ডাকবাংলোগুলোকে সব ধর্মশালা বানিয়ে দেওয়া হোক, এমন কথা আমি বলছি না। বরং বলি দিনে এক টাকা চার্জ খুবই কম। ওটাকে বাড়িয়ে দিনে দু'-তিন টাকা করা যেতে পারে। বাংলোর আসবাবপত্র বা অন্যান্য ব্যবস্থা এত ভালো যে তিন টাকা করে রোজ দিতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়। তাই ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করে সর্বসাধারণের জন্যে এগুলোর দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ডে, সুইজারল্যাণ্ডে, পশ্চিমের অন্য দেশগুলোয় সর্বত্রই টুরিস্ট ব্যবসায়ে কি অপর্যাপ্ত লাভ করতে দেখেছি। তারা প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনের হাতছানি দিয়ে ভ্রাম্যমানদের ভুলিয়ে আনছে তাদের দেশের রমণীয় দৃশ্যাবলী দেখাতে। লক্ষ-লক্ষ টাকা তারা যেমন খরচ করছে প্রচারে তেমনি কোটি কোটি টাকা উপার্জনও করছে ভ্রমণ-বিলাসীদের পকেট খালি করিয়ে। অথচ এ দেশের সরকারের সবই উল্টো। এই পরম মনোরম কিন্নরভূমিতে যাতায়াতের, পানাহারের একটু সুব্যবস্থা করতে পারলে

কত যে দর্শক এসে ভিড় করত তার ইয়ত্তা নেই। তাতে স্থানীয় লোকেরও যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হতে পারত। কিন্তু তা হবার উপায় নেই! অন্য দেশ যেখানে পরম আদরে টুরিস্টদের আমন্ত্রণ জানায়, এরা সেখানে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেন। হবে না কেন, পাঞ্জাব সরকারের পি.ডব্লিউ.ডি. বিভাগে এখনও সেই পুরনো ইংরেজ প্রভুদের চরণচিহ্ন আঁকা রয়েছে যে!

নবগঠিত হিমাচল সরকার এখন হাতে অনেক সম্পত্তি পেতে চলেছেন। জঙ্গল বলুন, রাস্তাঘাট বলুন আর ডাকবাংলোই বলুন, সবই তো চলে যাচ্ছে সরকারের খাস দখলে। এ সবের মালিকানা পাবার পরে সরকার যাত্রীদের কিছু সুযোগ-সুবিধে করে দেবেন এমন আশা করাটা অন্যায় নয়। আমার তো আরও অনেক কিছু আশা। ভবিষ্যতে এই সব ডাকবাংলোর ভেতরেই রান্নার আয়োজন থাকবে—চা, টোস্ট খানাপিনা সবই বাংলোয় বসেই পাওয়া যাবে। শুধু তাই বা কেন? ধরুন, ভাগ্যক্রমে যদি অঞ্চলে শুকনো আবহাওয়া না বয় (অর্থাৎ কিনা 'ড্রাই এরিয়া' বলে চিহ্নিত না হয়) তা'হলে কিন্নরভূমিতে সুখ্যাত উদুম্বর-বর্ণা মদিরাও হয়ত মুসাফিরদের ভাগ্যে সুলভ হতে পারে। শাস্ত্রে উদুম্বর-বর্ণা সুরার বর্ণনা পেয়ে ইস্তক আমার মনের ঔৎসুক্য বেড়েই চলেছে। শরাব গুলঙ্গ বা ব্লাডরেড ওয়াইন-এর ব্যাখ্যা সে আগ্রহকে আরও অনুরণিত করে তুলেছে।

এ দেশে এসে শুনলাম, এখানের শ্বেত-দ্রাক্ষা মদিরা আভিজাত্যের মহিমায় রক্তাভা সুরাকেও পিছনে ফেলে যায়। তার কারণও আছে। যে কোনো জাতের কালো আঙ্গুরের রস কিছুদিন বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেখে দিলেই তা থেকে উদুম্বর-বর্ণা মদিরা প্রস্তুত হয়ে যায়। তার জন্যে বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয় না। কিন্তু মহাশ্বেতা-র অনেক ঝামেলা। রীতিমতো চোলাইয়ের দরকার হয় তার জন্যে। তাই তার দামও বেশী মর্যাদাও অনেক বেশী।

গত শতকে পোঁয়াড়ীর (চিনীর ওদিকে) জায়গীরদার আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, 'কিন্নরবাসীরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধে বড় উদাসীন হয়ে পড়ছে। এ অঞ্চলে কত রকমের আঙ্গুর ছিল আগে। এখন মোটে আঠারো জাতের আঙ্গুরের ফলন হচ্ছে।' নেগী সন্তোষ দাস আমায় বললেন, আজকাল না-কি পোঁয়াড়ীতে দ্রাক্ষা চাষ বিলকুল বন্ধ। তবে সুখের কথা আজকাল কিন্নরেরা এ ব্যাপারে আবার আগ্রহশীল হয়ে উঠছে।

আগের বারে আমি যখন এ দিকে আসি, তখন রাজা পদম্ সিংয়ের রাজত্বকাল। তিনি এখানে হুকুম করে মদ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন (মদ্যপান নয়— মদ্যনির্মাণই বেআইনী করা হয়েছিল যাতে লোকে সরকারী দোকান থেকে মদ কেনে)। তবে তাঁর এ কৌশল বিশেষ কার্যকরী হয়নি। লোকে রাজাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, চুপি চুপি মদ বানিয়ে খেত। দেখে-শুনে রাজাসাহেব যুবরাজের মুণ্ডন উপলক্ষে মদ্যনিবারণ আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। যে বক্তার মুখে এই কাহিনী শুনছিলাম তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, দেবতারাও রাজাকে বাধ্য করালেন হুকুম তুলে নিতে। তাঁদের যে মদ না হলে বড়ই অসুবিধে হচ্ছিল! রাজা আবার যেমন তেমন রাজা নন। যীশুখৃষ্টের প্রতিনিধি যেমন রোমের পোপ; একলিঙ্গের প্রতিনিধি যেমন উদয়পুরের রাজা; তেমনি

ভীমাকালীর প্রতিনিধি বুশহরের মহারাজ। দেবতার দুঃখে কাজেই তাঁর হৃদয় বিগলিত হলো। ভীমাকালীর যে সেই দ্বাপরযুগ থেকে 'শিবু' (লাল মদ) পানের অভ্যেস। তাঁর কষ্ট হবে না?

আগেই বলেছি, পথঘাটের বন্দোবস্ত ভালো হয়ে গেলে, থাকা-খাওয়ার কিছু একটা সুব্যবস্থা হলে, রসিক পর্যটক ও অঞ্চলের শিবু নামক বিখ্যাত উদুম্বর-বর্ণা কিন্নরী সুরার রসগ্রহণ করে ধন্য হতে পারবেন। শাম্পেন ব্রান্ডীকে লজ্জায় ম্লান করে দিতে পারে এমন কিন্নরী সুরা এখানে প্রচুর পাওয়া যাবে। সহস্র পেয়ালা নিয়ে শত শত সাকী এখানে হাজির হবেন। অভাব শুধু রসিক খৈয়ামের। ...হায়রে আমার দুরদৃষ্ট। এই অপূর্ব সৌভাগ্যের স্বর্গে এসেও আমার অবস্থা সেই 'পানীমে মীন প্যাসী।'

আমার ললাটে বিধাতা এ জন্মে যে একফোঁটা চেখে দেখার সৌভাগ্য লেখেননি। আর পামর আমি, পরজন্মেও আমার বিশ্বাস নেই। তা আমার কপালে যাই থাক অন্যে তো লাভবান হতে পারবে।

হিমাচল সরকারের সঙ্কল্প নাচার পর্যন্ত মোটর রাস্তা নির্মাণ করে ছাড়বেন। আমার শুভেচ্ছা রইল, যদি সেটা সম্ভব হয় তো আমার স্বপ্নও সফল হতে পারবে। চিনী পর্যন্ত পঁচিশ মাইল রোপওয়ে তৈরি হয়ে গেলে আর পায় কে। তখন কি আর ভারত সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাইরে থেকে দ্রাক্ষারস কিনতে হবে? কিন্নরী সুরা তখন ভারতময় প্রসিদ্ধি লাভ করবে। আর কালক্রমে যদি সারা ভারতবর্ষও কোনোদিন 'ড্রাই' হয়ে যায় তবুও কিন্নর দেশে দেবভোগ্য সুরার প্রচলন বন্ধ হবে না। আর এ দেশের দেবভক্ত বাসিন্দারা সে হতেও দেবে না। পদম সিং তো আইন করেছিলেন—চলল!

পাঠকদের ধৈর্যের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আর নয়, এ বারে যাত্রার কথা বলি। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী...' গাড়ী নয়—ঘোড়া। সেই আমার পূর্ববর্ণিত (কাদম্বরীর) ইন্দ্রায়ুধ। ইন্দ্রায়ুধের প্রশংসা করে আমি বা সোহনলাল কিছু অতিরঞ্জন করিনি। অমন একটা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ তেজী সুন্দর ছাঁদের ঘোড়া বড় একটা দেখা যায় না। ঘোড়ার পিঠে ভালো চামড়ার জিন চড়ানো। আরাম করে চড়লাম; ঘোড়ার মেজাজও চমৎকার। এমনিতে ঘোড়ায় চড়তে আমার ভয় নেই তবে পাহাড়ী পথে তেমন তেমন আড়িয়াল ঘোড়ায় পাল্লায় পড়লে ঘায়েল হতে হয় এটা জানতাম। কিন্তু ইন্দ্রায়ুধ আমাদের তেমন নয়। একটু চড়ে ওর মেজাজটাই বুঝে ফেললাম। লাগামের মার-প্যাঁচ বোঝে। হাল্কা দু-এক ঘা দিলেও সয়ে নেয়। তীরের মতো না ছুটলেও একেবারে ঢিমেও চলে না। মোটামুটি স্বচ্ছন্দ অনায়াস গতি। ঘোড়ার সঙ্গে সহিসও পেয়েছি। সে আবার যেমন তেমন সহিস নয়—খোদ রাজার সহিস। কথায় কথায় সে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, সে বেনের লোক নয়। কি একটা কাজে সরাহনে এসেছিল। বেনের লোকেরা তাকে হাতে-পায়ে ধরায় আমার সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে। আমি খুব হৃষ্টচিত্তেই ওর গল্প শুনছিলাম। ও ভাবছিল, এ তো উড়োপাখি এর কাছে যা বলব বিশ্বাস করে নেবে। আমি যে ওদের হাঁড়ির খবর জেনেছি তা তো ও জানে না। আসলে এ রকম রাজার সহিস অনেক ছাঁটাই হয়ে গেছে। রাজার ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া, সহিস সব এক সঙ্গেই ছুটি

পায়েছে। আর শুধু কি সহিস কোচোয়ান, এতকাল যে সব সেবাইৎ-পুরুতের দল শ্যামাকালীর প্রতাপে করে খাচ্ছিল তারা সব বেকার হয়ে পড়েছে। রাবী গ্রামের পুরোহিতেরা দলবেঁধে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

নতুন সরকার দেবসেবার ব্যয়-বরাদ্দ আশীহাজার টাকা এক কথায় কেটে পনেরো হাজারে নামিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে তাদের মহা অভিযোগ। তবে কি ব্রহ্মণ্যদেবের দল উপবাস করে মরবেন?—এ তো মহা অন্যায় কথা। দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, এর চেয়ে তো ফিরিঙ্গি রাজত্বই হাজার গুণে ভালো ছিল। আচ্ছা বাবা করে নাও। তা বলে ভেব না, ব্রাহ্মণদেবতা সত্যিই না খেয়ে থাকবে। তাদের কাছেও ন্যাকড়ায়-জড়ানো সত্যযুগের পুথি রয়েছে, নাই-বা থাকল সোনা রূপো। তেমন তেমন দরকার হলে পুথি খুলে পরশ পাথরের রহস্য শিখে নেওয়া যাবে। তারপর আর পায় কে?

কিন্নর দেশের সীমানা এখনো পাইনি। মাইল তিনেক পথ এখনো বাকি। আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে সরাহন শহর—সরাহন পর্বতস্থলীর পেছনে। আহা বড় চমৎকার পাহাড়ী শহরটি, রাজধানী করার উপযুক্ত জায়গা এই। অনেক দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে লোকালয়ের এলাকা। এমন একটা জায়গা ছেড়ে রামপুরে রাজধানী করার পরামর্শ কে যে কেহর সিংহকে দিলে তাই ভাবি। সামনে এগিয়ে আসছে নতুন একটা পর্বতশ্রেণী—স্থানীয় ভাষায় একে 'ধার' বলে। এটি হলো 'মানিয়োটারী ধার।' এখান থেকেই শুরু হলো আসল কিন্নর রাজ্যের সীমানা।

এখান থেকেই বসন-ভূষণের তফাৎ নজরে পড়ে। এখানকার মেয়েদের পরনে 'ডর্ণসারী'। না উনীশাড়ি নয়—পশমে শাড়ি বললেও ভুল হবে। প্রায় কম্বলের মতো অথচ পাতলা, আয়তনে শাড়ির সমান। ডান কাঁধের নিচে দিয়ে পেঁচিয়ে কাঁটার বাঁধন দিয়ে এমন নিপুণভাবে পরা হয় যে মাথাটা ছাড়া আর সারা শরীর চমৎকার ঢাকা পড়ে যায়। কিন্নরভূমির নিচের লোকদের কিন্নর ভাষায় 'কোচী' বলা হয়। কোচীদের মেয়েরা মাথায় রুমাল বাঁধে। কিন্নরেরা কিন্তু কি মেয়ে কি পুরুষ সবাই মাথায় টুপী পরে। সে টুপীর আকারে একটু বিশেষত্ব আছে। অনেকটা আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা যেমন মংক-ক্যাপ ব্যবহার করেন তেমনি। টুপীর খানিকটা অংশ ভাঁজ-করা অবস্থায় থাকে, শীতের সময়ে প্রয়োজন মতো নামিয়ে এনে কান ঢাকা দেওয়া যায়।

রাস্তার নামটি বেশ জাঁকালো—তিব্বত-ভারত রাজপথ। কিন্তু রাজপথের যা নমুনা, তাতে আমার মনে ভাবনা হলো রীতিমতো। যদি চিনীকে আমার গ্রীষ্মাবাস করতে হয় তা'হলে ফি-বছর নিচে নামার মতলবটি ছাড়তে হবে। অনেক পরিশ্রম, অনেক যত্ন নিয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পথের দুর্গমতা কিছুই কমেনি। এ দিকের প্যাহাড়গুলোয় সচরাচর গাছপালা কিছু বেশী পরিমাণেই থাকে। গতবার যখন এ পথ দিয়ে গেছি, তখন চলার কষ্ট তেমন গায়ে লাগেনি; তবে সেটা আজকের কথা নয়।

মনে মনে কেমন একটা ধারণা ছিল, হয়ত কনম্ পর্যন্ত সারা পথটাই দেবদারুর স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন বীথি। কাজেই পথ চলায় কোনো রকম কষ্টের আশঙ্কা করিনি। কিন্তু আমার স্মরণশক্তি যে একটু নির্ভরযোগ্য নয় তার আরও একবার জোরালো প্রমাণ

পেলাম। কোথাও কোথাও দেবদারুর দুয়েকটা চিহ্ন যে রাস্তায় ছিল না এমন নয়। কিন্তু হা হতোস্মি! কোথায় ছায়াবীথি! সারা রাস্তা জুড়ে ছায়া দেবার কোনো ঢালাও ব্যবস্থা নজরে পড়ল না।

চৌরার ডাকবাংলো ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। সহিস সঙ্গেই ছিল। আগেই খবর পেয়েছি পথে ধ্বস নেমেছে। শোলডিং খদ্দের ওপার থেকে রাস্তা সাংঘাতিকভাবে ভেঙেছে। অনুমান করলাম, আমায় ঘোড়া সমেত চ্যাংদোলা করে পার করার বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু কি ভাগ্যি, বাস্তব অবস্থা অতটা সঙ্গীন নয়—আশপাশের ক্ষেত-খামারের মাঝ দিয়ে অস্থায়ী পথ তৈরি হয়েই ছিল। আমরা তার সদ্ব্যবহার করলাম এবং অনায়াসেই সরাইখানার সামনে এসে পড়লাম। সরাইখানার বারান্দায় রদ্দুর। ছারপোকা-পিসুর উপদ্রবের সম্ভাবনাও প্রচুর। কাজেই সেখানে না উঠে, সামনের দোকানের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

খচ্চরসহ দৌলতরাম কোথায় কত পেছনে যে এখনও পড়ে আছে তার ঠিকানা নেই। সে এসে না পৌছানো পর্যন্ত আমি রওনা হতেও পারি না। দোকানেই পড়ে রইলাম। দোকানী অসুস্থ। দোকানে প্রচুর পরিমাণে আলু পড়ে রয়েছে। এক কোণে একটা গুড়ের নাগড়ীর ওপর মাছি ভন্‌ভন করছে। আমার গ্রহণযোগ্য কোনো খাদ্য কোথাও নজরে পড়ল না।

পাশের ক্ষেতে জনাকয়েক খাম্‌পা ডেরা-ডাণ্ডা জমিয়ে পড়ে ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে মনস্থ করলাম।

'খাম্' হলো চীন-তিব্বত সীমান্তের একটা প্রদেশের নাম। বর্তমান খাম্‌পাদের যাযাবর পূর্ব পুরুষেরা সেই 'খাম্' অঞ্চল থেকেই সম্ভবত ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল। আজকের খাম্‌পাদের বেশভূষায় কি আচারে এমন কি ভাষাভেও খাম-এর কোনো চিহ্নই নেই। বোধহয় সেই জন্যেই এদের শুধু খাম্‌পা না বলে গ্যগর খাম্‌পা বলা হয়। গ্যগর শব্দের অর্থ হলো ভারত। এইসব খাম্‌পাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসভূমি বা ঘরবাড়ি না থাকলেও এরা ভিক্ষুকশ্রেণীর নয়। ছোটখাটো সওদা কেনা-বেচা করেই মোটামুটি রুজি রোজগার চালায়। গরম পড়লে নিচের দিকে (সমতলে) বড় একটা নামে না। শতদ্রু-গঙ্গার সন্নিহিত উপত্যকায় সেই সময়টা কাটিয়ে দেয় খাম্‌পারা। উত্তরে, পশ্চিম তিব্বত পর্যন্ত যাতায়াত আছে। শীতকালে কিন্তু সিমলা হরিদ্বার এমন কি দিল্লীতেও এদের দেখা যায়। এরা আসলে তিব্বতের প্রজা কি ভারতের নাগরিক, সেটা বোধহয় এরা নিজেরাও জানে না।

আমার কাছেই ক'টা খাম্‌পা বাচ্চা ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল। তাদের ডেকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম তিব্বতী ভাষায়। বাচ্চাগুলো কান খাড়া করে শুনতে লাগল, ভালো বুঝল না। কিন্তু বড়রা বুঝল। আমার কথা শুনে একটি তরুণ খাম্‌পা আর তার মা আমার কাছে এগিয়ে এল। পোশাকে বেশ সভ্যভব্য ভারতীয় ভদ্রলোক, অথচ মুখে এমন বিশুদ্ধ লাসার ভাষা, এটা যে তাদের আশ্চর্য করেছে তা বোঝা গেলো হাবভাবে।

আমার তেষ্টা পেয়েছিল ভীষণ। দোকানের একটি লোককে ডেকে একটু খাবার জল আনতে বললাম। খাম্‌পা তরুণটি বললে, আমি চা নিয়ে আসছি। এই গরমে

এতখানি পথ চলার পর একটু ঠাণ্ডা জলের জন্যে প্রাণটা আনচান করছিল। সে অনুপাতে চায়ের তৃষ্ণা খুব প্রবল ছিল না। কিন্তু ছেলেটি বড় মুখ করে বললে, তার সহৃদয়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে মন চাইল না।

খাম্‌পা ছেলেটি বেশ মার্জিত রুচির তরুণ। কিছু কিছু লেখাপড়াও করেছে। ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির খবরও মোটামুটি রাখে। বার কয়েক সারনাথ আর বুদ্ধগয়া ঘুরে এসেছে। ছেলেটি আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল, মা গেলো চা করতে। নানা কথা নিয়ে আলোচনা হলো। বেশীরভাগ সেই বললে, আমি শুনলাম। কিছু আমিও বললাম। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে খাম্‌পা যুবকের স্বাস্থ্যদীপ্ত প্রশান্ত মুখের দিকে যখনই চোখ পড়ছে, মনটা কেন উন্মনা হয়ে যাচ্ছে। অতীতের কথা বারবার মনে আসছে। এর মতো আমিও একদিন জোয়ান ছিলাম, খেয়ালীও কম ছিলাম না। সেইসব বেপরোয়া উদ্বেগবিহীন উচ্ছল দিনগুলোর কথা আজ বারবার মনে আসছে। মনে হচ্ছে যদি আজ এখুনি এদের সঙ্গে এদের মতো করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ভেসে পড়তে পারতাম! খচ্চর আর তাঁবু সম্বল করে দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!

আহা, আজ যদি কোনো মন্ত্রবলে সেই ফেলে-আসা বিশ বছর বয়সটাকে ফিরে পাই একবার! এখুনি এই তরুণকে ডেকে বলি, নাও ভাই আমাকে তোমাদের এই ভবঘুরে জীবনের সঙ্গী করো। তোমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করব। তোমাদের সুখে-দুঃখের সমান অংশীদার হবো। মায়ের স্নেহের ভাগীদার হবার অধিকার অবশ্য পাব না, কিন্তু পত্নী মাত্র একজনই থাকবে উভয়ের বখরায়। আমাদের যাত্রা যে কেবল ভারত থেকে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্তই সীমিত থাকবে এমন কি কথা? তিব্বতের বিস্তীর্ণ মরু পার হয়ে সেই সুদূর অতীতের ফেলে-আসা খাম্‌-এ চলে যাব আমরা। ফিরেও আসব আবার। রাস্তায় আপদ আছে, আঘাত আছে—সবই জানি। শুধু দুর্গম পথই নয়, বন্দুকধারী অশ্বারোহী দস্যু দলেরও অভাব নেই পথে। সব জেনেও তবু তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকতে চাই চিরদিন। আমাকে তোমাদের সহযাত্রী করে নাও বন্ধু ...হায়রে ফেলে আসা দিন! পৃথিবীতে আজও এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি, পঞ্চাশ বছরের হৃতযৌবন যাতে বিশ বছরের উচ্ছল তারুণ্যকে ফিরে যায়।

বছরের এ সময়টায় খাম্‌পারা ওপরের দিকে চলে যায়। এবারেও তারই তোড়জোড় চলছে। তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তরুণটি জবাব দিলে, 'এ রকম জীবনযাত্রায় কষ্ট খুব, অসুবিধাও যথেষ্ট। কিন্তু যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় স্থায়ী আস্তানা গাড়াও চট করে সম্ভব নয়। তাতে নানা রকম অভাব এবং গোলযোগের সৃষ্টি হবে। আজ সব কিছু বেশ সহজে চলেছে, স্থায়ী হতে গেলে তাতে বাধা আসবে অনেক। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের একটা মোটামুটি সচ্ছলতা বজায় থাকে। পশ্চিম তিব্বতে মাংস প্রচুর পাওয়া যায়, মাখনও সস্তা। আহার্য সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। এখানেও (ভারতীয় এলাকায়) স্থানীয় লোকদের তুলনায় আমাদের খাওয়ার মান উঁচু। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গেলে ঠিক এমন স্বাচ্ছন্দ্যে দিন চলবে না। তাই আমার মতে, এই আমরা বেশ আছি। কারো সাতে-প্যাঁচে নেই। দেনা-পাওনার ধার ধারি না। কারো কাছে এক পয়সা বাকিও নেই,

কাউকে এক পয়সা দিতেও হয় না। কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করলে সে জায়গার সব সুবিধাও যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সেখানকার অসুবিধাগুলিও অনিবার্য রূপে ভোগ করতে হয়। তার চেয়ে এই চলমান যাযাবর জীবন আমাদে সব দিক দিয়েই ভালো।'

তার কথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তিব্বতের নির্জন গ্রামে (চাং থাং) চিনি কিংবা সিগারেট যেমন দুষ্প্রাপ্য জিনিস, এ অঞ্চলের গ্রামেও তেমনি রোজ রোজ মাখন কি মাংস পাওয়া যায় না। খাম্‌পা তরুণটির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তার সম্মানের অভাব, বৌদ্ধধর্মে কিঞ্চিৎ অনুরক্তি এ সব তো ছিলই, তার ওপর আবার কোথা থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির নামও শুনেছে। কথায় কথায় বললে, তিব্বতের বর্তমান আমলাশাহী, হাকিমদের আর জায়গীরদারদের জুলুম শেষ হওয়া দরকার। কথাবার্তা সব আমাদের তিব্বতী (ভোট) ভাষাতেই হচ্ছিল আর ছেলেটির মা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। চারপাইয়ে বসে কনৌরা দোকানীটি আমাদের মুখের দিকে বারবার অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল। বোধহয় মনে মনে ভাবছিল, এমন ভদ্রবেশধারী (আমার অঙ্গে ধুতিকুর্তা) লোক এমন চোস্ত তিব্বতী বলছে কি করে!

এখানকার বাসিন্দাদের দেখে-শুনে আমিও আশ্চর্য বড় কম হইনি। চিনী পরগনার বাইরের এলাকায় এইসব কনৌরারা ব্রাহ্মণদের ফাঁদে প্য দিয়েছে বটে কিন্তু ওদিকে আবার লামাদের গুপ্ত-মন্ত্রশক্তি আর সিদ্ধাইয়ের ওপরও তাদের ভরসা বড় কম নয়। এরা কালীও ভজে আল্লাও ভজে!

অনেক—অনেকক্ষণ পরে বিশ্বের যন্ত্রণা মাথায় করে রগ টিপতে টিপতে দৌলতরাম এসে হাজির হলো। কাজেই তাকে একটু বিশ্রাম করতে বললাম। বলে দিলাম সে যেন সন্ধ্যে নাগাদ নাচারে পৌছায়। বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। চড়াই পথ, এবং পাহাড়ের কোথাও বনস্পতির চিহ্নমাত্র নেই। বাঁ দিক থেকে রোদ এসে সোজা গায়ে মাথায় পড়ছে, গাছ না থাকায় কোথাও আটকাচ্ছে না। তবু চড়াই যে খুব একটা দুঃসহ লাগছে না তার কারণ, অন্যের পিঠের ওপর চড়ে পর্বতারোহণ করছি। চড়াই মাইল দুইয়ের অল্প কিছু বেশী হবে। তারপরেই একটা ভারী মনোরম ছায়াচ্ছন্ন পথে এসে পড়লাম। বোধহয় এ পথের সুন্দরতম অংশ এটাই। সারাটা পাহাড় জুড়ে, ঘন সবুজ দেবদারুর দল, ঋজু হয়ে আকাশপানে মাথা তুলে আছে। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রামের ইশারাও পাওয়া যাচ্ছে। পথ তো নয় যেন কুঞ্জবন! রাস্তার কাছাকাছি যে গ্রামটা পড়ল সেখানে একটা মন্দির পেলাম। গ্রামের নাম সুংরা, আঠারো-বিশ ঘর বাসিন্দা। এই অঞ্চলেই, কোথাও একটা গুহার মধ্যে, বাণাসুরের যোগ্যা সহধর্মিণী একাদিক্রমে সাতটি পুত্র-কন্যাকে পৃথিবীর আলোয় এনেছিলেন। তাদেরই একজন এখানকার মন্দিরের অধিষ্ঠাতা, আর দু'ভাই 'ভাবা' আর 'চাগাঁও' (ঠোলং)-এর ইষ্টদেবতা। সকলের বড় বোন, চিনীর কাছাকাছি একটি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমার মনে হয়, সব ভাইবোনেদের মধ্যে এই বড় বোনটিই বেশী সেয়ানা। আর সকলকে টাকাটা সিকেটা দিয়ে দায়ভাগে প্রাপ্য সম্পত্তির সারটুকুর স্বত্ব নিজের ভাগে নিয়েছেন!

দেবদারুর সঘন শ্যামল ছায়াবীথি দিয়ে চলতে চলতে মনটা ভরপুর হয়ে উঠল। ঘোড়াকে তার নিজের মতলব মতো চলতে দিলাম...

তেইশ মাইল যাত্রার অবসানে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নাচারে পৌঁছে গেলাম। নাচারের ডাকবাংলোটি বনবিভাগের, পি. ডব্লিউ.ডি.-র নয়। সড়ক থেকে বাংলোটা কিছুটা ওপরে; একটু ঘুরে ওপরে উঠলাম। সরকারী কন্‌জারভেটর ঢিলন সাহেব আমার আসার সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন কিন্তু কবে আসব সেটা জানতেন না। বেশ বড়সড় দোতলা বাংলোটি। মনে হয় একাধিক পরিবারের বাস আছে; তাই কোথাও খালি-খালি লাগল না।

খুব আপ্যায়ন করলেন ঢিলন সাহেব। তাঁর স্ত্রীও সহাস্য অভিবাদন জানালেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ঢিলন সাহেব তাঁর সময়কার দেরাদুন কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন এবং সাগরপারের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন। তাঁরা জাতে পাঞ্জাবী শুনে, প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি ওঁরাও সেইসব ভাগ্য বিড়ম্বিতদের দলে। কিন্তু পরে শুনলাম তা নয়, ওঁদের বাড়ির জলন্ধরে। গরমকালে উনি অফিস করেন এখানে—নাচারে। আর শীত পড়লে নিচে ফল্লোরে নেবে যান। চা পানের পরে আমরা বাগানে বেড়াতে গেলাম। অন্য ফল তখনও পাকবার সময় হয়নি, দেরি আছে। তবে চেরী গাছের কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হলো না। কপি আর নানা তরকারি লাগানো হয়েছে। আর মাস কয়েকের মধ্যেই এই বাংলো ফল-তরকারিতে ভরে থাকবে। এখন কিন্তু জিনিসপত্রের বড়ই টানাটানি।

সন্ধ্যে হতে চলল। দৌলতরামের পাত্তা নেই। আবার আরেক জনকে পাঠালাম। বাতিওয়ালা আলো জ্বালাতে চলেছে, তবুও দৌলতরামের কোনো খবর নেই। তবে কি মাথাব্যথা থেকে জ্বর-টর হলো! বড়ই ভাবনায় পড়লাম। পৌওার ডাকবাংলোয় আটকে গেলো না-কি বেচারা। ঘোড়াওয়ালাদের ফেরার সময়ে তাদের পইপই করে বলে দিয়েছি, তারা যেন দৌলতরামকে তাগাদা দেয়। আমার কাছে কাপড়-চোপড় যা রয়েছে, তাতে ৭০০০ ফিট উঁচুতে এই হিমেল রাত্তির কাটানো দুষ্কর। ঢিলন সাহেব চাদর দিলেন যদিও, আমার কিন্তু চিন্তা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। আবার তৃতীয় জনকে পাঠাব কিনা বিবেচনা করছি এমন সময় খবর এল, খচ্চর বেলা থাকতেই ওপরে পৌঁছে গেছে। উৎরাইয়ের মুখে ডেরাতে আরামে বসে খচ্চরওয়ালা রুটি সেঁকছে আর আমি এখানে বসে অকারণে ভয় পাচ্ছি আর নিজের ওপরেই রাগ করছি! কেবলই মনে আশঙ্কা— ১০৫ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে দৌলতরাম নিশ্চয় কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আর খচ্চর নিজের খুশি মতো কোথাও চলে গেছে।

বাস্তবিকই বাংলোয় জায়গা প্রায় নেই বললেই হয়। আমি রীতিমতো সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। আমার আগে থেকে খবর না দিয়ে আসায় ঢিলন দম্পতি নিশ্চয়ই অসুবিধেয় পড়েছেন। আহারাদির পর গৃহস্বামী অত্যন্ত সঙ্কোচে জানালেন, কাছেই একটা কোয়ার্টার আছে তবে সেখানে থাকতে খুব কষ্ট হবে। লণ্ঠন হাতে করে নিজেই নিয়ে গেলেন আমায় সঙ্গে করে। ডাকবাংলোর মতো না হলেও কোয়ার্টারটি মন্দ নয়—যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা, পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। ঘরে একখানি নেওয়ার লাগানো খাট এবং কয়েকখানি চেয়ার-টেবিলও রয়েছে। আর কি চাই? এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গী বলতে ঢিলন সাহেবই ছিলেন। এখানে এসে আলাপ হলো বাবু আমীচন্দের সঙ্গে। আমীচন্দ

এখানে পঙ্গীবাবু নামেই সমধিক পরিচিত। নেগী ঠাকুরসেন পঙ্গীবাবুকেও পত্র দিয়ে আমার কথা জানিয়েছেন শুনলাম। কার এখান থেকে ঘোড়া পাব কিনা, সে বিষয়ে টিলন সাহেবে যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু পঙ্গীবাবু আশ্বাস দিলেন। আমি চিন্তা করছিলাম আগামী তিন মাইল চড়াই পথের কথা—আগামীকাল প্রথমেই যে চড়াইটা ভাঙতে হবে। তার পরবর্তী সাত-আট মাইল সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না।

আমিচন্দ বললেন, বাঙতুর বাংলো পর্যন্ত তিনি নিজে আমার সঙ্গে যাবেন। সড়কের ইন্সপেক্টর লক্ষ্মীচাঁদবাবু সেই বাংলোতেই আপাতত রয়েছেন। তাঁর ঘোড়াটা পাওয়া যাবে। চড়াইয়ের আশঙ্কায় মনটা কণ্টকিত হয়েছিল, পঙ্গীবাবুর আশ্বাসে কাঁটা সরে গেলো। নিশ্চিত মনে শুয়ে পড়লাম। শুনলাম—মনে করলাম বিশ্রাম হবে। তা হবার নয়, আবার রাজ্যের চিন্তাভাবনা এসে মাথায় ভিড় করতে লাগল। টিলন সাহেব বলছিলেন, এ দিকের রাস্তায় ভালুক আছে। মানুষ বড় একটা না মারলেও গরু বাছুর ছাগল ভেড়া এন্তার মেরে খায়; বেশীরভাগই কালো ভালুক। কিন্তু ওপর অঞ্চলে বাদামী ভালুকও যথেষ্ট আছে। ভালুক জন্তু-জানোয়ার মেরে খায়, কথাটায় আমার বেশ আশ্চর্য লাগল। আমার ধারণা ছিল, এক সুমেরু অঞ্চলের শ্বেত ভালুকই যা মাছ খায় যেমন আমার বাঙালি ভায়েরা খান—জলপটল বলে। আর অন্য সমস্ত ভালুক বুঝি পরম বৈষ্ণবের দল, নিরামিষভোজী! তা'হলে তো ধারণা ভুল! বড়ই ভাবনার কথা হলো। নির্জন বাংলোর চারপাশে এই পরম শান্ত বৈষ্ণবের দল যদি বেড়াতে আসে বা একটু-আধটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যায়, তা'হলে? মনটা বড় ভীতু হয়ে পড়ছে দেখে মনকে বোঝালাম, নাচার বনবিভাগের একটা আঞ্চলিক কেন্দ্র। এখানে এই ধরনের ডজন ডজন কোয়ার্টার রয়েছে। সব ছেড়ে এটাতেই বা আসতে যাবে কেন ভালুক। শেষে ঘুম এল, আর বাস্তবে কেন, স্বপ্নেও জাম্বুবানের আবির্ভাব ঘটল না।

উনিশে মে, সকাল বেলাই ঘুম ভেঙে গেলো। শৌচ ও প্রাতকৃত্যাদি শেষ করলাম। টিলন সায়েবের ওখানে চা তো তৈরিই ছিল, সৎকার হলো। স্নানের কথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এখানে আমি সপ্তাহে একবারের বেশী স্নান করাটা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। নইলে আর হিমালয়ের মাহাত্ম্য কোথায়? তার পার্বত্য বাতাসের পবিত্রতা তা'হলে আর কোথায় রইল?

বাবু আমীচন্দ আর আমি নিচে নামছি। নাচার থেকে তিন মাইল বাঙতুর পুল পর্যন্ত সমানে উৎরাই। পথ সোজা ঢালুতে নেমে গেছে, এর ভয়াবহ রূপ এখন বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ফেরার পথে যখন এই একই উৎরাই চড়াই হয়ে দেখা দেবে তখন চোখে ধুতুরা ফুল দেখাবে। এ বারে পর্বতের নগ্ন রুক্ষ রূপ চোখে পড়ছে। নদী পার হবার পর থেকে তো আরও বেশী। শতদ্রুর পুলের থেকে কিছুটা ওপরেই ডাকবাংলো। তারও বেশ খানিক আগে আবার একটি খদ্দ (ছোট নদী) পড়ল। নাচার থেকে চিনী পর্যন্ত যদি রোপওয়ে করা হয়, তখন এই নদীর জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। অবশ্য দারুণ শীতের সময়ে তুষারপাতের ফলে এইসব খদ্দগুলো সব জমে গিয়ে হিমানী সম্প্রপাতের রাস্তা হয়ে পড়ে। তবে তা থেকে বাঁচতে হলে, জলধারাকে কাছাকাছি অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়ে কৌশলে সুরক্ষিত স্থানে আটকাতে হবে এবং পাওয়ার হাউস তৈরি করা তো অপরিহার্য।

আরও ঘণ্টাখানেক লাগল বাঙতুর বাংলোয় পৌঁছাতে। বাকি রইল আরও আট মাইল পথ। রাস্তা পরিদর্শক লক্ষীবাবু বাংলোতেই রয়েছেন; ঘোড়াও নিশ্চত পাওয়া যাচ্ছে—কাজেই বিশ্রাম করার যথেষ্ট সময়ও হাতে রয়েছে। ইন্সপেক্টর সাহেব আহারের অনুরোধ নিয়ে এলেন। কিন্তু কালকের খাবারই এখনও হজম হয়নি। তেষ্টা পেয়েছিল বেশ। ঝর্ণার জল প্রাণভরে খেলাম, জল তো নয় অমৃতধারা। বাংলোর আশেপাশে উঁচুনীচু জমি অনেক পড়ে রয়েছে দেখলাম। ফলের বাগান কিম্বা তরিতরকারীর ক্ষেত স্বচ্ছন্দে করা চলে। কিন্তু কে-ই বা করে? কারোর শখও নেই উৎসাহও নেই। দু-তিনটে খোবানীর ক্ষেতের মতো দেখলাম বটে কিন্তু সেও যেন কেমন অনাথ ধরনের চেহারা।

ঘণ্টা চারেক বিশ্রামের পর আবার রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবারে লক্ষীচন্দবাবু সঙ্গে চললেন। আর বাবু আমীচন্দ এখান থেকে ফিরে গেলেন। আরও খানিক পথ উৎরায়ের পর শতদ্রুর তীরে বাঙতুর সেতুর দেখা পেলাম। লোহার তৈরি সেতু। সম্প্রতি রামপুর থেকে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি সেতু শতদ্রুর ওপরে হয়েছে। কিন্তু এই সেদিনও তার যথেষ্ট অভাব ছিল।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝিও অবস্থাটা কি ছিল একটু বর্ণনা করা যাক। ঘাসের দড়ি দিয়ে একটা দোলনা গোছের বানানো। গোটা চারেক লম্বা ঘাসের দড়ি এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত মজবুত করে বাঁধা। মাঝে মাঝে যে জোড়গুলো তাও ঘাসের দড়িতেই বাঁধা। দড়ির ফাঁকে কাঠের সরু ফালি দিয়ে পা রাখবার জায়গা। পা রাখলেই দোলে আর নিচে, পায়ের তলায় শতদ্রু তরঙ্গের ক্ষুধিত উচ্ছাস, একটু এদিক ওদিক হলেই বিশ্বরূপ দর্শনের সম্ভাবনা। তা মানুষ হাজার হলেও বানরের বংশধর। অসুবিধা হতো বেচারী ছাগল ভেড়াদের। বাঙতুর বর্তমান সেতু লোহার তৈরি, খুব মজবুত। পা রাখলে দোলে না—নিচে পাতালের বিভীষিকাও দেখা যায় না। বাঙতুর সেতু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫২০০ ফিট উঁচুতে। আশপাশের অন্য জায়গার তুলনায় এখানটাকে গরম বলা চলে। সেতু পার হবার পরে এখন থেকে আমাদের শতদ্রুর দক্ষিণ তট ঘেঁসে চলতে হবে। কিছুক্ষণ চলার পরে বাঁদিক থেকে তাবা-র খদ্দ গর্জন করতে করতে এসে শতদ্রুর বুকে আছড়ে পড়ল। এই খদ্দের পাশে দু-তিনটি গ্রাম আছে। এর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু ক্ষেতখামার পেরিয়ে স্পিতী পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। লোকের যাতায়াতও কিছু আছে এ পথে। এমনিতে স্পিতী যাবার কোনো বড় রাস্তা এ দিকে নেই।

ভারত-তিব্বত সীমান্তের শেষ গ্রাম নম্প্যারগার পাশ দিয়েই স্পিতী যাওয়ার সড়ক বেরিয়েছে। এখন স্পিতীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই কিন্তু স্পিতীর স্মৃতি ভোলবার নয়। আজ থেকে একশো বছর আগে স্পিতী লাদাখেরই অংশ ছিল। সেখানকার বাসিন্দারা ভোট ভাষায় কথা বলত। লাদাখ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হলো, আর অনাথা স্পিতী মালিকের খোঁজে রইল। ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি পড়ল—কিন্তু ছোট এলাকা, তায় তীব্র ঠাণ্ডা, আমদানির দিকে কিছু নেই বললেই হয়—শাসন-ব্যবস্থা চলবে কেমন করে? ১৮৬৪ সাল নাগাদ একজন ইংরেজ আমলাকে পাঠানো হলো। তাকে বলা হলো, গিয়ে দেখ কত সস্তায় শাসনতন্ত্র চালানো যায়। সেই আমলা

সুপারিশ করলেন, লাদাখেরই কোনো রাজ কর্মচারীকে বৃটেনের প্রতিনিধি হিসেবে স্পিতী রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হোক। সেই থেকেই নোনো বংশের লোকেরা স্পিতীর মুকুটহীন সম্রাট। কালেভদ্রে কুলুর ছোট কমিশনার মহোদয় মৃগয়ার্থে যেতেন তো যেতেন নইলে স্পিতী বেচারী তার ভাগ্য নিয়ে একান্ত পরিত্যক্ত হয়েই ছিল। আজ ভারতের মানচিত্রে স্পিতীর স্থান হয়েছে, কিন্তু স্পিতীর অধিবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। আর যতদিন স্পিতী পাঞ্জাবের হাতে থাকবে ততদিন কিছু হবেও না। ভালো করে ভেবে দেখলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কাংড়ার লাহুল, স্পিতী এই সব তিব্বতী ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলোকে যদি হিমাচল প্রদেশে নিয়ে আসা যায়, এবং কনৌরের হং রঙ-এর মতো তোট-ভাষী এলাকায় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার সুযোগ দেওয়া যায়, তবেই ঐ এলাকাগুলোর সত্যিকার উন্নতি সম্ভব হবে, নইলে নয়।

ভাবা খদ্দের পুল পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। সামনেই পর্বত আর নদীর শত শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামের শিলালিপি। এক জায়গায় পাহাড়কে কোণাকুনি কেটে তেরছা হয়ে বেরিয়ে গেছে শতদ্রু। লাখ-লাখ বছরের লড়াইয়ে অবশ্য পর্বতকে হার মানতে হয়েছে নদীর কাছে। কিন্তু সমুদ্র থেকে ভেসে-আসা মেঘের দলকে সবল বুক দিয়ে বাধা দিয়ে রাখতে আজও সে অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে নিচের অঞ্চল আর্দ্র, আর উপরাঞ্চল শুষ্ক। নিচে যখন প্রবল বর্ষায় ভেসে যাবার উপক্রম, ওপরে তখন বর্ষার পরিমাণ ১৫ থেকে ২৫ ইঞ্চি। বেগবান উদ্ধত মেঘের দল সদর্পে আসে, কিন্তু আছড়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে চুরমার হয়ে যায়। জলের আশায় যারা থাকে, তাদের বিফল মনোরথ হতে হয়। পর্বতগাত্রের সরু ছিদ্র দিয়ে খানিক-খানিক মেঘের টুকরো ক্ষীণ জলধারা হয়ে ভিতরে ঢুকলেও, সে ধারার দানে শতদ্রু পুষ্ট হয় না। রাজ্ঞী শতদ্রুর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যদীপ্ত রূপ যৌবনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, সেই নির্বোধ মেঘের দল তার পরিচারিকা বস্পার কোলে ঢলে পড়বার জন্যে অস্থির হয়। সেদিক দিয়ে দেখলে চিনীর বাসিন্দাদের তুলনায় বস্পার বাসিন্দারা বেশী ভাগ্যবান, বর্ষার জল তারা অনেক বেশী পায়। কিন্তু আবার শুষ্ক জল হাওয়ার জন্যে ফল-মেওয়া যা চিনীতে প্রচুর জন্মায়, বস্পায় তার অভাব যথেষ্ট। বিশেষ করে আঙুর, যা এ অঞ্চলের একটা ভালো ফসল, বস্পায় সেটা হয়ই না—এত ভারী বর্ষা যে, ওখানকার লোকে আঙুরের চাষই করে না।

শতদ্রুর পাশ দিয়ে মাইল চারেক রাস্তা হাঁটলাম, রাস্তা প্রায় সমতল। নদীর ওপারে ছোলটুর ডাকবাংলো দেখা গেলো, বাংলো বন-বিভাগের। টিলন সাহেবের সুপারিশ মতো ওখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা হলো। জায়গাটা গরম তাই শাক-তরকারী ফল-ফুলুরি সব রকম ফসলই, চিনী কিংবা নাচারে ওঠার আগেই ছোলটুতে পেকে, কাটার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

বাংলোর হাতায় তরকারি বাগিচা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু কে আবার পুল পার হয়ে অত রাস্তা যায়। অবশেষে একটি টাপরীর (কুটিরের) ধারে এসে পড়লাম। ডাকহরকরা এখানে রাত কাটায়। অন্য লোকেও প্রয়োজন মতো বিশ্রাম নেয়। টাপরীতে খান তিন-চার কামরা রয়েছে। বাঙতুর এ পারে সাধারণত বর্ষার পরিমাণ কম। কাজেই

জঙ্গলেরও খুব বাড়-বাড়ন্ত নেই। এ অঞ্চলের দেবদারু খুব ভালো না হলেও অন্য কাঠের অভাব নেই। এই বাংলো, টাপরী ইত্যাদি তৈরির ব্যাপারে অঢেল কাঠ খরচ করা হয়েছে।

আমরা টাপরী পৌঁছাবার কিছু আগেই, ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁর রাস্তা তদারকির কাজে লেগে গেলেন। সহিসকে নিয়ে আমি অশ্বিনীপৃষ্ঠে ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে চললাম। আমার অশ্বিনী-শ্রেষ্ঠা এমনি ক্ষীণ কলেবরা যে ভয় হতে লাগল— চড়াইয়ের মুখে যে কোনো মুহূর্তে ধোকা না দেন। শঙ্কিত চিত্তেই চললাম। টাপরীতে বসে সহিস মহোদয় ছিলিম ভরে নিলেন। তাঁর ধুমপান বেশ সতেজে চলতে লাগল। আমার ধুমপানের ইতিহাস এই, ছাব্বিশ মাসের ব্রতভঙ্গ করে লণ্ডনে সিগারেট খেয়েছিলাম এবং তার ছ'মাস পরে আবার ব্রতের পুনরুদ্‌যাপন শুরু করি এবং এ পর্যন্ত আর সিগারেটকে ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দিইনি। সিগারেট অতিথিসেবার একটি বিশিষ্ট উপকরণ এ কথা মানি। কিন্তু যে নিজে সিগারেট খায় না, সে অতিথির জন্যে সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। যদি আমি নিজে খেতাম, তবে আর বেচারা সহিসকে সামান্য ধুমপানের জন্য ঐ দুর্গন্ধময় টাপরীতে বসতে হতো না। আমার তেষ্টা পাচ্ছিল। কিন্তু জলের রঙ যা গৈরিকবরণ, তেষ্টা মাথায় উঠেছে...

এবারে সামনে প্রায় তিন মাইল পথ শুধুই চড়াই। বড় সহজ কথা নয়, এখান থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচুতে চড়তে হবে। রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে উড়নীর পথে। পথের ধারে ধারে নানান ফসলের ক্ষেত।

এ জায়গাটার নাম চাগাঁও। আবার কেউ বলে পাগ্রামং। রাজগ্রাম ঠোলঙ ইত্যাদি আরও ক'টা নাম আছে এ গাঁয়ের। এখানে কোথায় যেন রূপোর খনি আছে কিন্তু দেবতার প্রসাদে সে যে কোন যুগ থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছে তা কে জানে? কিছু সাদা পাথর আমায় একবার দেখানো হয়েছিল কিন্তু তার ওজন এত কম যে, তাতে রূপো থাকলেও পরিমাণে নিতান্ত অল্প। খুদ পাগ্রামং (চাগাঁও এলাকা) কিন্নর দেশের সপ্তরাজ্যের অন্যতম, আগে কোনো সময়ে এখানে এক রাজা বা ঠাকুর বাস করতেন, রাজগ্রাম নামের ইতিহাস এই। আবার চার গ্রামের এক গ্রাম বলে সংক্ষেপে চাগাঁও বলা হয়।

ক্ষেত খুব প্রশস্ত আর বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সে অনুপাতে জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। সমগ্র কিন্নর দেশেই জলসঙ্কট একটা প্রধান সমস্যা। সে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন বহু ব্যয়সাপেক্ষ বড় বড় পরিকল্পনার। এ কথা সত্যি যে, খরচ করা গেলে সে খরচ সার্থক হবেই। আজকের ব্যয় একদিন দশগুণ বিশগুণ হয়ে ফিরেও আসবে, কিন্তু হিমাচল প্রদেশের মতো একটা গরীব রাজ্যের পক্ষে, লক্ষ-লক্ষ টাকার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব কি? তার ওপর তার দেহের একটা বড় অংশ ব্যবচ্ছেদ করে, সেখানে দশ লাখ লোকের ঘনবসতিপূর্ণ একটা জেলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

না! আমার আশঙ্কা ভ্রান্ত প্রমাণ করে আমার ক্ষীণাঙ্গী অশ্বিনী ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে ওপরে চড়তে লাগল, এবং সন্ধ্যের অনেক আগেই ১২৫ মাইলের মাথায়

উড়নীর ডাকবাংলোয় আমায় পৌঁছে দিলো। দৌলতরাম আমাদের মতো বাঙতুতে অপেক্ষা করেনি। তাই সে আমাদের অনেক আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছিল। পি.ডব্লিউ.ডি.-র ডাকবাংলো। দু খানি পরিচ্ছন্ন কামরা সব দিক দিয়ে আরামপ্রদ। যদিও বাংলোর গায়েই জঙ্গল! তবু উপায় কি?

সেই সকালে চা খাওয়া হয়েছে, আর মধ্যে বাঙতুতে এক গ্লাস ঘোল খেয়েছি। কাজেই এখানে খিদেটা যে বেশ জোর জানান দেবে, তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কিন্তু এ বাংলোয় আমার জন্যে কে আর তৈরি খাবার রেখে দিয়েছে।

মিষ্টি বিস্কুট খাওয়া নিষেধ আর বিনা মিষ্টিতে তৈরি ফ্যাস্‌কা বিস্কুট একদম মুখে রোচে না। দু'চামচ গ্লুকোজ চেখে কি আর খিদে মেটে! এসেছি মেওয়ার দেশে, চোখের সামনে দ্রাক্ষালতার মনোহরণ রূপও দেখা যাচ্ছে। ফল পাকবার সময় যদিও হয়নি, মনে ভাবলাম শুক্‌নো ফলও কি কয়েকটা মিলবে না। বাংলোর মেট খোঁজাখুঁজি করে কয়েকটা ন্যোজা (চিলগোজা) এনে দিলে। চিলগোজার গাছ দেবদারু জাতীয়। কিন্তু তার ছাল শুকিয়ে গিয়ে গাছের গায়ে লেপটে থাকে না। সাপের মতো হরদম খোলস বদলাতে থাকে। তার ফলে এ গাছের ডালপালা বছরের সব ঋতুতেই সাদা কিংবা সবুজ হয়ে থাকে। ফলগুলি বাদাম জাতীয়, মুখের দিক ছুঁচলো। প্রায় পাঁচ ছয় আঙ্গুল লম্বা হয়। পাকলে ফলের ওপরকার শক্ত খোলাটা ফেটে যায়। তার ভেতরে পাতলা পাতলা লম্বা খোসা সমেত কোয়া বা বীচি পাওয়া যায়। এইগুলোই ন্যোজা বা চিলগোজা। ভেজে খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত। চিলগোজায় বাদামের মতোই তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, অত্যন্ত মুখরোচক জিনিস। এই গরীব দেশে সাধারণ লোকের কাছে খাদ্য হিসেবে এর মূল্য অনেক। কিন্তু আজকাল বাইরের বাজারে চালান যাচ্ছে বেশী, তাতে পয়সা হয়। হিমালয়ের এই অঞ্চলে যত চিলগোজার চাষ হয় আর কোথাও তেমন নয়। পেশোয়ারের উত্তরে পাহাড়ী এলাকায়ও চিলগোজা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সম্মানিত অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার সময়ে লোকে রেশমী সুতোয় চিলগোজার মালা গেঁথে পরায়। এমনিতর আরও অনেক গুণ চিলগোজার। কিন্তু এই এক চিলগোজা সংগ্রহ করতে কত প্রাণ যে অকালে নষ্ট হয়েছে, তার হিসেব নেই। হিমালয়ের পার্বত্য পাদপ—বাগানে শখ করে পোঁতা গাছটি তো নয়। আর মানুষের আকাঙ্ক্ষাও অহরহ তার সাধ্যের সীমানাকে ছাড়িয়ে যাবার সাধনা করে চলেছে।

মেট ন্যোজা এনে দিলো। আমিও বসে গেলাম খোসা ছাড়িয়ে সেবা করতে। হাতে আর কাজই বা কি? বাংলোর চৌকিদারকে কোথাও পাওয়া গেলো না। সে বেচারার অপরাধই বা কি? এই গ্রামেই তার বাড়ি। বাড়ি-ঘরের কাজকর্মও থাকে লোকের। মেট বেচারা অনেক করলে। শুধু চা নয় হাতে গড়া রুটিও খাওয়ালে। এখানে দুটি খচ্চরের জন্যে ছ'টাকার ঘাস লাগল। আটার দর নিলে টাকায় সওয়া সের।

মিডল স্কুল পর্যন্ত পড়া একটি তরুণ আমার কাছে অনুযোগ করলে একটা ইস্কুল কি ডাকঘর এখানে নেই। দশ মাইল চড়াই উৎরাই ঠেলে নদী পার হয়ে রোজ রোজ কিল্‌বায় পড়তে যাওয়া ছেলেদের পক্ষে সম্ভব নয়। চিনী কিংবা নাচারের দূরত্ব তো

খাবো বেশী। আমি ছেলেদের এই ব্যাপারে আবেদনপত্র লিখিয়ে দিলাম। বাস্তবিকই হিমাচল প্রদেশে শিক্ষাব্যবস্থা এবং ডাক-চলাচলের সম্প্রসারণ হওয়া একান্ত দরকার।

রাজধানী চিনীর পথে

প্রাতঃরাশের পরই রওনা হলাম। প্রাতঃরাশ কিঞ্চিৎ গুরু হওয়াই প্রশস্ত, সারাদিনের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আজকে চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। উড়নীর পর থেকেই পথ উৎরাইধর্মী হয়েছে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরে যুলার খদ্দ পথে পড়ল। যুলা গ্রামখানি বেশ বর্ধিষ্ণু, রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। রাস্তার অদূরে অল্প ওপরে আরও একখানি গ্রাম, নাম মীরু। রাস্তার দু'ধারে যবের ক্ষেতে ফসল কাটার পালা চলেছে। ওপরের ক্ষেতগুলোয় এখনও সবুজের মেলা। ভারী মনোরম লাগছে সব কিছু। রোজ অন্ততঃপক্ষে চার পাঁচ মইল পায়ে হাঁটবার একটা নিয়ম বেঁধে নিয়েছি—প্রায় ব্রতের মতো অলঙ্ঘনীয়। কথায় বলে, চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে, আমার হয়েছে তাই। কায়িক শ্রমকে অবহেলা করে ডায়েবেটিস্‌কে ডেকে এনেছি, এখন চাইছি মেহনতের মর্যাদা দিতে!

তুঙ্গশীর্ষ দেবদারুদের দু'ধারে পাহারায় রেখে এগিয়ে চলেছে সড়ক। এ সড়ক অল্প দূর গিয়েই সংরক্ষিত অরণ্যে (রিজার্ভ ফরেস্ট) প্রবেশ করেছে। বন বিভাগের সামান্য আয়াস—সময় মতো বীজবপন, চারা-লাগানো, ছাগল-ভেড়ার উৎপাত থেকে চারা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, আশপাশের লোকদের ওপরও খানিক খানিক আইন-কানুনের ঈষৎ কটু-তিক্ত প্রয়োগ, এ সব কিছুই পরিণামে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই চারিদিকের রুক্ষ উষ্ণতার মাঝখানে এমন একটি ঘন শ্যামলিমার আয়োজনের দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাস্তবিক এ দিকে, বন-বিভাগের হাতে শুধু বাণিজ্য-সংক্রান্ত ক্ষমতাই নয়, বন রক্ষণাবেক্ষণের ভারও দেওয়া আছে। না হলে এই অঞ্চলের চেহারা অন্য রকম হতো! কৃষিজীবীদের মোটেই পছন্দ নয় যে, কেউ তাদের স্বাধীন চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করুক। কিন্তু কোনো উপায় নেই। জঙ্গল-বিভাগের পুরনো রিপোর্টে দেখা যায়, এক সময়ে বনজঙ্গল পুড়িয়ে চাষের ক্ষেত বানিয়ে ফেলার রীতি ছিল। কয়েক বছর এক জায়গায় চাষ-আবাদ করার পরে চাষীরা স্থানান্তরে চলে যেত। আবার সেখানে গিয়ে নতুন করে জঙ্গল পোড়াত। বেশী দিনের কথা নয়, আশী বছর আগেও এই নিয়ম চলত। নিজের কিম্বা নিজের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের ব্যাপারেও মানুষের কত অদূরদর্শিতা! এই সংরক্ষিত বনভূমি এবং এমনি আরও কয়েকটা রমণীয় জায়গা বিশ-বাইশ বছর আগের আমার সেই তরুণ মনে এমন রঙিন ছবি এঁকে দিয়েছিল যে, কিন্নর দেশের কথা উঠলেই আমি এ দেশের নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতাম। বলতাম, কিন্নর দেশ হলো হিমাচলের উর্বশী কন্যা। শতদ্রু উপত্যকায় হিমালয়ের দীর্ঘতম দেবদারু বনস্থলীর অবস্থানের কথাও কতবার বলেছি।

সবে বনের পথটুকু পার হয়েছি হঠাৎ পায়ে এসে লাগল কতকগুলো নুড়ি পাথর। ওপরে যে ছাগল-ভেড়া চরে বেড়ায় তাদেরই পায়ের ধাক্কায় গড়িয়ে পড়েছে। আগেই

খবর পেয়েছি 'রোগী'র মাইল চারেক আগে রাস্তা দারুণভাবে ভেঙেছে। মনে করেছিলাম, এও সেই শোলডিংয়ের মতোই ভুয়ো খবর। কিন্তু এ বারে তা নয়, পালে সত্যিই বাঘ পড়েছে। বিগত শীতে হিমানী-সম্প্রপাতের মহিমায় রাস্তার চিহ্ন প্রায় নেই বললেই হয়। পথের ওপর খানাখন্দ হয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল বয়ে চলেছে। রাস্তা আর রাস্তা নেই, নালা হয়ে গেছে। পাশেই ছাগল-ভেড়া চলে চলে একটা পায়ে হাঁটার পথের মতো হয়েছিল, এখন দেখলাম লোকজনও সেই পথেই যাতায়াত করছে। এ রাস্তা সোজা নাক বরাবর উপরে উঠে গেছে। তাতে আমাদের তেমন কিছু অসুবিধে নেই। আমাদের সমতলবাসীদের বিপদ হলো উৎরাইয়ে। চড়াই যত খাড়াই হোক, ফুসফুসের পক্ষে খানিকটা কষ্টকর হলেও তাতে পায়ে হাঁটার ব্যাঘাত হয় না। আর উৎরাই? যদি তেমন তেমন উৎরাইয়ের মুখে পা একবার পিছলোয়, ব্যস আর দেখতে হবে না। আর পিছলানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সোজা উৎরাইয়ের রাস্তায় পাহাড়ীরা যেমন পা আড়াআড়ি রেখে নামে, আমরা সমতলের লোকেরা সে কায়দায় হাঁটতে জানি না।

এ পথটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। নেগী সন্তোখ দাস আমায় বলেই দিয়েছিলেন, রাস্তার মাটি কাঁচা, কাজেই আলগা। যে কোনো মুহূর্তে ধ্বস নামা বিচিত্র নয়। যতক্ষণ না খালের জল ঢেলে কাঁচা মাটি ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন রাস্তা পাকা করা সম্ভব নয়। তার মানে আমার ফিরে আসার সময়ের মধ্যে এ রাস্তা বাঁধানো হয়ে যাবে এমন আশা কম। যাইহোক কোনো মতে দুর্গানাম জপতে জপতে এ বারকার যাত্রায় সবচেয়ে দুর্গম পথট অতিক্রম করলাম।

উৎরাই শুরু হলো। রাস্তা সোজা নেমে গেছে, তবে বেশী দূর নয়। কিছু দূর যাবার পর দৌলতরামকে খুঁজলাম, পেলাম না। ঠাহর করে সামনে দেখবার চেষ্টা করলাম, দেখা গেলো না। তবে কি সে পিছনে পড়ে রইল, না-কি পা পিছলে খচ্চরসুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল নিচে? এ যা রাস্তা উৎরাইয়ের মুখে গড়িয়ে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। আরো কিছু দূর এগিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। তারা চা তৈরি করছিল। লোকগুলো বলল, কোনো খচ্চর এ পথে যায়নি এখনো। সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলাম। খানিক পরেই দৌলতরামের দর্শন পাওয়া গেলো, ঠুক-ঠুক করে খচ্চর নিয়ে আসছে। ওকে বলা ছিল, সোজা পথে চিনীর বন-বিভাগের বাংলোয় যাবার কথা।

'রোগী' গ্রামের ঠিক প্রবেশ-পথের ওপরেই বাঁদিকে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। একরাশ ভাঙা-চোরা করোগেটেড টিনের ছাদ তাল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে, তারই পাশে কাঠ আর পাথরের স্তূপ। এ বছর যে দারুণভাবে হিমানী সম্পাত হয়েছে—এটা তারই নির্দশন। পাহাড়-পর্বতের যত উঁচু নীচু এবড়োখেবড়ো জমি, তার ওপর বরফ পড়ে পড়ে সমতল হয়ে আসে। তার ওপরে স্তরে স্তরে তুষার জমতে থাকে তো জমতেই থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সঞ্চিত তুষারে ভার এত বেশী হয়ে পড়ে যে নিচের মাটি সে ভার আর বইতে পারে না। তখন মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্যের গলিত অগ্নিস্রাবে গলতে থাকে সেই যুগান্ত-সঞ্চিত হিমের পাহাড়। আর তারপর সেই লক্ষ লক্ষ মণ জমাট বরফ নামবার পথ করে নেয়, তখন সে কোনো বাধাকে গ্রাহ্য করে না।

দেবদারুর দল কুটোর মতো সামনে নুয়ে পড়ে, গ্রামের পর গ্রাম মাথা নত করে শুয়ে পড়ে, বড় বড় পাথরের চাঙড়গুলোও নুড়ির মতো ছিটকে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে নিচে—অনেক নিচে। সব বরবাদ করে দিয়ে চলে যায় চলমান হিমশিলা। সামনে তখন ঐরাবত পড়লে তাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে, এ তো ছার পি. ডব্লিউ.ডি.-র ডাকবাংলো! এঞ্জিনিয়ার তার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। কিন্তু একটু বেশী কঠোর হয়নি কি দণ্ডটা?

এ সব অঞ্চলে গ্রাম বসেছে অনেক দিনের অভিজ্ঞতার পর। লোক যখন বুঝেছে— এ জায়গায় হিমপাতের সম্ভনা নেই তবেই সেখানে গাঁ বসিয়েছে। এ সবের পেছনে অনেক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আছে। নদী নালা দিয়েই তো চিরকালই হিমানীধারা বৃষ্টিধারা বয়ে আসছে, সেখানে আবার কে কবে বাড়িঘর করে থাকে? এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বেশী দুঃসাহস। ঝিরঝিরে নদীর গায়েই দেবদারু বনের ভেতরে খাসা জায়গাটি নজরে পড়েছে—ব্যস আর লোভ সামলাতে পারলেন না। দেবদারুর গাছগুলোর দিকে এক নজর দেখেই বুঝলেন, বেশ পুরনো হয়েছে, অন্তত বছর তিরিশকে বয়স তো হবেই। বানিয়ে ফেললেন একখানা সুন্দর বাংলো। সেই মনোরম বাসস্থানের আজ কি দশা!

ভাঙা রাস্তায়, খাড়া চড়াইয়ের পথে ঘোড়ার প্রয়োজন থাকে না। সওয়ারীকে হেঁটেই যেতে হয়। আজ সারাদিন ঘোড়ার কোনো খাটুনি হয়নি। এখন আর দরকারও হবে না, তাই ঘোড়াটা ফিরিয়ে দিলাম এখান থেকেই।

'রোগী' পৌঁছাতে প্রায় একটা বেজে গেলো। কনৌরের মেওয়া কাননের রাণী হলো 'রোগী' আর স্থানীয় জেলার সাহেব নেগী সন্তোখ দাস হলেন ফলের বিশেষজ্ঞ। মণি-কাঞ্চন সংযোগ। নেগী পরিবার ধনী এবং শিক্ষিত। সন্তোখ দাসের বড় ভাই কিন্নরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ইনি নিজে অবশ্য উর্দু ভাষাতেই লেখাপড়া করেছেন। ভদ্রলোক যেমন মার্জিত রুচি তেমনি অমায়িক এবং সদালাপী। রাজা পদম সিংহের দরবারে বিশিষ্ট অমাত্য হিসাবেও অনেক দিন ছিলেন।

আর মাইল তিন-চারেক পথ, রাস্তাও ভালো। আস্তে আস্তে হাঁটলেও চলবে। লোককে জিজ্ঞেস করে করে নেগীর বাড়ি পৌঁছালাম। এখানকার মেয়েরা বড় একটা গাঁ ছেড়ে বাইরে যায় না তাই কিন্নর ভাষার বাইরে আর কিছু তাদের বোধগম্য নয়। হিন্দী তো অনেক দূরের কথা। তবে যে সব মেয়ে স্বামী কি ভাইয়ের সঙ্গে ছাগল-ভেড়া নিয়ে শীতের দিনে নিচের পাহাড়ে কাটিয়েছে, তারা খানিকটা পাহাড়ী হিন্দীর সংস্পর্শে এসেছে। তারা কিছু কিছু হিন্দী বুঝতে পারে। পুরুষদের মধ্যে হিন্দী বোঝে না এমন কেউ নেই বললেই হয়।

নেগী সাহেবের বাড়ি গ্রাম থেকে একটু নিচের দিকে গ্রামদেবতা নারায়ণের (স্থানীয় নাম নরেনস্) মন্দিরের কাছে। বাড়ি না বলে বাংলো বলা উচিত। বাংলোর নিচের তলাটা সাধারণভাবে তৈরি দোতলার দুটো কামরার দরজা-জানালা সব কাঁচের। তিব্বতী ধরনের চা-চৌকি আর বসবার গদীও রয়েছে, আবার আধুনিক রীতির চেয়ার-টেবিল-খাট আলমারীরও অভাব নেই। এখানকার এক মহিলা কবি তো নেগী সাহেবের

গাংলো নিয়ে এক কবিতাই লিখে ফেলেছেন। এখানকার কবিতায় কিছুটা অভিনবত্ব আর চটুল রসের খোরাক থাকা চাই। এই গুণটি থাকলেই ষোড়শী তরুণী মহলে খুব আদর।

আমার আসার খবর পেয়েই নেগীজী দৌড়ে এলেন। ঠাকুরসিং আমার কথা তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন। তা'ছাড়া আমার নামে চিনীর ডাকঅপিসে যে চিঠির বোঝা জমা হচ্ছে, সে খবরও তিনি পেয়েছেন। আমরা বৈঠকখানায় বসলাম। মেয়েকে ডেকে চা জলখাবার আনতে বললেন নেগীজী। মেয়েটি বিবাহিতা, জামাই গ্র্যাজুয়েট। কথাবার্তা চলতে লাগল। কনৌরের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন নেগী সাহেব। সে'জন্য তাঁর মনে বেশ একটু গর্বও আছে। নিজের চেষ্টায় অনেক রকম মেওয়ার চাষ করেছেন তিনি। কয়েক ধরনের আঙ্গুরও লাগিয়েছেন বাগানে। 'রোগী'র দ্রাক্ষারস তো সারা বুশহরেই প্রসিদ্ধ আর নেহাত যদি শনিদৃষ্টি না পড়ে তো আশা করি এ প্রসিদ্ধি একদিন সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করবে।

সরাহনের ভীমাকালী দ্বাপর যুগ থেকে যে সুরার আদর করে আসছেন সেই 'শিবু' আর 'মহাশ্বেতা' একদিন, পাণিনির আমলের কপিশার (কাবুল) 'কাপিশেয়ী'র মতোই সসাগরা ধরিত্রী জয় করবে, এই শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম। ফ্রান্সের ছোট্ট জায়গা 'শাম্পেন', সে যদি পৃথিবীর দ্রাক্ষা-মদিরার রাণী হতে পারে তো 'রোগী'ই বা কেন হবে না। নাঃ, আর বেশী বলা ঠিক হবে না। আপনারা ভাবতে পারেন 'রোগী'র লোকেরা আমায় তাদের প্রচার-কার্যের জন্যে মোটামুটি কিছু খাইয়েছে। তা কথাটা খুব মিথ্যে নয়। 'রোগী'র নেগী সন্তোখ দাস যে রকম যত্ন-আত্তি করলেন তাতে বিগলিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক, আর বিগলিত হয়েও অবিচলিত থাকাটা অকৃতজ্ঞতা। তাই একটু প্রভাবিত হয়ে পড়েছি সেটা স্বীকার করা ভালো।

শতদ্রু গর্ভ থেকে 'রোগী'র উচ্চতা তিন হাজার ফিটের কম নয়। আর এই সারাটা এলাকা জুড়ে মেওয়ার বাগান। এখানাকার ফলের কথা নিয়ে লেকচার দেবার প্রয়াজন দেখি না। যা প্রয়োজন, তা হলো সস্তায় রেলস্টেশন পর্যন্ত চালানের ব্যবস্থা—রেলস্টেশন অর্থাৎ সিমলা। আজকের যা অবস্থা, তাতে মণ পিছু কুড়ি টাকা ভাড়া দিয়েও খচ্চর পাওয়া যায় না। তাতে ফলের বাজার-দর যা পড়বে—কেউ আর ছোঁবে না। এই ব্যবস্থাটা প্রথমেই হওয়া দরকার। তারপরে দ্বিতীয় কর্তব্য হলো বিভিন্ন মেওয়া, ফল এবং জমি নিয়ে গবেষণা। এখানকার আঙ্গুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলি বড় জাতের, কালো আর সাদা দু'রকমেরই ফল হয়। ভারী রসালো আর মিষ্টি, খেতেও ভালো। তা'ছাড়া সরবৎ, সিরাপ, সির্কা আর মদ বানানোর পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু শাঁস একেবারেই নেই, কাজেই শুকিয়ে কিসমিস-মনাক্কা করা যায় না। কাবুল-কান্দাহারের এমন কোনো ফল নেই, যা 'রোগী'তে কি পার্শ্ববর্তী এলাকায় জন্মায় না। এখানে যদি মোটর চলাচলের বন্দোবস্ত থাকত তবে আজ কনৌরের লক্ষ-লক্ষ মণ ফল-মেওয়ায় ভারতের হাট-বাজার ভরে যেত। তিন হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই সমগ্র পার্বত্য এলাকা তা'হলে ফলের বাগিচায় সবুজ হয়ে থাকত।

নেগী সন্তোখ দাস—জানি না 'নেগী' শব্দটি কোন ভাষার অন্তর্গত। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চর দেখছি, কোনো বড় মানুষের পদবী কিংবা বড় পরিবারের লোকদের

সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে, 'বাবুসাহেব' বা 'রাওসাহেব' এই অর্থে 'নেগী' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর শব্দার্থ সম্ভবত সেখানেও অজ্ঞাত। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, কিন্তু 'নেগী' শব্দ খুব একটা সম্মানসূচক বলে গণ্য নয়।

বিবাহাদি উৎসবের সময়ে যে সব লোক 'পার্বনী' গোছের কিছু পেয়ে থাকে, তাদেরই 'নেগী' বা 'পত্তনী' বলা হয়। সে নাপিত, কুমোর, ছুতোর থেকে নিয়ে মা-বোন-ভগ্নীপতি-শম্বন্ধী পর্যন্ত সবাই, অর্থাৎ যারাই কিছু দান-দক্ষিণ্য আশা করে তারা সবাই 'নেগী' পর্যায়ভুক্ত। 'নেগ্' শব্দটা সেখানে দান বা দক্ষিণা অর্থে প্রচলিত। কিন্তু এই 'নেগ্' শব্দ যে কোন ধাতু বা কি প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে সেটা কাশীর মহাবৈয়াকরণও নির্ণয় করতে পারবেন না।

তা সে যাইহোক নেগী সন্তোখ দাস বলছিলেন, গত বছর অক্টোবরের প্রবল বর্ষণ আর এ বছর ফেব্রুয়ারীর অবিরাম তুষারপাত, এই দু'য়ে মিলে শুধু পথঘাটেরই নয়, ক্ষেত-খামারেরও অজস্র ক্ষতি ঘটিয়েছে। শীতের আগে বোনা ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, আলুর বীজ পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এখন আর বর্ষার নামগন্ধ নেই, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেড়ে গেছে। কথাটা সত্যি। এখান থেকে চিনী পর্যন্ত, এমন কি চিনী ছাড়িয়েও সারা এলাকার যত আখরোট গাছ, সব কটার পাতায় পোকা লেগেছে। ছোট ছোট নতুন চিকন পাতা—পোকায় খেয়ে সব সাফ করে দিয়েছে। মনে হয়েছিল, বুঝি আসছে বছর পর্যন্ত গাছগুলো এমনি নগ্ন, শীর্ণ চেহারা নিয়েই বেঁচে থাকবে। তা মাসখানেক যেতে না যেতেই দেখি ফের পাতা গজিয়েছে, আর জুন মাসের শেষাশেষি আবার আগের মতো হরিৎশ্যামল কিশলয়গুচ্ছে গাছগুলো ছেয়ে গেলো।

নেগীজীকে একটু জ্ঞান দেবার ইচ্ছে হলো তাই চরকায় পশম কাটার কথা তুললাম। নেগীজী ভেতর থেকে, লুধিয়ানায় তৈরি পায়ে চালাবার লোহার চরকা এনে দেখালেন। বললেন, আজকাল দাম বড় বেড়ে গেছে, আর বড় একটা পাওয়াও যায় না। আমার জ্ঞান-দানের বাসনা তখনো প্রবল। কথা পাড়লাম ফল নিয়ে। ফল শুকোনোর তথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় কি-না সেই কথা। নেগী সাহেব জবাব দিলেন, এখানে আমরা রোদের সাহায্যে কিছু কিছু ফল শুকোই বটে, তা সে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নয়। তবে কোটগড়ের সত্যানন্দ চৌকের ওখানে একটা আমেরিকান যন্ত্র দেখেছিলাম, যাতে একাধারে আপেল কাটা, খোসা ছাড়ানো, আবার আঁচ দিয়ে শুকানো—সব কাজই হয়। যন্ত্রটা আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পাওয়া যায়নি। নেগীজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক জিনিস শিখলাম। তাঁকে যে কোনো নতুন কথা শোনাতে পেরেছি, তা মনে হলো না।

মধ্যাহ্ন পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা গেলো। তারপর নেগীজী এলেন। বিকেলের আগেই রওনা হয়ে পড়লাম। নেগীজী চললেন আমায় পৌঁছে দিতে। চলতে চলতে গ্রাম-দেবতা নারায়ণের মন্দির দেখিয়ে নেগীজী বললেন, আগে এখানে আমাদের পিতৃ-পিতামহদের প্রতিষ্ঠিত পান্থশালা ছিল। তা সে স্থানটি দেবতাদেরও পছন্দ হয়ে গেলো। তাঁরা চেয়ে বসলেন। কি আর করা যাবে? সেটি দেবতাদের দান করে তখন আবার

গ্রামের বাইরে পান্থশালা বানানো হলো। আমার মনে হয়, স্থানটি দেবতারা চেয়ে নিয়ে খুব ভুল করেননি। এখনকার পান্থশালাটি রাস্তার ওপরে এবং সমীপেই জল থাকায় পথচারীদের সুবিধেই হয়েছে। এখানাকার দেবতারা মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এ নিয়ে পরে আবার বলব। কথায় কথায় আমরা গাঁয়ের বাইরে এসে পড়লাম। নেগীজী এখান থেকে ফিরে যাবেন। আমি এগিয়ে চললাম। সামনের এক জায়গায় রাস্তা ভেঙেছে। ফাটল দিয়ে হু-হু করে নালার জল বয়ে চলেছে। তা হোক, তেমন কোনো চড়াই-উৎরাই নেই এই বাঁচোয়া।

মাইল দুই আড়াই যাবার পর সামনেই 'চিনী' প্রায় দেখা গেলো। বেশ বড় গ্রাম, প্রায় আশী ঘর লোকের বসতি। তিব্বতী নাম 'গ্যালস্ চিনী' (রাজধানী)। ১৮৯৫ সালে চিনীতে তহশীল স্থাপিত হয়। সারা কনৌরে এমন আর একটি প্রশস্ত জায়গা বিরল। শতদ্রু তটভূমি থেকে দু'হাজার ফিট উপরিতল পর্যন্ত আর চার-পাঁচ মাইল দীর্ঘ ঢালু ভূমিখণ্ড আগাগোড়াই শস্যক্ষেত্র। উপরাঞ্চলে চুলী বা ছোট খোবানী আর বেমী ফলের চাষই বেশী। নিচের দিকে অবশ্য অন্য ফলও হয়। এ গ্রামের মাহাত্ম্য এমন, যে-কোনো যুগেই এর প্রাধান্য বজায় থাকবে।

চিনীতে ৯২৩৮ ফিটের মাথায় ১৩৯ তম মাইল স্টোনটি লাগানো রয়েছে। এর সমান উঁচু আরও অনেক জায়গা আছে কিন্তু চিনী তাদের মধ্যে শীতলতম। শীতকালে এর শৈত্য সর্বাপেক্ষা বেশী। তার দ্বিবিধ কারণ আছে, প্রথমত অত্যন্ত খোলা জায়গা, কাজেই হাওয়ার প্রকোপ প্রচণ্ড। দ্বিতীয়ত, একেবারে সামনেই কৈলাসের হিমাচ্ছাদিত শিখরশ্রেণীর অবস্থান। তার তুষার-ছোঁয়া হিমবাতাস অনবরত স্পর্শ করে যাচ্ছে একে। কৈলাস, নামটিই ভক্ত-মানসে বিপুল আবেগের জোয়ার আনে। সহজেই ভ্রম হয় এই বুঝি স্বর্গের কৈলাসগিরি, ভগবানের বাসভূমি। আসলে এটি একটি শৈলশিখর। লোকে কৈলাস নাম দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই তথাকথিত কৈলাসকে প্রদক্ষিণও করা হয়। রাস্তা ভয়াবহ রকমের দুর্গম। সমতলবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষে তীর্থের পরিক্রমা এক রকম অসম্ভব। শিখরটিও অনন্য সাধারণ নয়। বরং এই শ্রেণীর পর্বত শৃঙ্গের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট। খালি চোখে দেখলে দূর থেকে তুষারাবৃত শৃঙ্গটিকে শিবলিঙ্গ বলে ভ্রম হয়। ব্যস, ভক্তিরসে আপ্লুত হতে চিত্তের আর বাধা কোথায়? আমার ভক্তি নেই। দূরবীণ কসে দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গ-টিঙ্গ মোটেই নয়, কতকগুলো অসম্বদ্ধভাবে গ্রথিত পাথর আড়াআড়িভাবে সার-বেঁধে সাজানো। আমার মতো কেউ যদি দূরবীণ দিয়ে দেখে, তবে কৈলাসলোকের মোহ তার ঘুচে যাবে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই শিবলিঙ্গ না-কি দিনে অনেকবার রঙ বদলায়। তা দেবী বিন্ধ্যবাসিনী যদি দিনে তিনবার রূপ বদলাতে পারেন, তো তাঁর পতিদেবতা রঙ বদলাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

পাঁচটায় চিনীর ডাক-অপিসে হাজির হলাম। অপিসটি মিডিল স্কুলের নিকটেই। স্কুলেই এক মাস্টারমশায়—বাবু নারায়ণ সিং তাঁর নাম, তিনিই আবার ডাকঘরের কেরানী। চিঠিপত্র খবরের কাগজ ইত্যাদি প্রচুর জমেছিল। সে সব নিয়ে আবার আধ মাইলটাক চড়াই-উৎরাই ভেঙে কলপার ডাকবাংলোয় পৌছলাম। সঙ্গে ছিল প্রধান বন-পালের অনুমতিপত্র অতএব বিশ্রামের ঢালাও ব্যবস্থা। বাইশ বছর আগেও এখানে

কাটিয়ে গেছি, তখন কোনো অনুমতির দরকার পড়েনি। তিনখানি বড়-বড় কামরা, দুটি স্নান প্রকোষ্ঠ, প্রাসাদোপম বাংলো। দৌলতরাম আগেই এসে গিয়েছিল। জিনিসপত্র নামিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। আগামীকাল সে চলে যাবে। তাকে ৪৪ টাকা পারিশ্রমিক দিলাম, খচ্চরের খোরাকি বাবদ আলাদা টাকা দিলাম, আর কুণ্ঠাহীন ধন্যবাদ জানালাম মালপত্র সামলে রাখার জন্যে।

২০শে মে। আহারাদির ব্যবস্থা চৌকিদারের ওপর ছেড়ে দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চিঠিপত্র, খবরের কাগজ পড়ে কাটালাম। পত্রাদির বাণ্ডিলের মধ্যে একটা প্রুফও পেলাম, পাটনা প্রয়াগ সিমলা ঘুরতে ঘুরতে এসেছে শেষপর্যন্ত। আমি বেচারা প্রেসের বিড়ম্বনার কথা ভাবছি। হয়ত পথ চেয়ে আছে কবে প্রুফ ফিরে আসবে। প্রুফটি দেখে দিলাম। চিঠি এসেছে ঢের। সব ক'টার জবাব দিতে হলে একটা কেরানী পুষতে হয়, আর ডাকমাশুল বাবদ বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হয়। আগে প্রত্যেক চিঠি জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করতাম। এখন আর সে শক্তি নেই। তাই পত্রের উত্তর দান, সংখ্যায় স্বল্প এবং আকারে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যারা চিঠি লেখে, জবাব না পেয়ে তারা রাগ করে। কিন্তু তাদের রাগ করার ভয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তো আর করা যায় না।

চারিদিকে ঘন সবুজ দেবদারুর মেলা, মাঝখানে ডাকবাংলোটি, তার ফল-ফুলের বাগান। ফলের মধ্যে আপেল ন্যাসপাতি। কিছু কিছু তরকারীও রয়েছে। সব মিলিয়ে অপরূহ হয়ে আছে জায়গাটি।

২১শে মে। তরুণ রেঞ্জার দেবদত্ত শর্মাজী দেখা করতে এলেন। উনি আমার চেয়ে মাত্র মাসখানেক আগে এসেছেন এখানে। ভদ্রলোক যে কি পরিমাণ মিশুকে স্বভাবের সেটা একদিনেই বোঝা যায়। চিনীতে যতদিন ছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমায় অনাবিল আনন্দ দিয়েছে। তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রী কৃষ্ণাদেবী আর তাঁর বোনেরা কতবার আমায় ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেছেন।

চিনীতে আমার থাকার মেয়াদ মাস তিনেক। আমি ইচ্ছা করলে এই সময়টা ডাকবাংলোতেই পাকাপাকি আস্তানা গাড়তে পারতাম। কিন্তু এই দীর্ঘ তিনমাস ধরে বাংলোর কামরা দখল করে বসে থেকে আগন্তুক যাত্রীদের অসুবিধে ঘটাতে মন চাইল না। তাই দ্বিতীয় দিনেই সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। হাসপাতালের দিকে একখানা বাংলো পেলাম। ঠিক করলাম ওখানেই থাকব।

চিনী-বাসের দ্বিতীয় দিবসেই এক সাধুর আবির্ভাব হলো। লামা সোনম্ গ্যনেচ্ছা অর্থাৎ সন্ত পুণ্যসাগর। আনন্দজী আর অন্যান্য বন্ধুরা আগ্রহ সহকারে আমার সঙ্গে একজন সঙ্গী দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি। একজন কেরানী, আর একজন পাচকের প্রয়োজন আমার হবে তা জানতাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সেরকম লোক স্থানীয় লোকদের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সমতলের বাসিন্দা কেউ সঙ্গে এলে তার হরেক রকম কষ্ট হতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে এদিকে রীতিমতো। যেদিন চিনীতে প্রথম এলাম, সেদিন থেকে পর পর ক'দিন শুকনো ভেড়ার মাংস এত অপর্যাপ্ত আসতে লাগল যে শেষপর্যন্ত আর মাংসাহারে রুচি রইল না।

পুণ্যসাগরের (পূর্বনাম কিস্মৎরায়) আগমনকে আবির্ভাব বলেছি, তার কারণ আছে। আমি দৈবে বিশ্বাসী নই, নইলে বলতাম সেই পরম কারুণিকই এই ব্যক্তিটিকে

আমার সমীপে প্রেরণ করেছেন। যেদিন থেকে এর সঙ্গ পেলাম সমস্ত যাত্রাপথে আমার নাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়নি। শুধু তাই নয়, টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় মালপত্র নিয়ে ক্ষণিকের জন্যেও বিব্রত হতে হয়নি।

২২শে মে। চিনী-বাসের তৃতীয় দিন, স্থানীয় তহশীলদার মঙ্গলরামজী দেখা করতে এলেন। ইনি এখন সফরে রয়েছেন। এদিকে তহশীলদারদের দায়িত্ব অনেক। শুধু বাকি-বকেয়া খাজনা আদায় করাই কাজ নয়, দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমার বিচারও তাঁকেই করতে হয়। দূর-দূরান্তের কিন্নরপল্লীতে ঘুরে ঘুরে ন্যায় বিতরণ করে বেড়ানো—গ্রামবাসীদের প্রতি প্রগাঢ় অনুকম্পারই পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হলো এর চেয়ে ঢের ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে, গ্রাম-পঞ্চায়েতের ওপর এই সব মামলা-মোকদ্দমার ভার দেওয়া। আমার আসার খবর সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তহশীলদার সায়েব। তাঁর সফরসূচীর এক দিনের কর্মতালিকা ছাঁটাই করে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার প্রতি তাঁর সদয় ব্যবহারের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।...রাজ্য, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, রাজা-রাজড়াদের নানা ঠাটবাটের মতো এর বিভাগীয় আড়ম্বর আর অফিসারী জাঁকজমকেরও কমতি নেই। তহশীলদার, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিশ, এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, সবজজ, জেলা জজ—আমলাশাহীর চূড়ান্ত। সেটা রামপুরের মতো একটা আশী-নব্বই হাজার জনসংখ্যা সম্বলিত নগণ্য রাজ্যই বা কি আর বিশ লাখ লোকের বাসস্থান একটা বড় জেলাই বা কি, সব এক ব্যবস্থা—কোনো তফাৎ নেই। দেশীয় রাজন্যবর্গের আমলে রাজা বাহদুরকে খুশী করতে পারলেই চাকরী পাওয়া যেত, পাওয়া যেত উচ্চপদ—যোগ্যতা থাক বা না থাক। হিমাচল প্রদেশ গঠিত হবার পর, রাজার প্রাসাদপুষ্ট এইসব রাজপুরুষদের যাঁরা পারিতোষিক হিসাবে রাজপদ পেয়ে এসেছেন তাঁদের বহাল রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই, কাজেই একটা বড় রকম ছাঁটাই অনিবার্য। দেখলাম তহশীলদার সাহেবও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আশ্বাস দিয়ে বললাম, যোগ্যলোকের প্রয়োজন সব শাসনতন্ত্রেই আছে কাজেই আমার বিশ্বাস আপনার মতো ব্যক্তির উৎকণ্ঠার বিশেষ কারণ নেই। এ ছাড়া সান্ত্বনা কি আছে! তাঁকে আরও একটা কথা বললাম। নবগঠিত হিমাচল সরকার চেষ্টা করছেন, ফলের চাষকে উত্তোরত্তর সমৃদ্ধতর করে তোলার। এখানকার খনিজ সম্পদের ওপরও সরকারের নজর পড়েছে। এই দুটি উদ্যমকে কার্যকরী করে তুললে জনসাধারণের জীবনমান উন্নত হবেই। এই ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে যদি কেউ তৎপর হয়ে ওঠে তো সরকার নিশ্চয়ই তার কাজের মর্যাদা দেবে। আমার যুক্তিটা দেখলাম মঙ্গলরামের বেশ মনে ধরেছে। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কৃষি ও খনিজসম্পদ বিষয়ে প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করলেন। ফলোৎপাদন আর ধাতু-প্রস্তর সংগ্রহ এবং এতদ্বিষয়ে আঞ্চলিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন।

যাবার সময়ে মঙ্গলরামজী থানায় নির্দেশ দিয়ে গেলেন যেন লোক পাঠিয়ে আমার মালপত্র নতুন বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া হয়। থানাদার সাহেব দফাদারকে হুকুম দিয়ে দিলেন। সে হুকুম নানা গতিপথ দিয়ে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে মানবাহক পর্যন্ত পৌঁছাল

কি-না কে জানে। আমি দেখলাম, লোক আর আসে না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল। চিন্তা কিছুটা হলো বটে তবে এখন আর আগের মতো অসহায় নই, পুণ্যসাগর সঙ্গেই আছেন। স্কুলের সমীপবর্তী লামা মন্দিরে চলে গিয়ে তিনি তিন-চার জন বৌদ্ধ ভিক্ষুণীকে ডেকে নিয়ে এলেন। বেচারীরা বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে মন্দিরের জমা হয়েছিল। সারাদিন ব্রত-উপবাস করে, আর পণ্ডিতকে গৃহপ্রবেশে সাহায্য করে তাদের পুণ্যের সঞ্চয় কিছু বৃদ্ধি পেল বোধহয়। সবাই হাত মিলিয়ে আমার সমস্ত জিনিসপত্র সন্ধ্যে হবার আগেই নতুন বাংলোয় পৌঁছে দিলো। আগামী তিনমাস এই বাংলোই আমার আবাসস্থল।

চলতি শতকের গোড়ার দিকে ব্রোস্কী নামক এ জার্মান পাদরী এই বাংলোটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। শুধু অর্থ দিয়েই নয়, শ্রম দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। ধর্মের সঙ্কীর্ণতা আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আমাদের চোখকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে, এই সব প্রচারকদের অকুণ্ঠ সেবা, পরোপকার আর ত্যাগের মহিমাকে আমরা দেখতেই পাই না। আজ থেকে আশী বছর আগে, এই জায়গা থেকে আটচল্লিশ মাইর ওপরে 'স্পু'তে এমনি জনাকয়েক ত্যাগী পাদরী আশ্রম বানিয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছয় জন দধীচির সন্ধান পাওয়া যেত, যাঁরা নিজেদের অস্থি দিয়ে স্পু-র উষরভূমি উর্বর করে গেছেন। পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে পাদ্রী ব্রোস্কী সাহেব এই জায়গাটি স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে কিনে নেন। ঠিক রাস্তার ধারেই এটির অবস্থান। সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে বাগান, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, ছেলেদের স্কুল ইত্যাদি তৈরি করিয়ে দেন এবং এ দেশে শিল্পের প্রসার বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তের বছর পরে এ অঞ্চলের রূপই পাল্টে যায়। একটা প্রায় পরিত্যক্ত উষর জায়গাকে ফলে ফুলে মনোরম নিকুঞ্জে সাজিয়ে রেখে ব্রোস্কী যেদিন চোখ বুঁজলেন, তাঁর বিবিও কাঁদতে কাঁদতে এখান ছেড়ে চলে গেলেন। বাংলো সামলাবার ভার রইল পিটার সাহেবের ওপর। অবশেষে ১৯২২ সালে মাত্র ন'হাজার টাকা মূল্য নিয়ে মুক্তিসেনার হাতে বাগানবাড়ি বেচে দিয়ে মোরাবিয়ন মিশনকে উঠে যেতে হলো। এ রাজ্যের শাসনকর্তা হলেন এমার্সন, পরে যিনি পাঞ্জাবের গভর্নর হয়েছিলেন। মুক্তি-সেনার পক্ষে অবস্থা ছিল অনুকূল। ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাদের সহায়তা করতে সদাই উৎসুক থাকতেন। রাজানুকূল্যে, রাজকোষের অর্থে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হলো। জনৈক মুক্তি-সৈনিক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডঃ স্যামুয়েল তদীয় পত্নীসহ বৎসরকালের জন্যে নিযুক্ত হলেন হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। মুক্তিসেনার উদ্যোগে পশম কাটা ও বোনার শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপিত হলো। দুর্ভাগ্যবশত বছর কয়েকের মধ্যেই সেটি উঠে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্রমেই এমন তীব্র হয়ে পড়ল যে আগের মতো করুণা প্রদর্শনের পাল্লা আর বজায় রাখা সম্ভব হলো না। দানের স্রোতে ভাঁটা পড়ল। ইউরোপীয় অর্থ-সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব আশ্রম চলছিল, তাদেরও উৎস রুদ্ধ হয়ে গেলো। এদিকে রাজা পদম সিং গদীতে বসলেন, ইংরেজ প্রশাসক বিদায় নিলেন। উপায়ান্তর না থাকায় ১৯১৯ সালে বাড়ি-বাগান সব মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বেচে দিয়ে মুক্তিসেনা রাজ্য ছেড়ে চলে গেলো। সম্পত্তি আর একবার হাতফিরি হলো। নতুন মালিক হলেন রাজা স্বয়ং।

লোকে কিন্তু ব্রোস্কী আর পিটারকে ভুলতে পারেনি। তাঁদের কথা লোকের স্মৃতির পাত্রে মধুর মতো সঞ্চয় হয়েছিল। ওয়াকার, মার্টিমোর প্রমুখ মুক্তি-সৈনিকগণও কর্মতৎপরতা কম দেখাননি। তবে তাঁদের পিছনে ছিল ইংরেজদের খুঁটির জোর। তৎকালীন ইংরেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এমার্সনের কাছ থেকে মিশন নানা রকম সাহায্য পেত। সে সাহায্য যেই বন্ধ হলো, অমনি মিশন পাততাড়ি গুটাল। বলতে কি, ব্রোস্কী আর তাঁর মোরাবিয়ন মিশন এখানে যেমন কাজ করেছে তার তুলনা নেই। অথচ তারা ইংরেজ ছিল না—ছিল জার্মান। তাদের পিছনে ছিল না কোনো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। ব্রোস্কী নিজে ধনাঢ্য লোক ছিলেন। আর ইংরেজ সরকার তাঁকে সাহায্য না করলেও ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সক্রিয় সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন। যতদিন এই বাংলো থাকবে ব্রোস্কীর নামও অক্ষয় হয়ে থাকবে। প্রথম যেদিন তিনি সস্ত্রীক এখানে আসেন তখন কোথায় জমি কোথায় কি? তাঁবু ফেলে বাস করেছেন। রাজা সমশের সিংহের সহায়তায় সেই সময় এই অনুর্বর উঁচু-নীচু জমি কেনা হয়। আজ আমি যে রমণীয় বাংলোর আরামপ্রদ প্রকোষ্ঠে বসে এই কাহিনী লিখছি, আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে ১৯০০ সালে তার ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা হয়। কত স্বপ্ন, কত শ্রম, কত যত্ন এর পেছনে। মিস্ত্রী কৃপারামকে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়েছেন ব্রোস্কী। ১৯১৯ সালের পর থেকে এ বাংলোর বরাতে কেবল অবহেলাই জুটে এসেছে। জানালার শার্সি ভেঙে গেছে, বদলানো হয়নি। জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে, জানলা-দরজা আসবাবপত্রের বার্নিশ চটে গেছে, কাকস্য পরিবেদনা। আলমারী ভর্তি জিনিসপত্তর ছিল। আলমারীর গহ্বর খালি করে মালপত্তর শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। সে আমলের একটা বিলেতি উনোন ছিল—তাতে পাঁউরুটি, বিস্কুট ও অন্যান্য পাঁচ রকমের খাবার তৈরি করা হতো সেটা মাত্র চল্লিশ টাকায় নিলেমে উঠে জনৈক কিষাণে ঘর আলো করছে ইদানীং। একটা বেশ বড়সড় পিয়ানোও না-কি ছিল। তার হাল সাকিনের কোনো ঠিকানা জানা নেই কারও। যীশু ভগবানের মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে যে সব পাথরের ভিত গাঁথা হয়েছিল তার ওপর তৈরি হলো কাছারি বাড়ি। এই কি স্থান-মাহাত্ম্য! তবে মন্দও কিছু হয়নি, ব্রোস্কীর নিজে হাতে গড়া এই বাংলোর পান্থশালায় আমার মতো আরো কত যাত্রী এসে আশ্রয় নিয়েছে, রাত-বিরেতে, রোদে-হিমে, ঝড়-জলে আস্তানা নিয়েছে কত অসহায় পথচারী।

এই সেই বাংলো। ব্রোস্কী দম্পতির স্নিগ্ধ বাৎসল্যের সঞ্জীবনী রসে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ড থেকে আপেল ন্যাসপাতির চারা আনিয়ে তাঁরা পুঁতেছিলেন বাংলোর বাগানে কিন্তু তার একটা ফলও নিজেরা চাখেননি। ফলভোগ করেছিল পরবর্তী লোকেরা। অনেক দিনের অনেক মধুর স্মৃতি-বিজড়িত এই ভবনটি ছেড়ে যাবার সময়ে তাই ফ্রাউ ব্রোস্কী পতির শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

স্থানীয় হাসপাতালের বাড়িটি বেশ, কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ কোনো ডাক্তার নেই। সমগ্র চিনীর মধ্যে এতবড় একটা মহকুমা, এখানে একটা ডাক্তার নেই! এ বড় লজ্জার কথা। বুড়ো কম্পাউণ্ডার ঠাকুর সিং কোনোমতে ঠেকা দিয়ে চলেছেন। বৃদ্ধ ঠাকুরসিং ব্রোস্কীকে দেখেছিলেন। তাঁর স্কুলে পড়েছিলেন ইনি। মুক্তি-সেনানীর মার্টিমোরের প্রবল

হিতৈষণার ঠেলায় একবার ইনি তো প্রায় খৃশ্চান হয়ে পড়েছিলেন আরেকটু হলে। এখান থেকে মার্টিমোরের উদ্যোগে তিনি তো সিমলা পর্যন্ত গেলেন। সেখানে মুক্তি সৈনিক বীর ও বীরাঙ্গনাবৃন্দ খুব ঝাণ্ডা-নিশান উঁচিয়ে তাঁর অভ্যর্থনাও করল। কিন্তু পথেই তিনি মন্ত্রণাদাতা গুরু পেয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁকে সিমলায় বলা হলো এবার তুমি খৃশ্চান হও তখন তিনি কায়দা করে বললেন, আমার তো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি বাপের এক ছেলে। খৃষ্ট ভজলেই আমায় ঘরবাড়ি থেকে এবং গাঁয়ের সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন আমি কোথায় যাব, কি করব। কাজেই, আমায় হাজার দশেক টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক; বিলেতে পড়তে পাঠানো হোক আর এই আমার সামনে যে সব বিধুমুখীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের একজন আমায় পতিত্বে বরণ করুক—তবেই আমি রাজি। মুক্তি-সেনারা বিনামূল্যে মুক্তি বিতরণ করতেন সর্বদাই কিন্তু এসব শর্ত তাঁদের খুব সস্তা মনে হলো না। তাই ঠাকুরসিংয়েরও আর খৃশ্চান হওয়া হলো না। পাদরী মার্টিমোর ঠাকুরসিংয়ের ওপর নিদারুণ চটে গেলেন। সেই থেকে আর তাঁরা কাউকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাননি। এই সব মুক্তি-ফৌজের দল ছিল অন্তঃসার শূন্য ঢাক-পিটিয়ে প্রচারকের দল। কিন্তু ব্রোস্কী আর তাঁর মোরাবিয়ান সোসাইটি-র ছিল সত্যিকার সেবার ব্রত। যদিও অন্য প্রচারকদের মতো তাঁরা স্থানীয় সমাজের সেবার অবকাশ পাননি বললেই হয়, তবু যতটুকু তাঁরা করতে পেরেছেন তার ঋণও অনেক —তার মহিমাও কম নয়। তাঁদের কথা ভুলে গেলে অকৃতজ্ঞতা হবে। হল্যাণ্ড থেকে আনা ব্রোস্কীর বাগানের আপেল ন্যাসপাতির চারা থেকেই আজ সারা চিনীর লোক 'কলম' করছে। পিটার যে সুগন্ধি গোলাপ তাঁর বাগানে লাগিয়েছিলেন, শত অবহেলা পেয়েও আজও সে অকৃপণভাবে গন্ধ বিতরণ করে চলেছে আপামর নির্বিশেষে। চোখ তুলে যে দেখবে সে-ই মোহিত না হয়ে পারবে না। পিটারের নাম করতে আমার আর এক পিটারের কথা মনে পড়ল—জানি না ইনিই তিনি কি-না। ১৯৩৩ সালে লেহতে (লাদাখ) এক পিটার সাহেবের দর্শন পেয়েছিলাম। পিটারের হাতের তৈরী কেক্ খাবার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

বাগানে দু-দুটো মালী রাখা হয়েছে। অথচ এমন হতচ্ছাড়া অবস্থা বাগানের যে, চোখ তুলে তাকানো যায় না। বলিহারি! আর মালীরাও তেমনি বুদ্ধিমান। আস্‌পারাগাসের চারাগুলোকে উপড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে যত্ন করে চিচিঙ্গে লাগিয়েছে। পিটারের পুঁতে-যাওয়া শতদল গোলাপের গাছে একটু জল পড়ে না, আগাছার বনে একটু খুরপী ছোঁয়ানো হয় না। গুজবেরীর ঝাড়ের কয়েকটা মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাও ঘাসে ছেয়ে আছে। হয়ত আর বছর দু'য়েকের মধ্যে একটা ঝাড়ও থাকবে না। হল্যাণ্ডের সেই রাজকুলোদ্ভব ঐতিহাসিক আপেল ন্যাসপাতির দল প্রকৃতির দয়ায় খাড়া হয়ে আছে। বর্ষাধিক কাল তাদের গায়ে হাত পড়েনি। খাদ্য-জল, সেবা-যত্ন কিছুই জোটে না তাদের। ব্রোস্কী আঙ্গুরের লতাও প্রচুর লাগিয়েছিলেন। সব শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘাস আর গোলাপের ফাঁক দিয়ে শুধু একটি মাত্র দ্রাক্ষালতার বিশীর্ণ লজ্জা-করুণ মূর্তি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। আরও কত যে মূল্যবান চারা নষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই যে বাংলো আর তৎসংলগ্ন বাগানটা পড়ে রয়েছে

এর যেন কোনো ওয়ারিশান নেই। কত জায়গা এমনি খালি পড়ে রয়েছে— একটা ঘাস পর্যন্ত কেউ পোঁতে না। তা এতদিনে বুঝি শিকে ছিঁড়েছে। কে এক শেঠজী গ্যানাটোজেন্ বানাবার উদ্দেশে কি একটা ঔষধি পরীক্ষা করতে এখানকার বাগানে তার মূল লাগিয়েছেন। কিন্তু সেও ভালো জমেনি। না জমবারই কথা, যা যত্ন-আত্তি! জিজ্ঞেস করলে মালী জবাব দেয়, কি করব, মহাজনে ঠিকে নিয়েছে যে—হাত দেওয়া বারণ। এখন এই বাংলো-বাগান খাস সরকারী সম্পত্তি। আশা করি, নতুন হিমাচল সরকার এর অধঃপতনকে রোধ করতে পারবেন।

আগামী তিনমাস পর্যন্ত এই বাংলোই আমার নিবাসস্থান।

পানাহার পর্ব

চিনীর নিজস্ব ইতিহাস নিশ্চয় কিছু আছে। হয়ত তার ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বহমান। কিন্তু তার তথ্যাদি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। হয়ত মাটির তলায় অন্বেষণ-কার্য চালিয়ে গেলে অনেক সুরক্ষিত প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা বর্তমান চিনীর পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা করব।

চিনী গ্রামের একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে বটে কিন্তু বেশীরভাগ চাষীই আপন আপন ক্ষেতে বসবাসের জন্যে ঘর বানিয়ে নিয়েছে। ফলে গ্রামের আয়তন গেছে ছড়িয়ে। এই চাষ-আবাদের জমির মধ্যে বেশ একটা ভূখণ্ড বন এলাকার বাইরে। সেই অঞ্চলে চুলী, বেমী অথবা আখরোট ছাড়া আর কোনো বড় গাছ জন্মায় না। গত অক্টোবরের প্রবল বর্ষণ আর ফেব্রুয়ারীর অপ্রত্যাশিত হিমঝঞ্ঝায় জমির সমূহ লোকসান হলেও একটা বিশেষ সুবিধা হয়েছে। নালাগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেচকার্যের অসুবিধে নেই। আপাতত জলের অভাবে কেউ কষ্ট পাবে না। মারামারি ঝগড়ার আশঙ্কা তাই কম। জল যখন সঞ্চিত থাকে না, তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। পাঁচ-ছয় হাজার ফুট জুড়ে ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত চাষের ক্ষেত। তাতে সেচের ব্যবস্থ করবে গাঁয়ের মেয়েরা। পুরুষেরা শুধু ক্ষেতে হালচাষ করবে, মই-লাঙল দেবে আর বাকি সব কাজ মেয়েদের। রাত-ভর মশাল জ্বেলে ভূতের মতো ঘুরে বেড়ায় ঐ সব কৃষিলক্ষ্মীর দল। আমরা সমতল-বাসীরা উপলব্ধি করতে পারি না—মহিলারা চাষের কাজের পক্ষে কত উপযোগী। শুধু বুশহর রাজ্যে কেন, সারা পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ করণিক ধর্মানন্দের তিন স্ত্রী। তাঁর গার্হস্থ্য জীবন হলো—সারাদিন অলস অবসর-যাপন, অফুরন্ত মদ্যপান এবং নিশ্চিন্ত আয়াসে পানভোজন ও নিদ্রা ঘরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম গৃহলক্ষ্মীদের হাতে। হ্যাঁ, এখানে পাণ্ডব বিবাহ-প্রথা প্রচলিত। সব ক'জন ভায়েরই সম্মিলিত রূপে এক বা একাধিক পত্নী থাকতে পারে। অর্থাৎ যদি ধর্মানন্দের অন্য ভাই থাকত তবে যৌথ মালিকানার হিসেব অনুযায়ী এই তিন পত্নীর ওপর তাদের স্বত্ব জন্মাত।

ক্ষেতের মধ্যে এক একটি বাসগৃহ ছাড়াও ফসল দেখাশুনা করার জন্যে কয়েক মাইলের ব্যবধানে আরও ছোট ছোট কয়েকখানি ঘর চাষীরা বানিয়ে নেয়। এই

ঘরগুলোকে স্থানীয় ভাষায় বলে ডোগ্‌রী। ক্ষেতে কাজ করবার সময়ে মেয়েরা কখনও সখনও এই ডোগ্‌রীতে রাত কাটায়। উপরাঞ্চলের (কাঙা) ডোগরীগুলোকে নিয়ে অনেক প্রেম-গাথা রচিত হয়েছে। কিন্নর সমাজে অবিবাহিতা ষোড়শীদের পক্ষে রাধাকৃষ্ণের বাস্তব অভিনয় অথবা বৃন্দাবনসুলভ অভিসার লীলা অপরাধ হিসাবে গণ্য নয়।

চিনী গ্রামটার গায়ে একটা পুরানো দুর্গের চিহ্ন আছে। আশপাশের জমির থেকে খানিকটা উঁচু একটা টিলার ওপরই ছিল দুর্গটা। সে সময়ের বেশীরভাগ বাড়ি বা প্রাচীর কাঠ দিয়েই তৈরি হতো। কিভাবে আগুন লেগে গেলো একদিন। খাণ্ডবদাহনের সেই পালা কেউ কেউ হয়ত প্রত্যক্ষ করেছে, কি জানি। গড় খুঁড়লে আজও পোড়া কাঠকয়লা, জ্বলে কালো হয়ে যাওয়া পাথর পাওয়া যায়। এমন কিছু বড় দুর্গ নয়, তবে তারই একাংশে ১৯১১ সালে একটা স্কুল তৈরি হয়েছিল। সেখানে আজকাল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। জায়গাটা সমতল করে নেওয়া হয়েছিল।

চিনীতে একটা হাইস্কুল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চশিক্ষার্থী ছেলেদের এখন রামপুর পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাদের সে অর্থ-সামর্থ্য নেই, তাদের অগত্যা নিরাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়। এখন যে স্কুলটি আছে, সেটাও অনেক দিক দিয়ে অসুবিধাজনক। শীতের দিনে ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশী হয়, প্রচণ্ড বাতাসে আক্রমণ চলতে থাকে। তাই অনেকদিন থেকেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে স্কুলটাকে কল্‌পার ওদিকে জঙ্গলের ওপাশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তারপর শতদ্রু দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। চিনীতে মামুলি হাইস্কুল হলেই চলবে না; সঙ্গে সঙ্গে বটানি, এগ্রিকালচার এবং হর্টিকালচার শেখানোর ব্যবস্থা হওয়া চাই। তৎসহ স্কুল-সংলগ্ন এক্সপেরিমেন্টাল গার্ডেন (প্রয়োগ-উদ্যান) থাকাও দরকার।

কনৌরের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চিনীতেও কনৈত বা খশ্, বড়ঈ আর কোলী এই তিন জাতির বাস। কনৈতরা স্থানীয় সমাজে উচ্চকুলীন পর্যায়ে পড়ে, ওরা আজকাল নিজেদের রাজপুত বলে। বড়ঈরা ছুতোর, কামার, সেক্‌রা, নাপিত ইত্যাদি সব কাজই করে। তা'ছাড়া পাথর খোদাইয়ের কাজও করে থাকে। এদের অর্ধ-অস্পৃশ্য বলাই ভালো। কারণ এদের জল চলে না বটে, কিন্তু হুঁকো চলে। কোলীদের মতো দৈন্যদশা এদের নয়। তিন জাতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়। কিন্তু কনৈত চশমার সঙ্গে বড়ঈদের চশমার দূরত্ব যতখানি, কোলী-চশমা [চশমা—পাহাড়ের ফাটলে সঞ্চিত জলের কূপজাতীয় জলাধার—অনুবাদক] তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবধানে তৈরি। চশমাগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, কোনটা কোন জাতের।

কোলীদের জাতিগত পেশা হলো চামার, মেথর, মুচি অথবা ধোপার কাজ। স্বভাবতই, সবচেয়ে কঠিন পরিশ্রমের আর সবচেয়ে নোংরা কাজগুলো এদের, তাই সব থেকে বেশী দৈন্য-দুর্দশাও এদেরই ভোগ করতে হয়। কনৈতদের চশমাগুলো বেশ ভালোভাবে পাথর দিয়ে বাঁধানো কুণ্ডের মতো। আর অনতিদূরে বড়ঈদের কুয়োগুলো কতকটা ঐ ধরনের। কারণ তারা নিজেরাই পাথর কেটে ঠিকঠাক করে নিয়েছে। এই দুই উত্তম ও মধ্যম বর্ণের জলাশয় থেকে অনেক দূরে মোষের খাটালের মতো ফাটা-

ভাঙা কাঠের টুকরো দিয়ে ঘেরা কতকগুলো গর্ত আছে, ঐগুলোই হলো কোলী-চশমা। তা কি আর করা যাবে, ভারতবর্ষের মহিমাই যে এখানে। ভগবান স্বয়ং উঁচু-নীচু জাতের সৃষ্টি করেছেন। তাদের ঘরবাড়ি আলাদা করে দিয়েছেন, বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (!)—বলবার কিছু নেই। পাহাড় অঞ্চলে আবার এই ভগবদ্ প্রভাব কিছু বেশীই মনে হলো। কোলীদের নোংরামি তো বিশ্ববিদিত। সে কথা আর বলে কি লাভ? একদিন যাচ্ছিলাম কোলীদের ঘর দেখব বলে। সঙ্গী লোকটি বাধা দিলো। বললে, 'যাবেন না। জায়গাটা বড্ড নোংরা।' তার আবার সমাজ-চেতনাও কিছু ছিল। বললে, 'এরা জাত নোংরা। আমরা চাইছি এদের অস্পৃশ্যতা দূর করতে কিন্তু নোংরামির স্বভাবটা ছাড়ে তবে তো'। তা বটে—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং এদের নোংরা করেই সৃষ্টি করেছেন যে!

সমাজহিতৈষীরা এই কথাটা একেবারেই ভুলে যান, ওদের কাউকে এক ছটাক চাষের জমি দেওয়া হয়নি। কঠোর শারীরিক শ্রম ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো সঙ্গতি নেই ওদের। যদি বা কোনো গতিকে কেউ দু-চার পয়সা কামিয়েও ফেলে তাতেই বা কি? উঁচু জাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভালো ঘর বানাবার, ভালো জামা-কাপড় পরবার ওদের সামাজিক অধিকার কোথায়? বড় জাতের পাশে যাবার অধিকার নেই ওদের, লেখাপড়া শিখতে নেই ওদের, ভুল করে যদি কোনো উঁচু জাতের লোকের বাড়ির দেওয়াল ছুঁয়ে ফেলে তো কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওরা অপমানিত, লাঞ্ছিত। ওরা নোংরা থাকে, ওদের অপরাধ। কিন্তু সমাজের বিধি-ব্যবস্থাই যে ওদের ঘাড়ে জোর করে এই শতাব্দী-সঞ্চিত নোংরামির বোঝা চাপিয়েছে—তার বিচারটা কবে হবে? আমাদের পাপের ফলে শাস্তিভোগ করবে ওরা, আবার সে'জন্য আমরাই ওদের ঘৃণা করব—বাঃ অপরূপ বিবেক-বুদ্ধি! সে যাইহোক, চিনীর কোলীরা যে ঘর-দোর নোংরা করে রাখে, তাদের গলিতে পা দেওয়া যায় না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। অচ্ছুৎ জাতমাত্রই নোংরা থাকবে— এ আর নতুন কথা কি? তবে ছোঁয়াছুঁয়ির অহেতুক বিড়ম্বনাটা তো অন্তত আমরা মনে করলেই কমাতে পারি। এই যে কল্পা থেকে আমার মাল বয়ে আনল দু'জন কোলী ভাংগী—কই, কারও কোনো আপত্তি হলো না তো? আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে হিমাচল প্রদেশের সামাজিক রূপ বদলাবে। কনৌরের পাহাড়িসমাজ নতুন দিনের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। অচ্ছুৎ কোলীদের হাত ধরে টেনে তুলবে এই নারকীয় জীবন-যন্ত্রণার পাঁক থেকে।

কিন্নরভূমি দেবতার দেশ, রূপকার্থে নয় সরল অর্থেই। দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হয়, তারা আলোকবাসী। আমার তো উল্টো কথাটাই মনে হয়। আমার মতে দেবতারা ঘোর অন্ধকারের জীব। মনুষ্য হৃদয়ের ঘোর অজ্ঞান অন্ধকার কুঠুরীতেই তাদের বাসা। গতকাল (২৩শে মে) দু'মাইল নিচে কোঠীর ইষ্টদেবীর মেলা ছিল। দেবদেবীদের উদ্দেশে পুজো, ভোজ, মেলা, পার্বণ ইত্যাদি প্রায় প্রতি মাসেই লেগে আছে। কোনো কোনো মেলার সময় আবার দেবতার ভাঁড়ার থেকে মদের সদাব্রত খোলা হয়। তা সত্যিই তো, মদ ছাড়া দেবতাদের পুজো হয় কি করে? স্থানীয় এক রাজা একবার মদ্যপান নিবারণ আইন চালাতে গিয়েছিল। দেবতারা তাকে আচ্ছা মতো শায়েস্তা করে

দিয়েছিলেন। তার বংশলোপ হয়ে যাবার জোগাড়। হবে না? কি আস্পর্ধা!

মেলার দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ একজনের মাথায় দারুণ চোট লাগল। দেখলাম তাকে চিকিৎসকবিহীন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। বিকল্প 'ডাক্তার' ঠাকুরসিংয়ের মুখেই শুনলাম, প্রায় প্রত্যেক মেলাতেই এমনি দু-চারজন জখম হয়। দেবতাদের কৃপায় এখানে মদ্যপান আর পশুবলি বোধহয় কোনোদিনই বন্ধ হবে না। এখানের লোকদের মাঝে মাঝে দৈববাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়। দেবতা মালীর মুখ দিয়েই কথা বলেন। অন্য দেবতারা তবু তো যেমন-তেমন আছেন। কোঠীর যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি আবার ভারী রগচটা। এর কারণটা কি? অনুসন্ধান করতে করতে জানতে পারলাম, দেবী চিরকুমারী। তাঁর পুরুষ বন্ধু আছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর স্বামী নন। ওঃ এই ব্যাপার। তাই তো বলি, দেবী এত কোপনস্বভাবা কেন? এতদিন ধরে কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করলে; রাগের মাত্রা তো বাড়বেই। আমি তখন কোঠীর দেবী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। কয়েকজন ভদ্রব্যক্তি প্রস্তাবটি সমর্থনও করলেন।

আমার এক বন্ধু, পণ্ডিত ব্রজমোহন ব্যাস, ডায়েবেটিস্‌কে জব্দ করে রেখেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত পন্থা হলো, দৈনিক ৪/৫ মাইর পদব্রজে ভ্রমণ। গত চব্বিশ মে থেকে আমি তাঁর পন্থানুসরণ করে চলেছি এবং নিয়মিতভাবে। রোজ প্রভাতী চা-পানের পর তিব্বত-ভারত সড়কে হাঁটা অভ্যাস করি। একশো চল্লিশ মাইল অতিক্রম করেছি এইভাবে। জানি না এতদিনে আমার শত্রু জব্দ হয়েছে কি-না। এই জব্দ হওয়ার অর্থ হলো, প্যান্‌ক্রিয়াস গ্রন্থির আবার নিয়মিত রসক্ষরণ। যার ফল, জঠরাগ্নির তীব্রতা নিশ্চিত রূপে বৃদ্ধি। সঙ্গে বেনডিক্ সোলুশান ছিল, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, প্রস্রাবে চিনি নেই। কিন্তু সলুশানটা খারাপ হয়ে যেতেও তো পারে। কেন না অগ্নিমান্দ্য তো কমেনি। বরং বুদ্ধ-বর্ণিত 'ভোজনে মাত্রাজ্ঞান' নীতি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেই ভালো ফল পেয়েছি। বাস্তবিক, এ রোগটা আমায় ভারী পেয়ে বসেছে। এমন একদিন ছিল, যখন পাথর খেয়ে হজম করে ফেলেছি। আর আজ? খাওয়ার একটু কমবেশী হয়েছে কি অমনি টক ঢেঁকুর ওঠা শুরু হয়ে যাবে। অবশ্য পাহড়ী জল এমনিতেই কিঞ্চিৎ ভারী হয়। সঙ্কট-মোচনের বাবাজী ঠিক কথাই বলেছেন যে, 'লাগৈ অতি পাহাড়কর পানী'—তা এ কথা চিত্রকূট পাহাড়ের পক্ষে অথবা তরাই অঞ্চলের পক্ষে লাগসই হলেও, হিমালয়ের পক্ষে প্রযোজ্য কি-না তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই আমিই তো আগে কত বছরের পর বছর পাহাড়ের জল খেয়ে কাটিয়েছি। হজমের গোলযোগও কখনও ঘটেনি, আর ক্ষিধের অভাবও বোধ করিনি কোনোদিন। তবে বুঝি এটা বয়সের দোষ। পঞ্চান্ন বছর তো খুব কম নয়। 'তেহিনো দিবসা গতাঃ' বলে বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? জল তো যেমন তেমন। খাদ্যের কথা আর কি বলব! কিন্নর দেশে, বিশেষ করে বাঙতু থেকে যত ওপরে যাওয়া যায়, কেবল জলেরই কষ্ট নয়, চাল-গমেরও যথেষ্ট অভাব। বোধহয় শতাব্দী ব্যাপী প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আজও ছাগলের পিঠে তিব্বতী পশম বোঝাই করে সমতলে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখান থেকে সেই ছাগলের পিঠেই খাদ্যশস্য, আনাজ-পত্তর ওপরে নিয়ে আসা হয়। আজকাল আরও একটা জিনিস রপ্তানী হচ্ছে। বিলিতী মটর

এখানকার গ্রাম থেকে সিমলায় চালান যায়। সেখানে না-কি খুব ভালো দাম পাওয়া যায়। নিশ্চয় পাওয়া যায়, নইলে মণ পিছু কুড়ি টাকা মাল-চালানীর খরচ দিয়ে কি আর পোষায়? আহা, কিছু কাঁচা মটর যদি পাওয়া যেত এ সময়টায়।

এমনিতে মে-জুন মাসে এখানে শাকসব্জীর আকাল পড়ে যায় কিন্তু ব্রোস্কীর বাগানে অনেক বেথুয়াশাক হয়ে রয়েছে। বেশ লাল ডাঁটাওয়ালা তাজা তাজা বেথুয়া। এখানকার লোক ও শাক ছোঁয় না। বলে খেলে না-কি কি একটা খারাপ ব্যারাম হয়। আমি পুণ্যসাগরকে বললাম, 'বাপু রামনাম স্মরণ করে রেঁধে ফেলো দিকি; এবং রোজ রাঁধ। ও সব রোগ-ফোগ কিস্‌সু হবে না।' তা ভরসা দিয়ে দিয়ে আর ক'দিন চালানো যায়। দিন কয়েক রাঁধলে আবার যে কে সেই। কিন্তু কনৌরের লোকে যদি বেথুয়াকে বয়কটই করবে তো এত যত্ন করে বাগানে লাগায় কেন তা বুঝতে পারলাম না। এ তো দেখছি বেশ দস্তুর মতো চাষ করা হয়েছে। বড় বড় পাতাওয়ালা লাল-লাল নটেশাক দেখে জিভে জল এসে যায়। এরা কিন্তু এর পাতা খায় না। খায় দানা। দানার জন্যেই এই শাক বোনা হয়। এর দানা ছাড়িয়ে ভাতের মতো সেদ্ধ করে কিংবা পিষে রুটি বানিয়ে খায়। আমাদের ওদিকে এর নাম মরসা, এরা নাম রেখেছে তুলসী—আহা মরে যাই! এরই রকম নাম বিভ্রাট এখানে খুব ঘটেছে। এরা যাকে কোদ্রা বলে সেগুলো আমাদের কোদো ধান নয় মোটেই, সেগুলো আসলে মাণ্ডুয়া বা রাগী। আমাদের পরিচিত ফসলের মধ্যে গম, যব, ছোলা, মটর ইত্যাদি ছাড়াও এক রকম খোসাবিহীন যব এখানে হয়। তবে চিনীতে নয়, কিছু দূরে 'শু'তে। ঐ ধরনের যবের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী উচ্চতা অধিকতর শৈত্যের দরকার। বহু ধরনের শস্য এদেশে জন্মায়। বেড়াতে বেড়াতে নজরে পড়ল একটা ক্ষেতে ভুট্টা হয়েছে বেশ। পাক ধরেছে মনে হলো। কিন্তু পুণ্যসাগর বলল, এ ভুট্টা পুরোপুরি পাকে না। ব্রোস্কীর সযত্ন-লালিত দ্রাক্ষালতার মধ্যে যে বিশীর্ণকায়া একাকিনী বল্লরীটি কোনোমতে প্রাণটুকু জীইয়ে রেখেছিল, তহশীলদার সায়েব তার সম্বন্ধেও প্রায় পুণ্যসাগরের মতোই নৈরাশ্যজনক অভিমত জানালেন—ও লতা ঠিক বন্ধ্যা না হলেও মৃতবৎসা! অর্থাৎ লতায় ফল ধরে না এমন নয় কিন্তু ফলে পাক ধরে না। কাজেই সেবনযোগ্য নয়। হায়রে, ব্রোস্কী-নন্দিতা বিড়ম্বিতা পল্লবিনী দ্রাক্ষাসুন্দরী! আমি এখানে থাকতে থাকতে (আমার মেয়াদ ফুরাবে ৮ই আগস্ট) ক'টা গাছপাকা আঙ্গুর কি আমায় পাইয়ে দিতে পার না। নইলে যে তোমারও মুখ থাকে না, আমারও না।

...মে জুনের এই সময়টা শাকসব্জীর আকাল দেখা দেয়। খাবার মধ্যে জোটে এক শুক্‌নো মাংস। ভগবদ্ কৃপায় শুক্‌নো মাংসের অভাব কখনও হয় না আমাদের ভাঁড়ারে। আসবার দিনেই কোত্থেকে এক বোঝা ভেড়ার শুক্‌নো মাংস জুটে গেলো। মাংস ভালো জিনিস। এ রকম সকলের ভাগ্যে জোটেও না। কিন্তু হজম করবার ক্ষমতাও তো চাই। আমি একটা আধবুড়ো লোক। পুণ্যসাগরও চল্লিশ ছুঁয়েছে। তার ধাতুদৌর্বল্যের দোষ তো আছেই, মস্তিকেও কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কাজেই এক বছরের পুরনো মাংস খেয়ে হজম করে ফেলবার তাকৎ আমাদের কই? বাধ্য হয়ে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। পুণ্যসাগরকে রোজই তাগাদা দিই খানিক খানিক

মাংস ছেলেপুলেদের ভাগ করে দেবার জন্যে। তাতেও তার বিশেষ আপত্তি। সে একটু গিন্নি-গোছের লোক। সব জিনিস জীইয়ে রাখার পক্ষপাতী। তার নীতি হলো—কঃ কালে ফলদায়কঃ। অর্থাৎ যাকে রাখ, সেই রাখে। বেশী কিছু বলতেও পারি না, তার দপ্তরে আমার হস্তক্ষেপ করাটা শোভন দেখায় না। অথচ পাশেই আলমারী, তার জঠর থেকে নিহত পশুর পবিত্র শুষ্ক মাংসের আঘ্রাণ নিয়মিতভাবে আমার ঘ্রাণযন্ত্রকে ঘায়েল করে যাচ্ছে। নান্য পন্থা। মাংস অতীব উপাদেয় জিনিস, লোকের পরম রুচিকর আহার্য। কিন্তু রোজ রোজ খেলে স্বর্গের অমৃতেও অরুচি ধরে। আমাদেরও সেই অবস্থা। দিন কয়েক পরে নেগী সন্তোখ দাস আধমণটাক আলু পাঠিয়ে দিলেন; আমরাও মুখ বদলে বাঁচলাম। কিন্তু বিধি বাম, সপ্তাহ দু'য়েক এখান থেকে কিছুটা দূর বেড়াতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি, আলুর কল বেরিয়েছে আধবিঘৎ করে। কি আর করা যাবে? কতকগুলো আলু বেছে নিয়ে বীজ বুনে ফেললাম। ভালো করে কেয়ারী তৈরি করলাম। এ কথা শুনে রোড ইন্সপেক্টর লছমীনন্দন বললেন, 'এ তো আপনারা ভুল করেছেন। অঙ্কুর বেরিয়েছে তো হয়েছে কি? তাতে কি আলুর স্বাদ কমে যায়? দিব্যি 'খাওয়া যেত।' ...সে যাইহোক, অল্প কিছুদিন পরেই আমাদের আর শাকসজীর অভাব রইল না। কখনো নেগী সন্তোখ দাসের কাছ থেকে, কখনো বা উলার নম্বরদারের ঘর থেকে, প্রচুর কাঁচা তরকারির উপঢৌকন আসতে লাগল। রেঞ্জার শর্মা সায়েবের অনুগ্রহে বিভিন্ন ভিটামিন যুক্ত সবুজ সবুজ শাক-মটরশুটির ডালায় আমাদের সব্জী দুর্ভিক্ষ ঘুচে গেলো।

একদিন পথ চলতে চলতে দেখি, পথের পাশেই একগুচ্ছ পাতাসমেত কুমড়ো লতা পড়ে রয়েছে। সাত ঘাটের জল খেয়ে আমার মন খানিক হিসেবী হয়েছে ইদানীং। লাউ-কুমড়োর ডগা দিয়ে বাংলাদেশের বৌ-ঠাক্‌রুনরা যথেষ্ট মুখরোচক তরকারী করেন জানি। ভাবলাম তুলে নিই! আমাদের শাক-টাক কম আছে বলে নয়, মিছিমিছি খাবার জিনিসটা নষ্ট হবে, কারও ভোগে লাগবে না, এই ভেবেই মনে করলাম শাকটা কাজে লাগাই। বারণ করলে পুণ্যসাগর। পঞ্চতন্ত্রের প্রবীণ কপোতরাজের মতো বললে, 'এই নির্জন অরণ্যপ্রান্তে কুমড়োর প্রাদুর্ভাব সম্ভব হলো কেমন করে?' অর্থাৎ কিছু রহস্য আছে। সত্যিই তো তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়কের ধারে লাউ-কুমড়ো ফলাবার জায়গা তো নয়। পাতাগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই রহস্য বোঝা গেলো। লতার পাশে ছাই দিয়ে, রুটির লেচি তৈরি করে রাখা হয়েছে। কেউ বোধহয় ভূত ছাড়ানোর জন্যে তুক্ করে গেছে। ভূত এই মারণাস্ত্রে ঘায়েল হবে কি-না তা সে-ই বলতে পারে। আমার তো মনে হলো, আজকালকার ভূত এত মুখখু হবে না যে ঘরের বৌ ছেড়ে, এতখানি রাস্তা ছুটে আসবে ছাই-পাঁশের গড়া রুটি খেতে। ধন্যি বুদ্ধি! পুণ্যসাগরও দেখলাম আমায় সমর্থন করলে। খামকা সের দুই কুমড়োশাক এই করে নষ্ট—এই ভেবে আমার খালি আফসোস হচ্ছিল। বুদ্ধির ঢেঁকি লামা পুঙ্গব, রুটির ওপর কিছুটা দেবাদারুর কাঁচা পাতাও তো ছড়িয়ে দিতে পারত। ওর ভূত যদি ওর মতোই মূর্খ হয় যে, ময়দার রুটি আর ছাইয়ের রুটি তফাৎ বুঝবে না তা'হলে সে কুমড়োর পাতা আর দেবদারু পাতার তফাৎ ও বুঝত না।

আগেই বলেছি, মে-জুন মাসে চিনীর বাজারে শাকসব্জী মেলে না। অথচ এর কারণ আবিষ্কার করতে পারিনি। বরফ-পড়া এপ্রিল মাস থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। লাল নটে আর মুলো ধরনের অনেক শাকপাতা আছে যা কুড়ি বাইশ দিনেই বেশ তৈরি হয়ে যায়। এতদিনে সে সব শাকসব্জীতে চিনীর বাজার ছেয়ে যাবার কথা। এত অভাব থাকবার তো কথা নয়। হয়ত লোকে যত্ন নেয় না। রেঞ্জার সায়েবও বললেন, শাকপাতা এরা খেতে জানে না। আমি বলি, খেতে খুবই জানে, ফলাতে জানে না। তা সে কথাটা শুধু এদের সম্বন্ধেই খাটে, তা তো নয়। ভারতবর্ষের সব গ্রামেই ঐ দশা। বাংলার কথাও মনে পড়ছে। পুকুরের পাড় থেকে কলমী শাক তুলে খায়। যত্ন চেষ্টা করে ফসল ফলাতে হচ্ছে না— তৈরি ফসল পাচ্ছে।

ভগবানের অশেষ দয়া, এদেশে চুলীর (এক প্রকার ফল) প্রাচুর্য দান করেছেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ক্ষেতে, ঘরের আনাচে-কানাচে আর কিছু না থাক একটা-দুটো চুলী গাছ থাকবেই। শীতের সম্বল ফুরোলে, লোকে যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে, চুলীই তখন তাদের ত্রাণকর্তা। জুনের শেষে, পাকাপাকা সোনালী ফলে-ভরা চুলীর গাছগুলো যখন পাহাড়ের গা বেয়ে, লোকের নাগালের মধ্যেই, মাথা তুলে বাতাসে দোলা খায়, কিন্নর দম্পতির মুখে তখন হাসি ফোটে। চুলী খোবানীর মতোই এক রকমের ফল, সাইজে কিছু ছোট। পাকলে বেশ মিষ্টি লাগে, কখনো কখনো একটু কষাও হয়। ভেতরে বাদামের মতো তেল-তরা বীচি, খেতে যাচ্ছেতাই রকমের তেঁতো। তবে তেল নিংড়ে নিলে, আর তেঁতো থাকে না। চুলীর তেলকে স্বচ্ছন্দে বাদাম তেল বলে চালানো যায়। চুলীকে বাদাম ছাড়া আর কি-ই বা বলবেন? বাদামেরই ছোট বোন তো। কষাটে পেয়ারার মতো লোকে চুলী চিবিয়ে খায়। সকলের কথা জানি না, আমাদের এই এলাকায় তো কাঁচা চুলী আর পুদিনা দিয়ে তৈরি চাটনী 'নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য। চুলী পাকলে গরীবদের ঘরে আনন্দের হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। আর কি ফলনটাই না হয়! গাড়ি-গাড়ি, ঝুড়ি-ঝুড়ি বোঝাই হয়ে চলেছে, লোকের কাঁধে-পিঠে। তার আর কমতি নেই। ফুরোতেই যেন চায় না।

সেদিন পথ চলতে চলতে মাইল দুই নিচে তেলগীদের ঘরে ছাতের ওপর নজর পড়তে চমকে উঠলাম। তেলগীদের দেবতা কি খুশি হয়ে ওদের ছাতে সোনা ঢেলে দিলেন! ভাবলাম, পুন্যসাগরকে জিজ্ঞেস করি। হঠাৎ খেয়াল হলো সোনা তো নয়, ও যে পাকা চুলী। ছাতের ওপর মেলে দিয়েছে, রোদে শুকিয়ে সঞ্চয় করে রাখবে। দেখে-শুনে পুণ্যসাগর মুখ শুকনো করে বললে, 'আমাদের ওদিকে এমন সুবিধে নেই। দিন-রাত্তির বর্ষা হতে থাকলে আর শুকোবে কেমন করে? লোকের খেয়ে যা বাঁচে, এক জায়গায় জড় করা থাকে। পচে উঠলে, খোসা ছাড়িয়ে বীচি আলাদা করে নিয়ে পিষে তেল বার করে নেয়।' একটা পুষ্টিকর খাদ্য, অথচ তার উপযোগিতা নেই! এখানে কিন্তু ছেলে-বুড়ো সবাই চুলীর খুব ভক্ত। এই সময়টায় সব ঘরেই চুলীর প্রাচুর্য। আমিও দু-চার দিন চালিয়ে যাব মনস্থ করলাম। কিন্তু সে ঐ দু-চার দিনই। পরে আর ভালো লাগল না। তা সে আমার ভালোলাগা, মন্দ-লাগার কোনো ব্যাপার নয়, কথা হচ্ছিল কিন্নরদের নিয়ে এবং প্রয়োজনটা তাদেরই।

রোজ যা সংগ্রহ হয়, তার থেকে রোজকার খাবার মতো ফল রেখে বাকিটা ছাতের সমতল জায়গায় ঢেলে দেয়। রোদে শুকিয়ে হিমে ভিজে চুপ্‌সে গিয়ে যখন বেশ সংরক্ষণযোগ্য হয়ে ওঠে তখন বস্তায় পুরে রেখে দেয়। এ ওদের মস্ত সম্বল। টাটকা অবস্থায় চুলীর ফল শুধু-মুখেও খাওয়া যায়, আটা আর মিষ্টি মিশিয়ে লাপ্‌সী করেও খাওয়া যায়, তবে লাপ্‌সী করতে হলে তাজা ফলের চেয়ে শুকনো চুলীই প্রশস্ত। এরা সেইটাই বেশী খায়। চুলীর বীজ সচরাচর তেঁতো বা কষা হলেও মাঝে মাঝে মিষ্টিও পাওয়া যায় না, এমন নয়। চুলী কিন্নর দেশের আদি বাসিন্দা।

চুলীর পরেই আলুচা পাকে। আলুচা কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশিনী ম্লেচ্ছজাতির ফল। এমনিতে খেতে মিষ্টি, ফলেও নির্লজ্জের মতো। তবে তার বিশেষ উপকারিতা নেই। চুলীর গাছে মাঝে মাঝে ফাঁক দেখা যায়, কখনো কোনো গাছে হয়ত ফল ধরেনি এমনও হয়। আলুচার বেলায় তা কিন্তু হবার জো নেই। গাছে হেন ডাল দেখা যাবে না যাতে ফল ধরেনি। আলুচার বীচি, চুলীর চেয়ে আকারে ছোট আর শুকনো। তাতে তেল থাকে না। আর হয় চেরী ফল। বিস্তর ফলন হয়, প্রায় চুলীর মতোই। কিন্তু পাকবার সঙ্গে সঙ্গেই গালে দেওয়া চাই, থাকবার জিনিস নয়। শুকিয়ে রাখা চলে না। এ ছাড়া বাদাম, আঙুর, আলুবোখরা ইত্যাদি আরও নানা রকম ফল হয়। সব কিছুর দোষ-গুণ বিচার করার জায়গা কোথায়? আর নাম করা যায় আখরোটের। আখরোট (অক্ষোট) দিশী ফল। সেই সত্যযুগ থেকে এ দেশে ফলে আসছে। কিন্নর দেশে চুলীর পরেই আখরোটের স্থান। সম্ভবত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেই আখরোটের মূল জন্মভূমি। সোভিয়েত কিরগিজিস্তানে শত শত মাইল জায়গা জুড়ে আখরোটের বন হয়ে আছে। আখরোটের কাঠ, ভারতের সব থেকে ভালো কাঠ বলে খ্যাতি পেয়েছে। এ কাঠে ঘুণ ধরে না, উই লাগেনা। সূক্ষ্ম দারুশিল্পের কারুকার্য এ কাঠের ওপর চমৎকার হয়। সামান্য বার্নিশ লাগিয়ে নিলে এই কাঠের মতো এমন সুন্দর ফার্নিচার আর কিছুতে হয় না। কিন্তু বেচারা গরীব কিন্নরদের আর এ সব কোন কাজে লাগবে?

চুলী আর আখরোটের পরেই নাম করতে হয় বেমীর। জুলাইয়ের শেষাশেষি বেমী পাকে। খেয়ে দেখিনি, এরা বলে মিষ্টি লাগে। খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার কম। তীর্থ সেবনেই বেশী লাগে। 'তীর্থ' বলতে যারা কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গা, যমুনা বোঝে তারা পশুভাষার অভিধান দেখেছে। বীর কৌলদের শব্দকোষের সন্ধান তারা রাখে না। সুরাসুন্দরীর আর একটি নাম আছে, সেটি হলো 'তীর্থ'। সেবনের অর্থ হলো এখানে যাকে আমরা চোলাই করা বলি তাই। ভগবতীর সুসন্তান ব্রহ্মচারী চৈতন্যের মতে, বেমীর তৈরী এই 'তীর্থে'র কাছে দ্রাক্ষামদিরা লাগেই না। ওষুধের কাজেও লাগে। বেমী-মদিরার প্রশংসায় ব্রহ্মচারী এমনি পঞ্চমুখ হয়েছেন যে আমার ভয় হলো, আমার আজন্ম পালিত ব্রত বুঝি এ বার ভাঙতে হয়। তাঁর বেমীরসের মহিমাকীর্তন শুনে শুনে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম। শেষে একদিন বলেই বসলাম, 'আপনি যে এত বেমী-মদিরার গুণগান করছেন, আপনি কি মনে করেন, সবাই তাই শুনে আঙুর-রস ছেড়ে বেমী-রস সেবন করতে আরম্ভ করে দেবে? দ্রাক্ষারস আজ সসাগরা ধরিত্রীর অধিশ্বরী। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে দ্রাক্ষারসের জয় জয়কার। স্বয়ং পাণিনি তাঁর সূত্রে

কাপিয়েশী সুরাকে (কাবুলী আঙুরের মদ) স্থান দিয়ে তাকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে গেছেন। কে মশায় আপনার কথায় দ্রাক্ষাসুরাকে খাটো করে বেমীসুরাকে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ দেবে?' কিন্তু তর্ক-বিতর্ক করে মুখ বন্ধ করানো যায়, ভক্তি কমানো যায় না। তা'ছাড়া, তাঁর পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে। একে তো কিন্নর দেশে আঙুর-রস খুব সহজপ্রাপ্য নয়, বারো হাজার ফুট ওপর বসে যে সিদ্ধ পুরুষকে গত তিন বছর ধরে হিম নেই, বর্ষা নেই তপস্যা চালিয়ে যেতে হচ্ছে, বেমী-রস ছাড়া তাঁর গতি কি? তায় আমার মতো অনধিকারী ব্যক্তি, যে জীবনে কোনোদিন মদ জিভে ঠেকায়নি তার কথায় তিনি তাঁর বমী-পক্ষপাত ছাড়বেনই বা কেন? তিনি তো অর্বাচীন নন! অবশ্য বেমী প্রচারের সপক্ষেও কিছু বলবার আছে। এইভাবে রস নিংড়ে মদ তৈরি করা ছাড়া উদ্বৃত্ত বেমী থেকে অন্য কিছু হবারও উপায় নেই। মদ্যপান নিবারণী নীতি চালাতে গেলে অনেক ফল শুধু পচে নষ্ট হয়ে যাবে; কারও ভোগে লাগবে না। এই এক জায়গায় আপাতত গান্ধী-নীতি অচল। স্থানীয় কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার এক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, পান-বিরোধী নীতি কার্যকর করলে, তাতে স্থানীয় দেবগণ ভয়ানক অসুবিধায় পড়বেন। আমি তাঁদের উদ্দেশে জানাই যে, দেবগণের আপাতত আশঙ্কার কারণ নেই, তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যতদিন ভারতভূমিতে পন্থজীর মতো দেবভক্ত মন্ত্রী আছেন, ততদিন তাঁদের সার্বভৌমত্বে সরকারী হস্তক্ষেপ হবে না, কাশী আর অযোধ্যার মহাত্মা মোহন্তদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি...

আরম্ভ করেছিলাম, খাওয়া-দাওয়ার কথা দিয়ে। বলতে বলতে কোথায় চলে এসেছি। বিচিত্র কিছু নয়। বুদ্ধদেব বলেছেন, 'সব্বে সত্তা আহারঠিত্যেকা।' অর্থাৎ, আহারের ভিত্তিতেই সমগ্র প্রাণীকূলের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কাজেই, সকল কথার মূল কথা যে খাওয়া এ তো জানা ব্যাপার। আমার ইচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভদ্র নরনারীর ভিড়ে কিন্নরভূমি ভরে থাক। তাঁদের অকৃপণ ব্যয়ের বিনিময়ে কিন্নর দেশের সমৃদ্ধি হোক। কিন্তু, থাকা-খাওয়ার ভালো বন্দোবস্ত দরকার নইলে তো আর এ আশা সফল হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, আহারাদির ব্যাপারটা মোটেই গৌণ নয়। অন্নাদি সুলভ নয়, তবে যাদের পয়সা আছে, একটাকা পাঁচসিকের গমের আটা কিনে খাওয়ার সঙ্গতি আছে, তাদের কোনো অসুবিধে নেই।

আধুনিক শৈলবিহারীরা এখানে সহজে আসতে চাইবেন না। কেবল বিজ্ঞাপন দিয়ে, তাঁদের ভোলানো যাবে না। তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর আগে 'নাচার' পর্যন্ত মোটর ব্যবস্থা আর তারপর ঘোড়ায় যাবার মতো প্রশস্ত রাস্তা করতে হবে। তখন এখানকার ফলে নিচের বাজার ভরে থাকবে, নিচের শস্যে এখানে বান ডাকবে। যারা স্বভাব আলসে তারা ভাবছে, এ ভালোই হলো; এ বার ঘরে বসেই প্রচুর ফল খাব। সেটি হচ্ছে না, কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না। তাজা ফল খেতে চাইলে হিমালয়ে আসতেই হবে।

রামপুর থেকে আসার সময়ে বিশ সের আটা, বিশ সের চাল নিয়ে এসেছিলাম। দুটো খচ্চর যখন নিতেই হচ্ছে তখন বোঝা কমিয়ে লাভ নেই। আর এ মুলুকে পয়সা

দিয়ে কেনা-বেচা করার চাইতে আনাজপত্তর দিয়ে বিনিময় ব্যবস্থা চাল্যনোই প্রশস্ত। আমাদের কষ্ট কিছুই হয়নি। কারণ নেগী সন্তোখ দাসের মতো লোকেদের কৃপা যথেষ্ট পেয়েছি। আটা-তেল-ঘি কোনো জিনিসের অভাব হয়নি। চাল যা ছিল যথেষ্ট। নিজে তো ডায়েবেটিসের রুগী, খেতে পারি না। পুণ্যসাগরও চালের সম্বন্ধে উদাসীন। কিছু চাল এদিক-ওদিক ভেট-সওগাতে বেরিয়ে গেছে। তবুও মোট চালের একভাগ মাত্র খরচ হয়েছে, আর তিনভাগ না-কি এখনও রয়েছে শুনলাম। সের পাঁচেক চিনি আনা হয়েছিল, তারও ঐ একই অবস্থা। আমি আজ পুণ্যসাগরকে সাবধান করে দিলাম খাবার জিনিস এক ছটাকও রামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না।

রামপুরের সর্দার সাহেবের মুখে মধুর মাহাত্ম্য শুনে ইস্তক মধুসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়েছি। শ্রীবিদ্যাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অনুগ্রহে পাক্কা দেড় সের শুদ্ধ মধু জোগাড় হয়ে গেলো। সর্দার সায়েবই প্রথম আমায় বললেন যে, ডায়েবেটিসে মধু খাওয়া চলে। আমি সারা রাস্তাই মধু খেতে খেতে এসেছি। তারপর রাজাপুরের রাজবৈদ্য পণ্ডিত মোহনলাল পাণ্ডের পাঠানো ওষুধের অনুপান হিসেবও মধু চলছে। সঞ্চিত মধুর ওপর এই জাতীয় ডবল হামলা চলতে থাকলে ও আর ক'দিন টিকবে? আবার নতুন মধু সংগ্রহ করতে হবে। বন্ধুদের লাগালাম মধু সংগ্রহে। কিন্নর দেশে কর্পূরশ্বেত মধুর প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, গত শীতের প্রবল তুষারপাতে মধুমক্ষিকাকুল বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় মধুর ভাণ্ডারও শূন্য। তাদের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। তবে মৌমাছির বংশলোপ হয়নি একেবারে। মৌ-ভোজীদের নিরাশ হবার কিছু নেই। আমার পরে যাঁরা এখানে বেড়াতে আসবেন তাঁরা নিশ্চয় মধু পাবেন। আসলে শঙ্করবর্ণা (শ্বেত) মধুরই আকাল পড়েছে। রক্তাভ কি পাণ্ডুরবর্ণা মধু এখনও পাওয়া যায়।

ডাক্তার ঠাকুর সিং একবার তিন বছরের পুরনো শ্বেতমধু ছটাক খানেক জোগাড় করে দিয়েছিলেন। আর একবার তহশীলদার সায়েবও দিয়েছিলেন আধ পোয়াটাক কোত্থেকে জোগাড়-যন্তর করে। ব্যস ঐ পর্যন্তই। কিন্তু পাণ্ডুরবর্ণা মধু তো ক'দিনেই রাশি-রাশি তারা-ভারা আসতে লাগল। তারপরে আস্তে আস্তে ভাঁটা পড়ল, একদিকে বাসনের অভাব, অন্যদিকে মনের টানের অভাব। অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ বলে একটা শাস্ত্রোক্তি আছে না? মধু সঞ্চয় বন্ধ করে দিলাম। শেষে কি মধুর পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে রামপুর-সিমলা-প্রয়াগ হয়ে উজান পাড়ি জমাতে হবে? অবশ্য এ মধুতে ভেজাল নেই। এখানে চিনি বা গুড়, মধুর চেয়ে অনেক বেশী দামী। ও রকম মূল্যবান বস্তু মিশ্রণকর্মে কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু তবু আমি মধু বয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত নই। কে যেন বলছিল, এ মধু ঠিক বিশুদ্ধ নয়— কিছুটা মোম মিশে আছে এতে; মৌমাছিদের শরীরের অংশও খানিক। কিন্নর দেশে এখনও সেই সভ্যযুগীয় প্রথায় মক্ষিকাপালন চলে। ঘরে দেওয়ালের আধখানা কাঠ। তাতে ছোট-ছোট গর্ত করা। শীতকালে মৌমাছি সেই গর্তের ভিতর থাকে। ফুলের ঋতুতে বাইরেও বেশ বড় গোছের চাক বাঁধে। গেরস্ত বছরে দু'বার মধু সংগ্রহ করে। বেশ ঘন করে ধোঁয়া দিলে ছট্‌ফট করতে করতে মৌমাছিরা পালায়। তখন চাক ভেঙে মধু নিংড়ে বার করা হয়।

ফলে দু'চারটে মৌমাছিও চটকে যায় তার সঙ্গে। আর আমরাই বা কি এমন বৈষ্ণব-কোন জীবজন্তুই বা পার পাচ্ছে আমাদের কাছে? কাজেই ও সবই নির্বিবাদে চলে যায়।

দুধ, দই, মাখনের সমস্যা এখানে রীতিমতো। লোকের এদিকে নজর নেই। আর তাদের দরকারই বা কি? চুনীর তেল থাকতে ঘি-এর প্রয়োজন হয় না। ছাগল ভেড়ার দুধ যেখানে থাকে, আমি তার চোদ্দ হাতের সীমানায় থাকি না। ও আমার রোচে না। আর রুচলেই বা পাচ্ছি কোথায়। এখানে ও সব সস্তাও নয়। তবে দেখলাম এখানকার গরু, সব শ্যামাঙ্গী, সব কামধেনু কিন্তু দুধ দেন রত্তিভর, ঠোঁট ভেজে না। সত্তর আশী টাকা দিয়ে একটা গরু কিনে এনেছেন রেঞ্জার সায়েব। রোজ দেড় পেয়ালা দুধ দেয়। চাকরবাকরে বুঝিয়েছে, এখানকার গরুতে ঐ রকমই দুধ দেয়। কাজেই তিনি এক পেয়ালা দুধওয়ালী গাই কিনেছেন। আবার নতুন এক চাকর না-কি বলেছে এক সের দুধওয়ালী গাই এনে দেবে। তা আমার এখানকার সুরভি তনয়াদের দেখে ও কথা বিশ্বাস হয় না। তবে ইয়াক্ (চমরী) ষাঁড় আর গাই-গরুর মিশ্র প্রজনন হলে যে দুধ বেশী হবে এতে সন্দেহ নেই। সে সব গরু দাঁড়িয়ে একেবারে দু'সের আড়াই সের দুধ দেবে। হরিয়ানার মোষকে লজ্জা দিতে পারে এমন গরু। কিন্তু এখানে তারও অনেক অসুবিধে। চমরী গাই বেশী ঠাণ্ডা জায়গার জীব। উপযুক্ত ঠাণ্ডা না পেলে বাঁচতে পারে না। তিব্বত থেকে মাঝে মাঝে লোকে কিনে আনে— অন্য কোনো উপায় না থাকায় আনতেই হয়। এখানকার ভেড়ার সাইজের গরু-বলদ দিয়ে তো সব কাজ চলে না। চাষের কাজের জন্যে বলদ দরকার। ভালো জোয়ান বলদ পেতে হলে, চমরী ষাঁড় ছাড়া উপায় নেই। তাই অনেক ঝকমারী পোয়াতে হয়। এখানকার কম ঠাণ্ডায় চমরীর লম্বা লম্বা লোম ছেঁটে দিতে হয়, নইলে গরমেই মারা যাবে। তবু এত করেও গায়ে পোকা ধরে যায়, তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। পোকা না-কি গায়ের চামড়ার ভেতর দিকে হয়। এই কঠিন সমস্যা নিয়ে এরা নিজেরা খুব বিব্রত। আমায় এ সব বলতে আমি বললাম, এর জন্যে চিন্তা করে কিছু সুরাহা হবে না, হবে সরকার উদ্যোগী হলে।

আসলে বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক প্রগতির সুযোগ নিতে হবে। এখানে এরোড্রম তৈরি হোক। হরিয়ানা আর শাহীওয়ালের ষাঁড়ের বীজ আমরা এখানে বসে পাব। কৃত্রিম প্রজননের পন্থায় স্থানীয় গরুই ডবল সাইজের বাচ্চা দেবে। অগ্নিমূল্য দিয়ে চমরী গাই কিনে আনবার প্রয়োজন হবে না। এ দেশে দুধ, ঘি, মাখনের অভাবজনিত সমস্যা বিজ্ঞানই ঘুচিয়ে দিতে পারে। গরুর জাত উন্নত করতে পারলে এ সমস্যা আর থাকবে না। ভবিষ্যতে, কিন্নর দেশে ফল আর দ্রাক্ষারস, দুধ আর মধুর নদী বইবে একদিন—কিন্তু হিমাচল সরকারের কৃপা কটাক্ষ পেলে তবেই তো!

মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত একটা কম্বলে শীত যায় না। অর্থাৎ প্রয়াগের পৌষ-মাঘের মতো ঠাণ্ডা এখানে। ডাক্তারের কাছ থেকে পট্টু ধার করতে হয়েছে আমায়। পরে কোলীদের দিয়ে নতুন পট্টু তৈরি করিয়ে নিয়েছে। তবে জুনের শেষাশেষি ওপরের সফর শেষ করে যখন ফিরলাম, তখন ঠাণ্ডা কিছু কমেছে। রামপুর থেকে পশমী চাদর, পট্টু, গুদ্‌মা ইত্যাদি কেনবার ইচ্ছে ছিল না আমার। যাচ্ছি তো পশমেরই দেশে। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে পশম এখান থেকে চালান গেলেও কাপড় এখানে

বোনা হয় না। পশমী সুতো চাদর ইত্যাদি রামপুরেই তৈরি হয়। আর কনম, সুভন্ম আর স্পুতে তৈরি হয় ওদ্‌মা। পট্টু এখানে প্রধানত মেলার উদ্দেশ্যেই বোনা হয়। রামপুরে বছর তিনবার মেলা হয়। একবার বোশেখ-জষ্টিতে, একবার কার্তিকে আর একবার পৌষ মাসে। মেলাকে বলে লৌহ।

কার্তিকের মেলাটাই জোরালো হয়। মাসের পর মাস ধরে লোক কাপড় বুনতে থাকে কার্তিকের মেলার জন্যে। সময়টাও খুব অনুকূল তখন ক্ষেতের ফসল কাটা হয়ে গেছে, রাস্তায় বরফ পড়া বন্ধ, নিচের পাহাড়তলীতে ছিচকাঁদুনি বর্ষার পালা থেমেছে, কার্তিকের মেলা তাই খুব জমজমাট।

দলে দলে কিন্নর-কিন্নরী রামপুরর পথে পাড়ি জমায়। ওপর থেকে মাল নিয়ে যায় বেচতে, নিচের মাল খরিদ করেও আনে। শুনতে পেলাম, এক একটা মেলায় রামপুরে এইসব পশমী জিনিসপত্তর এত সস্তায় পাওয়া যায় যে, যেখান থেকে মাল চালান আসে, সেই স্পুতে কি কনমেও অত কম দামে পাওয়া যায় না।

এ সব বাজারের চলতি অর্থনীতি। হয়ত ওপরের বিক্রেতা অস্থির হয়ে পড়েছে, তাড়াতাড়ি মাল বেচে ফিরবে কিংবা খদ্দের কম হয়েছে, মাল নিয়ে তো আর ফেরা যায় না। এ সব ক্ষেত্রে দাম তো কমবেই।

আমি বিদ্যাধরকে লিখে দিলাম, রামপুরের মেলায় পাওয়া গেলে, আমার জন্যে খান দুই চাদর যেন কিনে পাঠায়। সাধারণ মোটা এক-সূতি ষাট টাকা, সূক্ষ্ম দো-সূতি নব্বই টাকা পর্যন্ত দাম। দর বেশী মনে হলো না; জুলাই মাসে ডাক-মারফৎ একখানা চাদর পেলাম—বিদ্যাধরজী পাঠিয়েছেন। তার ক'দিন পরেই আবার খান দুই পেলাম, এ বার পাঠিয়েছেন দৌলতরাম। বলবার কিছু নেই, দু'জনকেই আলাদা লিখেছিলাম। তাঁরা বন্ধুর কাজই করেছেন। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সে আমারই। কাজেই শেষকালে হয়ত চাদরের দোকান খুলেই বসতে হবে। আমার এই রকম ভুল আরও কয়েকবার হয়েছে। আমার ঠিকানা, ডাকঘর চিনী, ভায়া সিমলা—এইভাবেই লিখতাম। বন্ধুবান্ধবের ধারণা হলো, তা'হলে চিনী নিশ্চয় সিমলার আশপাশেই কোথাও। আর পায় কে? মাসে একাধিক টেলিগ্রাম আসতে লাগল, তার মধ্যে কয়েকটা আবার সভা-সম্মেলনের সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ। দোষ তাঁদের নয়, ও রকম ঠিকানা দেখলে কে আর ধারণা করতে পারবে যে, লোকটা তখন সিমলা থেকে একশো আটত্রিশ মাইল পাঁচ ফার্‌লংয়ের মাথায় বসে আছে?

মজা এখানেই শেষ নয়। মজঃফরপুরে বাবু দিগ্বিজয়নারায়ণ সিংকে লিচু পাঠাতে লিখেছিলাম। রামপুর পর্যন্ত রোজ, আর সেখান থেকে চিনীতে একদিন অন্তর ডাক তো আসেই। ভাবলাম, ক'দিনই বা লাগবে। বড় জোর সাত-আট দিনের মামলা। তার মধ্যে লিচু পচে যাবে না। কেমন করে জানব যে, আমার চিঠি পৌঁছুতে পৌঁছুতেই লিচু ফুরিয়ে যাবে! দিগ্বিজয়বাবু আমার পত্র পেয়ে ভাবলেন যে, এ নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে মালদার লেংড়াও হয়ত ততদিনে বাজার থেকে উবে যাবে। তাই আর সময় নষ্ট না করে, একবারে ঝুড়ি ভরে, আটটি নগদ মুদ্রা রেলভাড়া দিয়ে সটান সিমলায় আমের ঝুড়ি পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হলেন তিনি। রসিদ আমাকে ডাকে পাঠিয়ে

দিলেন। রসিদ পেতে আমার আট দিনের বেশী লাগেনি। কিন্তু যার রসিদ সেই লেংড়া? সে সিমলা স্টেশনের পার্শেল ঘরে। আমি ঠাকুরঘরে মাথার দিব্যি করে মানত করতাম, হে ভগবান যেন চোরের পেটেও যায়। তাতেও লেংড়ার একটা সদগতি হয়। রেলের রসিদখানা কুমারী রজনী নায়ারকে পাঠিয়ে দিলাম। পাঠিয়ে দিয়ে, আবার বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করছে। এতদিনে, ভগবান না করুন, লেংড়া যদি পচে ভূত হয়ে থাকে তা'হলে তিনি আবার না ভাবেন—পচা লেংড়াগুলো আর লোক পেলে না, আমার ঘাড়েই চাপালে!

কিন্নরলোকের যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া বা গরম কাপড় সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভোগ ভুগতে না হওয়াই তো উচিত। আমার প্রচারকার্য তো আজ থেকে চলছে না। সেই ১৯৪৮ সাল, হিমাচল সরকার সবে যখন চার মাসের শিশু, তখন থেকে আমি কাজ চালিয়ে আসছি। ভবিষ্যতের মুসাফিরদের কষ্ট পাবার তো কথা নয়।

না ...আমি যেমন করে কথা বলছি, তাতে লোকের মনে হতে পারে যে, কিন্নর দেশের ভালোমন্দের ভার বুঝি আমার হাতেই। হাতেই কথাটা সত্যি নয়। আমি যখন যাই তখনও সরকার গুছিয়ে বসতে পারেননি। আজ এতদিন পরে, নিশ্চয়ই ও দিকের ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে। আমি কেবল যত্ন সহকারে প্রাসাদের দরজা খুলে দেবার ব্রত নিয়েছি। যাতে পরে যাঁরা আসবেন, বেড়াতে কিংবা থাকতে তাঁদের বিশেষ কোনো অসুবিধে না হয়। আমার নিজের থাকবার ইচ্ছেটাও খুব প্রবল ছিল— ছিল কেন আজও আছে। একবার তো ভেবেছিলাম চিনীতেই স্থায়ী নিবাস কায়েম করব। কিন্তু রামপুর পৌছাবার আগেই সিদ্ধান্তে ফাটল ধরে গেলো। ভেবেচিন্তে দেখলাম, চিনীর কাছাকাছি যতদিন না মোটরবাস চলাচল ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে ততদিন আমার বাসও সম্ভব হবে না। আর এক হতে পারে—যদি বছরে একবার করে নিচে, সমতলে যাবার বাসনা ত্যাগ করতে পারি তা'হলে হয়। কিন্তু সেটাও আপাতত সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব, সারাজীবনের কথা তো অনেক দূরে, বছরে সাত মাস কাটানোর ব্যবস্থাও আপাতত করা যাচ্ছে না। তবে কথায় আছে, 'যো ইচ্ছা করিহৌ মন মাঁহী। হরি প্রতাপ কছু দুরলভ নাহিঁ।' তা হরি প্রতাপ না পাই, অন্তত হিমাচল সরকারের প্রতাপের আভাস পেলেও তো অনেক কিছু হতে পারে। আমি তো আশার খেয়ায় গুণ টেনে চলেছি। দেখি কবে জোয়ার আসে!

ভবঘুরের পাঁচালী

ভাবছি এ বার একটা নতুন শাস্ত্র লিখব, ভবঘুরের শাস্ত্র। 'অথাতো ভবঘুরে জিজ্ঞাসা'— বলে আরম্ভ করে দেবো। কিন্তু শাস্ত্র প্রণয়ন করতে গেলে যতটুকু সময় ব্যয় করতে হবে সে সময় কই? সেই সময়ের মধ্যে আরও কয়েক চক্কর ঘুরে আসতে পারব। বয়স তো প্রায় ষাটের কোঠায় পৌছাল। প্রথম প্রথম ছিলাম শৌখীন ভবঘুরে। পেশাটা তখনও অস্থায়ী। তা ধরুন বছর চব্বিশ বয়স পর্যন্ত এমনি কেটেছে। তারপর বছর পাঁচেক জেলে। ঠিক চৌত্রিশ বছর বয়স থেকে এই বাউণ্ডুলে বৃত্তিকে পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেছি। এতদিনে অবসর নেবার সময় এসেছে বৈকি। কিন্তু হাড়ে মজ্জায় যার

বাউণ্ডুলেপনা, সে কি আর পেন্‌সন নিতে পারে! মনে হয় দেশের সব ছেলে ছোকরাগুলোকে ধরে ধরে ভবঘুরে বানিয়ে দিই। এই কারণে এর মধ্যে আমার বদনাম হয়ে গেছে। আমার এই সব ঘর-ছাড়ানো মন্তর পড়ে অনেক মা-বাপের নয়নের মণিরা ঘর-দোর ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব মা-বাপ যে আশীর্বাদ করছেন না সেটা বলাই বাহুল্য। তা তাঁদের অভিশাপ শিরোধার্য। আমি এ বার পাকাপোক্তভাবে ভবঘুরে ধর্ম প্রচার করতে থাকব। ভবঘুরে শাস্ত্রের গোড়ার কথাটা শুধু এখানে বলে রাখি, বেশী ফেনাব না। কারণ, এটা অমার ভ্রমণকাহিনী। শাস্ত্র লিখতে এখনও দেরি আছে। যে শাস্ত্রে ভবঘুরে হবার নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, মন্ত্রতন্ত্র সবই থাকবে। সংক্ষেপে বলি, সাচ্চা ভবঘুরে হতে হলে তাকে প্রথমত মানবপ্রেমিক হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট সমাজের বন্ধন সে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাই বলে কোনো সমাজকে সে অস্বীকার করতেও পারবে না। সমাজ, জাতি, আচার নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সেবায় তাকে উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে। কবি হোক, রূপকার হোক, শিল্পী হোক, তার বৃত্তি যাই হোক না কেন, তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হবে—নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করা; মানুষের কল্যাণ করা।

ভবঘুরেদের কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কেউ কেউ জাত বাউণ্ডুলে। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের বালাই নেই, কেবল ঘুরে বেড়ায়। পায়ে তাদের চাকা বাঁধা। আরেক দল আছে, যাদের ইচ্ছে হলো ঘুরে বেড়িয়ে আমোদ করব। সেই আমোদের জন্যে অনেক কষ্টও তারা সহ্য করে, সেটা হাসিমুখেই হোক বা মুখ বেজার করেই হোক। এখানে কয়েকজন ভবঘুরের পরিচয় দেবো। এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে পথে। তারা কোন জাতের পর্যটক তা পাঠকই নির্ধারণ করবেন। আমি তাদের নাম-ধাম বলেই খালাস। নইলে এক এক জনের বিস্তারিত ইতিহাস জানতে গেলে মহাভারত লেখা হয়ে যাবে।

আম্‌দো জাতির পরিব্রাজক

চিনীর হাসপাতালে আলাপ হলো জনৈক লামার সঙ্গে। লামাটির দেশ আম্‌দোয়। লাসা থেকে আরও উত্তরে, তা প্রায় মাস দুয়েকের রাস্তা হবে, কোকোনোর (নীল সরোবর) আর কান্‌সু বলে দু'টো প্রদেশ আছে। এই দুই প্রদেশের সীমান্তে আম্‌দো জেলা। আম্‌দো জেলার বাসিন্দাদের নামও আম্‌দো। আম্‌দোদের পূর্ব পুরুষরা রক্তধারার দিক দিয়ে চীনাদের স্বজাতি। ওরা প্রথমে চীনের হোয়াংহোর (পীত নদী) ধারে বাস করত। আম্‌দো সভ্যতা তিব্বতী সভ্যতার চেয়ে পুরনো। তবে তাদের ভাষায় তিব্বতী ভাষার সঙ্গে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। আমি চারবার তিব্বত পর্যটন করেছি। এই পর্যটনে অনেক পণ্ডিত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। মজার ব্যাপার, তাদের মধ্যে কেউই সাধারণ তিব্বতী নয়। হয় আম্‌দো, নয় মোঙ্গল জাতের লোক। গেন্‌দুম ছেন কেলও (সংঘ ধর্মবর্দ্ধন) এমনি একজন প্রতিভাবান আদর্শবাদী আম্‌দো। তাঁর প্রগতিপন্থী মতবাদের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ তাঁকে গত ক'বছর থেকে লাসার জেলে

পচতে হচ্ছে। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ভারতে। তারপর আমার দু'টি তিব্বত যাত্রায় আমি এঁকে সঙ্গী পেয়েছিলাম।

চিনীর এই হাসপাতালটায় অনেক দিন থেকেই কোনো ডাক্তার নেই, আছেন একজন কম্পাউণ্ডার, তাও পাশ-করা কি হাতুড়ে তা জানি না। লোকে তাকে বলে 'ডাক্তার'। যে বনে বৃক্ষ নেই, সেথায় এরণ্ডই বনস্পতি। তা কম্পাউণ্ডার লোক খারাপ নয়। লোকের সঙ্গে ঝগড়া কোঁদল করা তার অভ্যেস নয়। হাসপাতাল তার পৈত্রিক আবাসও নয়। সরকারী বাড়ি। লোকে যদি হাসপাতালকে ছাত্রাবাস ধর্মশালার মতো ব্যবহার করতে চায় তবে সে আপত্তি করবে কেন? কাজেই হাসপাতালের উঠোনটা অনেক সময় গাধা ঘোড়ার অস্থায়ী আস্তাবল বলে মনে হয়। এই পাসপাতালের 'সরাইখানায়' একখানা ছোট কামরায় ক'দিন ধরে বাস করছিল সেই আম্‌দো লামাটি। কার কাছে যেন আমার কথা শুনেছে। দেখা করতে এল। সে দেশ ছেড়েছে প্রায় বিশ বছর, লাসার মঠে বছর কয়েক কাটিয়েছিল, ভালো লাগেনি। কৈলাস দর্শন করতে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে জনৈক হঠযোগী লামার কাছে দীক্ষা নিয়ে, গত ছ-সাত বছর এ দিকেই ঘোরাফেরা করছে। গিয়েছিল রাওয়ালসর তীর্থে। ফেরার পথে এখানে বিশ্রাম করছে। বেচারার মনটা দেখলাম চঞ্চল। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম—তার স্ত্রী প্রসবের পর থেকেই অসুস্থ। তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেনি। তায় আবার সঙ্গী খাম্পাদের হাতে নিজের জিনিস-পত্তর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। এখন তাদের কারও দেখা নেই। বেচারা ভারী মুশকিলে পড়েছে। এদিন চুপিচুপি পুণ্যসাগরের কাছে চাল ধার করতে এসেছিল। জানতে পেরে আমি পুণ্যসাগরকে বিশেষ করে বলে দিলাম, যেন লোকটিকে মুক্তহস্তে সাহায্য করা হয়, কিন্তু তার আর দরকার হলো না। তার পরদিনই খাম্পারা এসে গেলো। চাল যা বেঁচেছিল, লামা ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। কিছুতেই শুনল না, যা খরচ হয়েছিল তাও শোধ করে দিতে চাইছিল; আমি নিতে রাজি হলাম না। কোথায় হোয়াংহোর নদীতীর, কোথায় কোকোনোর আর কান্‌সু। একটা ভারতীয় শব্দও জানে না বেচারা লামা। অথচ কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, এমন কি সিংহল পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছে। বললে, এ বার না-কি বর্মায় যাবার ইচ্ছে।

বেড়াতে বেড়াতে আম্‌দো ভবঘুরর যজমান-বাড়ি গেলাম, দেখি আমার আগের চেনা সেই খাম্পা ছোক্‌রাও রয়েছে তাদের দলে। দু'জনেরই খুব আনন্দ হলো। সে আবার আমায় পেয়েছে, চা না খাইয়ে কি ছাড়ে? এ দলের তত্ত্বাবধানেই আম্‌দো লামার বউ ছিল। আপাতত ভালোই আছে। আমার পুরনো বন্ধু ধর্মবর্দ্ধন এরও পরিচিত লোক। তার কথা অনেক বললে। তা'ছাড়া আরও নানা বিষয়ে আলোচনা করল। বললে, লাসার মঠে আজকাল গুণ্ডাদের রাজত্ব চলছে। তিব্বতের সব জায়গাতেই ঐ রকম অবস্থা। মানস সরোবর তো ডাকাত-গুণ্ডাদেরই আড্ডা। বললে, ধর্মবর্দ্ধন এ সব জিনিসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, লাসার জেলে পচছেন। আর একজন তো (সেও আমার পরিচিত) প্রাণই দিয়ে দিলে। ভোটরিজেণ্ট রেডিংকেও লামারা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এইসব নানা উত্তেজনাকর দুঃখের কাহিনী শুনলাম আম্‌দো লামার

মুখে। লোকটি সত্যিই বড় চমৎকার মেজাজের। প্রথম শ্রেণীর পর্যটক না হোক, তার অভিজ্ঞতা বা সাহস কিছু ফেলে দেবার জিনিস নয়।

মোঙ্গল পরিব্রাজক

প্রথম যে-বার তিব্বত যাই, পথে সুমতি-প্রজ্ঞা বলে এক মোঙ্গল ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এ বারের কিন্নর যাত্রায় আলাপ হলো আরও একজনের সঙ্গে—ইনিও মোঙ্গল। নামটা ভুলে গেছি। মোঙ্গলিয়ায় সামাজিক বিপ্লব হবার আগেই এঁরা দেশ ছেড়ে এসেছেন। ১৯১৮-২০ সালে মোঙ্গলিয়ায় সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। তার আগের যুগে সেখানের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। সেই রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় পথের দুর্গমতা ও দস্যু-ভীতির বাধা তুচ্ছ করে, সুদূর তিব্বতে পাড়ি জমানো কম কথা নয়! আমাদের পরিব্রাজক মশায় একেবারে নিরক্ষর নন্ যদিও, তবু লেখাপড়ায় খুব একটা রুচিও নেই। তা সত্ত্বেও, এই সাংঘাতিক বিদেশ-যাত্রায় যে কিসের প্রলোভনে বেরোলেন, সেটা বলা শক্ত। একটু ধর্মপ্রবণতা আছে।

লাসার গুম্ফায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে আরও ক'বছর নানান জায়গায় ঘুরে-ফিরে তাঁর এখন দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, কোথাও পাকাপাকি ডেরা না জমানোই ভালো এবং এইভাবে ঘুরতে ফিরতে জীবনের বাকি কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। এরা হলো জাত-ভবঘুরে। তিব্বতীদের গরম সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালে তারা হিমালয়ের উঁচু আওতা ছেড়ে পারতপক্ষে নামতে চায় না। আমাদের পর্যটক তো সাইবেরিয়া অঞ্চলের জীব। একটু গরমেই ছট্ফট করে। একবার শীতকালে অমৃতসর গিয়েছিল। তখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পুরোদমে চলছে। তবে ওর গায়ে কেউ হাত দেয়নি। ওর লাল কাপড়েই প্রমাণ ছিল যে, ও রামেরও কেউ নয় খোদারও কেউ নয়। দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে ছাড়া পেলে কি হবে, পুলিশ ওকে রেহাই দিলে না। অঙ্গের রক্তাম্বরই ওর কাল হলো; ভারতীয় পুলিশের লালভীতি বিশ্ববিশ্রুত। ও লাল যে ধর্মের লাল সাম্যের লাল নয়, এটা বুঝতে তাদের যতদিন সময় লাগল, সে পর্যন্ত ভবঘুরেকে জেল হাজতেই কাটাতে হলো— সেটা বোধহয় মাস দেড়েকের কম নয়। এত কষ্টের ভারত-ভ্রমণ বেচারার! তবুও কিন্তু দমেনি। এত কষ্ট পেয়েও মনে মনে এখনও ভারতের দিকেই টান। পাকিস্তানের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। হাজার হোক ধর্ম-সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতই মোঙ্গলিয়ার প্রতিবেশী— পাকিস্তান নয়।

ব্রহ্মচারী চৈতন্য

রেঞ্জার শর্মার কাছে ব্রহ্মচারীর সাহসের গল্প করছিলাম। শর্মাজী বললেন, 'কোন ব্রহ্মচারী বলুন তো? সেই যে পংগীতে একটা মেয়েমানুষের পেছনে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই লোকটা না-কি?' আমি বললাম, 'আপনি তো মশায় সনাতনী লোক। কে পাগল হয়নি আমায় বলুন দেখি? আপনাদের ব্রহ্মা-মহেশ্বর পাগল হননি মেয়েমানুষের পেছনে? সংস্কৃত শ্লোকেই রয়েছে—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা :
তেহপিস্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহঙ্গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্ বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্ ॥

অর্থাৎ, বিশ্বামিত্র পরাশরের মুনি, যাঁরা বাতাস, জল, আর ঘাস খেয়ে থাকেন, তাঁরাই যখন নারীর মুখপদ্মে মোহিত হয়ে যান তখন ঘি-দুধ খেকো সাধারণ লোকে ইন্দ্রিয়দমন করলে বুঝতে হবে যে বিন্ধ্যপর্বত সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। কাজেই শর্মাজী! সে ব্রহ্মচারী বেচারার অপরাধ নেই। আর থাকলেও অপরাধে তার সাহসের মহিমা ম্লান হয় না।'

ব্রহ্মচারী পরমানন্দ চৈতন্য আলমোড়ার লোক, বছর চল্লিশ বয়স। তার মধ্যে বছর কুড়ি ভবঘুরেগিরি করেই কেটেছে। সমতলভূমিতে যত-না ঘুরেছেন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেই ঘুরেছেন বেশী। কাশ্মীর, লাদাক, মানস সরোবর, নেপাল কোথাও বাদ রাখেননি। দুর্গমতম রাস্তায় সফর করেছেন। যে সব ঘটনা শুনলে অনেক দুঃসাহসী ভ্রমণবীরও হয়ত আঁতকে উঠবেন। বহু বিচিত্র সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁকে, অনেক কৌশল করে কেটে বেরিয়ে এসেছেন।

'বছর পনেরো-ষোলো আগে' ..ব্রহ্মচারীর নিজের মুখে যেমন শুনেছি, তেমনি করেই বলি, 'একবার জুব্বলের পাহাড়ী এলাকায় ঘুরছি। আলাপ হলো এক দোকানদারের সঙ্গে। তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে। আতিথ্য নিলাম। খুব যত্ন-আত্তি করলে। দোকানদারের তরুণী মেয়ে হাত-মুখ ধোবার জল দিলে। খাবার সময়ে সঙ্গে বসে খেলো। তার মা পরিবেশন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে শোবার পালা। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমার আর মেয়েটির একই ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। সারা রাত অতি কষ্টে সংযম পালন করলাম। সকাল হতেই কেটে পড়বার তাল খুঁজছি। এমন সময় গৃহস্বামী দেখা দিলেন। বললেন 'এর মধ্যে যাবেন কেন? অসুবিধে হচ্ছে?'—অসুবিধে যে কিসের, তা আর বোঝাব কি করে? আমতা-আমতা করছি। গৃহস্বামী প্রস্তাব করলেন, ঘর-জামাই হয়ে থাকতে। আপত্তি করতে সে কি রাগ। শেষে অনেক বুঝিয়ে, 'আমার ঘুরে এসে প্রস্তাব গ্রহণ করব, —এই শপথ করে তবে আসতে পারি। এ পথের এই হলো প্রথম বাধা।'

পরিব্রাজকদের একটা নীতিবাক্য আছে, 'চোরীনারীমিছা, অওর ঘুমক্কড় ইচ্ছা।' অর্থাৎ মিথ্যা কথা, চৌর্যবৃত্তি আর নারীসঙ্গ এই তিনটি বস্তু পর্যটকের বর্জনীয়। তা এ সব আপ্তবাক্য শুনতেই বেশ, সত্যি কথা বলতে কি, এ যুগে এ সব পালন করে কেউ চলেও না, আর চলা যায়ও না। সেটা যদি হতো তা'হলে হিমালয়ে আজ সিফিলিস গনোরিয়ার আক্রমণে সরকারকে মাথায় হাত দিতে বসতে হতো না। আমাদের ব্রহ্মচারী আধ্যাত্মিক যোগীপুরুষ নন। তাঁর ব্রহ্মচর্য-ব্রতও অনেকটা তাঁর দু'ঘণ্টা সমাধি আর অষ্টসিদ্ধির মতোই সোনার পাথরবাটি। ও রকম দু-চারটে গাঁজাখুরি সম্বল না থাকলে এ সব দুর্জয় পথে ঘোরা যায় না। কাজেই তাঁর পক্ষে ও সব নীতিকথায় নির্ভর করা সম্ভব নয়।

নিজেই বললেন, একবার না-কি মূত্রকৃচ্ছ রোগে ভুগে উঠেছেন। কারণটা অবশ্য আর কিছু নয়, অত্যধিক যোগাভ্যাস। তা ও সব আমরা বুঝি। বেচারা করবেনই বা আর কি? চম্বা, কুলু, মুব্বল অঞ্চলে যৌন সম্পর্কের অবাধ বিচরণ ব্যবস্থা। কোনো নিয়মের নিগড় নেই। সেখানে গিয়ে ক্ষুৎ-পিপাসা দমন করে চলা মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু ছিল না, যদি সমতলের লোকদের আসা-যাওয়া, অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক গতিবিধি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা যেত। সমতল সমাজে পতিতাবৃত্তি বন্ধ হয়নি আজও। কাজেই যৌনব্যাধির প্রকোপ কমার কোনোর প্রশ্নই ওঠে না। পাহাড়ীদের সরল পেয়ে, যৌন মেলামেশার অবাধ সুযোগে সমতলবাসীরা তাদের মধ্যে এই মারাত্মক ব্যাধি উপহার দিয়ে যায়। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার—সংখ্যা থেকে সংখ্যাতীত মানুষের রক্তে বিষ, সভ্যতার বিষ সঞ্চারিত হতে থাকে। পরিণামে আজ কুষ্ঠ আর উন্মাদ রোগের আক্রমণে হিমালয়ের স্নিগ্ধ বুকে দগ্‌দগে ঘা দেখা দিয়েছে।

কথা উঠতে পারে যে, আজকের বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে, চিকিৎসায় কি না সারে! কথা তো ঠিকই। পেনিসিলিনের মতো আয়ুধ হাতে থাকতে, 'ডাক্তার কি ডরায় কভু ভিখারী ব্যাধিরে?' কিন্তু ঋষিকেশ লছমনঝোলার পথের দু-পাশে যে কুষ্ঠরোগীর ভিড় দেখা যায়, সেই সংখ্যার রোগী সারাতে গেলে কি পরিমাণ ডলারের প্রয়োজন, সে হিসেবটা কি জানা আছে? আসে কোত্থেকে সেটা? ব্রহ্মচারী ভদ্রলোক ঘুরেছেন খুব। কাশ্মীর থেকে নেপালের কোনো অংশ বাদ দেননি। বেজায় বিপজ্জনক সে সব রাস্তা। ব্রহ্মচারী যে-সব গালগল্প করলেন, তার গাঁজাখুরির অংশটুকু বাদ দিয়েই আপনাদের পরিবেশন করছি।

...একবার পাণ্ডবদের তপস্যাস্থল দেখতে গিয়ে তিনি না-কি এক সরোবরের পাড়ে একটি ছোট কুণ্ডের মাঝে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি দেখেছেন। আমি এই ত্রিমূর্তির গল্প আরও নানা জায়গায় শুনেছি। মানস সরোবরের পথে একটা গুম্ফায় এমনি ত্রিমূর্তি, দিব্যি রাম-লক্ষ্মণ-সীতার নামে পূজো পেয়ে আসছে। কে কার ভক্তি-বিশ্বাসে আঘাত করবে বলুন! আপনার যা মুখে আসে বলুন, আমার যা প্রাণ চায় মনে করব। আসলে ব্রহ্মচারী বর্ণিত ত্রিমূর্তিটি আমার মনে হয়, অবলোকিতশ্বর মঞ্জুশ্রী বজ্রপানির ত্রিমূর্তি। ভক্তির ঘোরে লোকের বাহ্যজ্ঞানও চলে যায় বোধহয়। নইলে সীতা আর মহেশ্বরে তফাৎ দেখে না? বলিহারি! এইসব অজ্ঞাত-তীর্থ, মানে ঐ যেমন পাণ্ডবদের তপস্যাভূমি, মাঝে মাঝে ভারী সমস্যার সৃষ্টি করে। কুলুর ওদিকে লাদাকে যাবার পথের ওপরেই একটা পাহাড় আছে। তার গা দিয়ে সহস্রধারায় ঝর্ণা বয়ে চলেছে। হিন্দুরা একবার খোঁজ পেলে হয়! একটা কিছু নাম দিয়ে তীর্থ বানিয়ে ফেলবে। পারছে না কয়েকটা মোটা কারণে। রাস্তায় ভীষণাকৃতি ক'টা পাহাড়ী খদ্দ আছে। আর ওদিকের পথে বিনা নোটিশেই যখন তখন ধ্বস নামে।

আরও একটা উপায় আছে। সে উপায়টা বহু তপস্যালব্ধ পুণ্যের ফলে পেয়েছেন একদল পুঁজিপতি। তাঁদের হাতে টাকা আছে। ব্যস আর কিছুর প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করুন, 'ফোলক-ডাঙা' বলে একটা জায়গা রয়েছে ওখানেই। এরোড্রমের উপযোগী বিরাট একটা মাঠ আছে সেখানে, অল্প আয়াসে আর কিছু টাকা ঢাললে চমৎকার একখানা বিমানবন্দর হয়ে যায়। কিন্তু কে উদ্যোগী হবে? ব্রহ্মচারীর ভারী উৎসাহ।

আজই যদি এয়াপোর্ট হয় তো কালই সে গিয়ে একটা তীর্থরাজের ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে আসে। আমার হাসি পেল। একবার এক শিখ ভদ্রলোককেও ঐ ফোলক-ডাণ্ডার ময়দানের কথা বলেছিলাম। সে গুরু গোবিন্দের তপস্যাভূমির খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। ভাবি, আমাদের বিমানবাহিনী তো আজকাল ঐ দিক দিয়েই আকাশপথে উড়ে বেড়ায়। তাদের কল্যাণে যদি কালই একটা ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড হয়ে যায়, তবে হয়ত ব্রহ্মচারী গিয়ে দেখবে, তার আগেভাগেই ফোলক-ডাণ্ডায় গোবিন্দতীর্থের পতাকা উড়ছে।

ব্রহ্মচারী মজার লোক। তার নেপালী গুরু চম্বায় থাকেন। সেখানে তাঁর সিদ্ধাইয়ের খুব খ্যাতি আছে। চম্বায় গুরুগৃহ, কাজেই চম্বা তো তার ঘর-বাড়িই হয়ে গেছে। বছর তিনেক হলো কিন্নর দেশে এসেছে। অনেকবার এসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর ফলে কাজ চালানো গোছের তিব্বতী ভাষাও শিখে নিয়েছে। শাক্ত বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর মতের মিলও প্রচুর। ভক্তকে আচারনিষ্ঠ বৈষ্ণব বানাবার দিকে তার মোটেই ঝোঁক নেই। ভক্তের কানে অভেদ মন্ত্র জপ করায় তার আগ্রহ। মায়ের মহাপ্রসাদে (মদ) তার রুচি মায়েরই মতো। দিনে যতবার পায়—ততবারই খায়। বলে, ভক্তির ধন অমৃত। যত খাবে ততই সিদ্ধি। মাংসের ব্যাপারে অরুচি কেন সেটা বুঝলাম না কিন্তু। এ অনেকটা মা'র মরোয়াড়ী-গুজরাতী ভক্তদের মতো। তারা 'মা' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে কিন্তু মা'র প্রসাদ খাবে না। ব্রহ্মচারীর মতে, এখন মা'র পূজোয় নারকোল-কুমড়ো বলি দিয়েই খালাস হওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একবার শুদ্ধি-সেবন (মাংস-ভোজন) করলে আর রেহাই নেই। তখন মা ফরমাস করবেন, 'কুমড়ো নারকোল নেই মাংতা, পাঁঠা লে আরও।' —তার চেয়ে এই ভালো। আমি যা খাই, তাই মাকে দিই। যুক্তি অকাট্য।

ব্রহ্মাচারীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় তেল চুকচুকে লম্বা চুল। মুখে দাড়ি। চুল দাড়ির কোনো অংশেই আজও রূপালী আভাস দেখা দেয়নি, কাঁচা আছে। বছর তিনেক আগে একবার কৈলাস থেকে ঘুরতে ঘুরতে পংগী গ্রামে এসে পড়েন। দিন চারেক থাকতেই, জায়গাটা ভালো লেগে গেলো। মনে মনে চিন্তা করে ব্রহ্মচারীজী স্থির করলেন, জায়গাটা সমাধির উপযুক্ত স্থান। লোকের মনে শ্রদ্ধা আছে। তিন বছর আসন-সিদ্ধির সঙ্কল্প নিলেন ব্রহ্মচারী। দিন যায়— লোকের মনে ভক্তি বাড়ে। পংগীর রাস্তা ৮৯৫০ ফিট ওপরে, তারও প্রায় হাজার তিনে ফিট উঁচুতে আশ্রমের স্থান নির্বাচিত হলো। ভক্তের দল, সেখানে সাত কামরাওয়ালা বাংলো বানিয়ে দিলে। ব্রহ্মচারী, তাঁর আশ্রমের নাম দিলেন, 'ঋষিকুল'। ওঃ, সে কি জায়গা! দেখলে মনে হয় স্বর্গের ইন্দ্রপুরী, কি বৃহস্পতির আশ্রম। শীতকালের তিনমাস বরফে ঢাকা পড়ে থাকে সেই আকাশ-ছোঁয়া বাংলো-মন্দির। কিন্তু শীতের কষ্ট দিব্য-মানবের গায়ে লাগে না, ভক্তের দল গাড়ি-গাড়ি কাঠ পৌছে দেয় মন্দিরে। পানাহারের (হ্যাঁ, আহার্য পানীয় দুটোই) প্রাচুর্য, ভক্তজনের সমাগম পংগীর আশ্রমকে সরগরম করে রাখল। তপস্যাও খুব জোরে চলতে লাগল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের আসন টলমল।

ইন্দের যা স্বভাব—যে অস্ত্র সে বিশ্বামিত্রের ওপর প্রয়োগ করেছিল সেই মোহিনী অস্ত্রে ব্রহ্মচারী বেচারীকেও ঘায়েল করলে। অবশ্য তা জন্যে স্বর্গ থেকে মেনকা, উর্বশী,

রম্ভা কি তিলোত্তমা কাউকে পাঠাতে হলো না। ব্রহ্মচারীর তপস্যায় আগুন ছিলই. নারীভক্তদের ভক্তির ঘৃতও অফুরন্ত। ব্রহ্মচারী নিবৃত্তিমার্গের সাধক নয়। তাঁর আশ্রমে ভক্ত নরনারীর অবাধ গতিবিধি। নিন্দুকে বলে, মেয়ে ভক্তদের গানের সঙ্গে বহ্মচারী না-কি হারমোনিয়াম বাজাতেন। তা তাতে কি আসে যায়। আসল অসুবিধে ঘটালো হিংসুটে ইন্দ্র। যে যাইহোক, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মচারীও সেই পুরাণ-কথিত মহর্ষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন। 'আমি ভৈরব, তুমি আমার ভৈরবী, এই বলে তিনি এক ব্রতচারিণীকে আলিঙ্গন দিয়ে বসলেন। এইখানেই হলো ব্রহ্মচারীর ভুল। তিনি ভেবেছিলেন, ভক্তেরা এটাকেও তাঁর অলৌকিক মহিমা বলে মেনে নেবে। কিন্তু তা হলো না, ঘোট-পাকিয়ে তোলা হলো।

কোঠির চণ্ডিকা মন্দিরে ব্রহ্মচারীর যাতায়াত ছিল। কানাঘুষো হতে হতে কথাটা যেই চাউর হয়ে গেলো অমনি সবাই মিলে একদিন সভা করে ব্রহ্মচারীকে মায়ের মন্দিরেই চেপে ধরল। বললে, ব্যভিচার করছে। ঘটনাচক্রে মেয়ের বাপও হাজির ছিল। সে বললে, আমি আমার মেয়েকে গুরুদেবের চরণে সমর্পণ করছি। ল্যাঠা এখানেই চুকে যাবার কথা কিন্তু চুকল না। একবার উৎসর্গ করা ফল কি আর দেবতার পূজায় লাগে? এ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় হচ্ছিল। বেঁকে বসল একটা উটকো লোক, তৃতীয়পক্ষ। কি ব্যাপার? না, মেয়ের ওপর তার বাপের অধিকার নেই। আগেই একবার মেয়েকেও একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।—কথাটা উপস্থিত সব্বাই মনে নিল। জানা গেলো, ঐ উটকোই না-কি মেয়ের বাপের প্রথম জামাই।

মামলা আদালতে গেলো। নিন্দুকে বলে, ব্রহ্মচারীকে হাতকড়া বেড়ি পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে, নিয়ে গিয়েছিল। আমি বলি, যীশুকে ক্রুসে চড়ায়নি? তাতে কি সন্ন্যাসীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়? অবশেষে, নগদ বিশ টাকা গুণে দিয়ে সন্ন্যাসী অব্যাহতি পেলেন। পংগীর ঋষিকুল অনাদৃত। ভক্তের অভাব তেমন হতো না কিন্তু ব্রহ্মচারীর নিজেরই পাঁচ কারণে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওখানে থাকতে পারলেন না। ভৈরবী অবশ্য তাঁর সঙ্গেই থেকে গেলো। এই ঘটনার মাসখানেক পরেই তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে আপাতত সেখানেই আছে। ব্রহ্মচারী ভাবছেন, আবার পরিক্রমায় বেরোবেন— আবার কৈলাসের দিকে। কৈলাস মানে? চমকে উঠেছিলাম। মহাপ্রস্থান না-কি? নাঃ তা নয়। আসল নয়, নকল কৈলাসেই যাচ্ছেন। তা ভালো। ভাবলাম বলি, ভায়া, এ বার ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়েই যাও— পার্বতী-শঙ্করের তীর্থ। কিন্তু সেটা আর বলা হয়নি।

মোনে-রৌলা

'মোনে-রৌলা' ওর আসল নাম নয়, এখানকার লোকে ওকে ঐ নাম দিয়েছে। বস্পা উপত্যকার ঐতিহাসিক গ্রাম 'কামরু'র কিন্নর নাম হলো 'মোনে, আর কিন্নর ভাষায় সাধু-ফকিরকে 'রৌলা' বলে। এই দুই মিলে লোকটার ঐ নাম হয়েছে। মোনে-রৌলার আসল নাম রবিলাল। দার্জিলিং জেলার কাছে ধানকটা জেলায় ১৯০৬ সালে রবিলালের জন্ম। বছর একুশ বয়স যখন, তখন বাড়িঘর, চাষবাস, ক্ষেতখামার ছেড়ে হঠাৎ

একদিন বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে গেলো বর্মায়; সেখানে ওর দেশের অনেক লোক চাকরি করত। বছরখানেক সেও তাদের সঙ্গে চাকরি-বাকরি করল। হঠাৎ কার কাছে শুনতে পেলে, 'শান্' রাজ্যে না-কি রত্নগুহা বেরিয়েছে। দেশভাইদের সঙ্গ জুটে 'শান্' রাজ্যে গেলো। দেখলে ব্যাপারটা খানিকটা সত্যি, রত্নখনি আছে মাটির তলায়। সে দেশের রাজার কাছে মাটি খোঁড়ার অনুমতি নিতে হয়। একটি শর্ত থাকে, যা রত্ন পাওয়া যাবে তার দশভাগের একভাগ রাজাকে দিতে হবে। তথাস্তু। অনেকেই মেতে গেলো ভাগ্যের জুয়ো খেলায়। মোনে রৌলার সামনেই না-কি একজন ষাটলাখ টাকার 'নীলা' পেল, আর একজন পেল পনরো হাজার টাকার হীরে কিন্তু তার হাতে টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতে তাকে ছুরি মেরে সব কেড়ে নিল।

এইসব রত্নপুরীর সঙ্গে অভিশাপের প্রেত ঘুরে বেড়ায়। মানুষের রক্তে মাটি না ভিজলে, বোধহয় পাতালপুরীর ঘুম ভাঙে না। অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি, স্পেনের এলডেরাডো, আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি, কিম্বার্লির হীরের খনি—সব জায়গায় মানুষের বঞ্চিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস আছে—আছে অতৃপ্ত লালসার হাহাকার আর তাজা নররক্ত। বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, এই জন্মু-কাশ্মীর অঞ্চলেই নীলার খনিতে একই ধরনের দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে দলে দলে নরহত্যা হয়েছে যাচ্ছে। নীলার খনির পাশেই কুটের জঙ্গল। কুট এক রকম সুগন্ধি ঔষধি। যারা বছর বছর নীলা চুরি করতে যায়, তারা বেশীর ভাগই ব্যর্থ হয়ে ফেরে। পথেই কুট। নীলায় যেখানে হাজারে লাখে কামাতে পারে সেখানে কুট থেকেও শয়ে শয়ে কামানো যায়। তাও কম কি? কিন্তু এই লোভে বছর বছর লোক শান্ত্রী-পাহারাদারদের বন্দুকের গুলি খেয়ে কিংবা হিংস্র শিকারী কুকুরের শিকার হয়ে মারা যায়। ধনরত্নের হাতছানিতে তবুও লোকের ঘরে বসে শান্তি নেই, নিশীথ রাতে চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

আমাদের রবিলাল বেচারাকেও শানের রত্নখনি থেকে খালি হাতেই ফিরতে হলো। ঘুরতে ঘুরতে সেখান থেকে মণিপুরে এসে হাজির। মণিপুরে তখন পাসপোর্ট ছাড়া ঢুকতে দিত না। রবিলাল চুরি করে ঢুকে পড়ে একেবারে সোজা মন্ত্রীর বাড়ি হাজির। তাঁকে নিজের অসহায় অবস্থা জানিয়ে সে একটা চাকরীও জোগাড় করে নিল ঐ মন্ত্রীর বাড়িতেই। সেইখানেই থাকে, খায়-দায় আর কাঁসি বাজায়। হঠাৎ মারাত্মক অসুখে পড়ে গেলো। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, অনেক কষ্টে জমিয়েছিল—প্রায় শ'দুয়ের মতো। সেগুলো নিয়ে সঙ্গীদের বললে, তোমরা এগুলো নিয়ে দান করে দিও। আমার মরণকাল ঘনিয়েছে, আমার দেহটাকে ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দাও। মরি যদি যেন পবিত্র জলের বুকেই মরি। তার মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাকে ভালোবাসত।

সবই তার ইচ্ছামতো কাজ হলো। ব্রহ্মপুত্রে ভেসে গিয়ে কিন্তু সে ডুবল না। ডুব সাঁতার কেটে নদীর অন্য পার এসে দেখলে তার রোগ সেরে গেছে। সেইদিন থেকে রবিলাল মনে মনে ভগবান-ভক্ত হয়ে উঠল। তারপর বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বহু চাকরি করতে করতে কেমন করে ওর মনে হলো এ সব কিছু কাজের কাজ নয়। সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে ভগবানের নামে সব বাসনা ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ানো। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে রবিলাল একবার করে বেরিয়ে পড়ে আর ঘুরে-ফিরে আসে। এক

জায়গায় চাকরি করে যেই একশো-দেড়শো টাকা জমে, অমনি আবার বেরিয়ে পড়ে। সারা ভারত পর্যটন করল বেশ কয়েকবার। পর্বতে, সাগরে, নগরে, বনে কন্তারে পরিক্রমা করতে করতে মনে এল বৈরাগ্য। ভাবল দীক্ষা নেবে। কিন্তু কার কাছে নেয়? রামেশ্বরের পথে আলাপ হলো রামানুজপন্থী বৈষ্ণবদের সঙ্গে। ভালো লাগল, তাদের কাছেই দীক্ষা নিলো রবিলাল। এর পর থেকে একেবারে ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে নেপালী রবিলাল হিন্দী বেশ ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিল। এরপর বের হলো কৈলাশ, কেদারবদ্রী, মানস সরোবর—সব দুর্গম হিমতীর্থ পরিক্রমায়। পাঁচবার সে তিব্বতে গেছে। বিপদসঙ্কুল পথ, মরণান্তিক শৈত্য, ব্যাধি, দারিদ্র্য কিছুই তাকে দমিয়ে দিতে পারেনি, একাধিকবার দস্যুর কবলে পড়েছে, কৌশলে প্রাণ বাঁচিয়েছে। পথ হারিয়ে মরুভূমির বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে। দারুণ বর্ষায় পথের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে, পরিত্যক্ত চটিতে বসে ঈশ্বর-নাম জপ করেছে। ভেবেছে আর নয়, এই শেষ। কিন্তু অলৌকিক শক্তি সব সময়েই তাকে উদ্ধার করেছে, কোনো ক্ষতি হয়নি তার।

দৈবে বিশ্বাসী মোনে-রৌলা রবিলাল। অনেকবার না-কি দেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছে, দৈববাণী শুনেছে। অবশেষে গত কয়েক বছর এখানে 'কামরু'তে এসে ডেরা বেঁধেছে। প্রাণপণ পরিশ্রম করে সেবা-যত্ন দিয়ে স্থানীয় লোকের কল্যাণ করার ব্রত নিয়েছে রবিলাল। গ্রামের লোকেরাও মোনে-রৌলা, বলতে অজ্ঞান। ছেলেদের জন্যে জায়গায় জায়গায় স্কুল করে বেড়ানোয় তার বেজায় আগ্রহ। এমনিতে নিজের জন্যে কোথাও হাত পাতে না, উপোস করে থাকলেও ভিক্ষা করে না। কিন্তু পরের জন্যে, স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে, দোরে দোরে চাঁদা চেয়ে বেড়াতে তার ক্লান্তি নেই, অনিচ্ছা নেই। মোনে-রৌলার মতো এমন নিঃস্বার্থ মানব-প্রেমিক ভবঘুরে খুব কমই দেখেছি। তার মতো উদারপন্থী দরবেশের অমন গোঁড়া রামানুজী ধর্মে দীক্ষিত না হওয়াই উচিত ছিল হিন্দুধর্মে একমাত্র গিরিপুরী ইত্যাদি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছাড়া ঔদার্য নেই কোথাও।

পরিব্রাজকের ধর্ম হলো, বৌদ্ধধর্ম। এতে জাত-বিচার নেই, বর্ণাশ্রম নেই। খাদ্যাখাদ্যের সঙ্গে ধর্মের আদৌ কোনো সম্বন্ধ নেই। বিবেক-বুদ্ধিকে পরিপূর্ণভাবে চালনা করবার অবকাশ আছে বৌদ্ধধর্মে। 'এটা করতে নেই' 'ওটা করতে হয়', কারণ তুমি বৌদ্ধ—এ ধরনের বিধিনিষেধ বৌদ্ধধর্মে হাস্যকর। মানব-প্রেমিক পরিব্রাজকদের তাই আমার পরামর্শ—হয় কোনো ধর্ম মানবেন না, নয় হিন্দু সন্ন্যাসী কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যান। শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচার ধর্মাঃ।'

জংগী

চিনীতে আর ক'দিন এসেছি। এর মধ্যেই মন উড়ু উড়ু করছে। ভবঘুরের দশাই এই। ভাবলাম, এই বেলা ঘুরেই আসি ওপর থেকে। পরে বর্ষা নেমে গেলে আবার পথের অসুবিধে হয়ে পড়বে। যেতে যখন হবেই, তখন বেলাবেলি বেরিয়ে পড়াই ভালো।

তহশীলদার সায়েব যাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েও নিশ্চিন্ত নন। কেবল বলেন, কষ্ট হবে। তাঁকেও অবশ্য ওপরের দিকে যেতে হচ্ছে কিন্তু সেটা হলো সরকারী কাজ। ভবঘুরের সঙ্গে কাজের লোকের মিশ খায় না। আমার সঙ্গী, পুণ্যসাগর। এক বৈদ্য কথা দিয়েছিলেন, সঙ্গে যাবেন বলে। কিন্তু খবর পেলাম, তিনি নেশায় চুর।

ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল, আমি ইচ্ছে করেই নিলাম না। আমার পরবর্তী বিশ্রামস্থল পাঁচ মাইল ছাড়িয়ে ছ'মাইলের মাথায়। এটুকু পথ হাঁটা দরকার। ঘোড়া কি হবে? মালপত্তর দুটো মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে দু'জনে হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে চললাম। এ পথটা আগাগোড়াই দেবদারু বনের পাশ দিয়ে চলে গেছে। চিনী থেকে প্রথম আধ মাইলটাক গিয়েই বন শুরু হয়েছে। কিছুদূর গিয়েই নদী পেলাম—পংগীর এই খদ্দটা, রীতিমতো চওড়া। এ বছরের প্রচণ্ড হিম-বৃষ্টিতে প্রায় প্রত্যেকটা খদ্দ ভেসে গিয়ে আশপাশের গ্রাম-বসত আর পথ-ঘাটের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে। পংগী খদ্দটা চওড়া হওয়ায় বরফ-গলা জল খদ্দের বুক দিয়েই বয়ে গেছে—আশপাশের খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। তবুও রাস্তার একটা জায়গা ভেঙেছে। বেশ বড় গোছের একটা ধ্বস নেমেছে দেখা যাচ্ছে। তাই অনেকখানি পথ ঘুরে গিয়ে মূল রাস্তায় উঠলাম, চড়াইয়ের মুখে।

পংগী গ্রামের সব ঘরবাড়ি এক জায়গায় নয়, খানিকটা এলোমেলোভাবে ছড়ানো। তাতে অবশ্য সৌন্দর্যের হানি হয়নি। একটা টিলার ওপরে পংগীর ডাকবাংলো। বাংলো না বলে প্রসাদ বলাই ভালো। ইয়া লম্বা চওড়া চার-চারখানা কামরা! বড় বড় দেবদারু কাঠের মোটা থাম। মনে হয় হাজার বছরের ধাক্কা সামলাতে পারে, এমন করে বানানো হয়েছিল—বছর পঞ্চাশ তো কেটেই গেছে।

বাংলোর চৌকিদাররা এখানে বংশপরম্পরায় চাকরি করে চলেছে। এখানকার চৌকিদারের ঠাকুর্দা এই জমির মালিক ছিল। সরকার থেকে যখন জমি কিনে নিতে চাইল, তখন সে বললে, আমরা জমির দাম চাই না। বন্দোবস্ত করে দাও, যেন আমার ছেলেপুলেরা এই বাংলোয় চৌকিদার হয়ে থাকতে পারে। তথাস্তু। সেই থেকেই এই নিয়ম চলছে। মাসে তিরিশ-বত্রিশ টাকা মাইনে, কাজ বলতে কিছুই নেই। ন'মাসে ছ'মাসে কেউ এল তার তদারকী করা। জায়গাটি চমৎকার। হিমাচল সরকার উদ্যোগী হয়ে ফলের চাষে মন দিলে, এ জায়গার উন্নতি হবে। লোকজন আরও আসবে—বেড়াতে আসার উপযুক্ত জায়গা। স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড়ে এই বাংলো ভরে থাকবে একদিন। তবে, তার আগে বাংলোয় চা-টোষ্ট, লাঞ্চের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

পি. ডব্লিউ. ডি.-র বাংলোয় বসে নানা কথা মনে আসছিল। ইঞ্জিনিয়ার সায়েব ওপরে কাজ দেখতে গেছেন। বাংলোয় সড়ক-ইন্সপেক্টর বন্ধু লছমীনন্দন রয়েছেন। তাই সৎকারের ব্যবস্থা খুব দ্রুতই হলো। হাঁক-ডাক হলো আরও বেশী।

ফল পাকতে এদিকে এখনও ঢের দেরি। অন্য কিছু খাবার ইচ্ছেও বিশেষ ছিল না। বাংলোয় চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে কোত্থেকে ঘোল এনে খাওয়ালে। ভারী চমৎকার স্বাদ, তবে টক। এখানে এসে সামনের চটিতে মোট বইবার জন্যে গাধা ভাড়া করা গেলো। কাজেই কুলীদের বিদায় দিলাম। এদিকে কুলী বা মুটেদের 'বেগারু' বা 'বেগারী' বলে। এই শব্দটায় আমার আপত্তি আছে। এ রকম অসম্মানজনক পদবী

হওয়া উচিত নয়। ওদের মোট বইবার মজুরী হলো মাইল পিছু দু-আনা—অন্তত তিন আনা হওয়া উচিত, যা আক্রার দিনকাল পড়েছে আজকাল।

এদেশে মালবাহীর কাজ প্রধানত করে মেয়েরা। মেয়েরা কোন কাজটাই বা না করে? ক্ষেতের কাজেও ওদের ভূমিকাই মুখ্য, পুরুষরা তো শুধু হাল লাঙল চালিয়েই খালাস। বাকি আগাছা নিড়ানো, কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো সার দেওয়া, ফসল পাহারা দেওয়া, ফসল কাটা ইত্যাদি যাবতীয় চাষের কাজ সব মেয়েদের জিম্মায়। কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় সব ভায়েদের এক বউ। এর মানে এ নয় যে এক পুরুষের বহু বিবাহের প্রথা নেই। তাও আছে। 'ডাক্তার' ঠাকুর সিংয়ের যেমন দুই বৌ। একজন ঘরের কাজকর্ম দেখেন, আর অন্যজন তাঁর হাসপাতালের সহকর্মিণী।

ধর্মানন্দ এক সময়ে তহশীলদারের কাছারিতে মুহুরী ছিল। এক হাড্ডিসার চেহারার পেন্সন্-পাওয়া বুড়ো। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। যেমন জামা-কাপড়ের চেহারা, তেমনি মুখের। তোবড়ানো গাল, শেষ দাঁতটিও মহাপ্রস্থানে গেছে। দেখলে কে বলবে যে, এ লোকের একটা দুটো নয়, তিন- তিনটি বৌ। এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান, এক কন্যা—নাঃ গোঁসা করে বাপের বাড়ি যাবার ফুরসত নেই তাঁর। তিন বৌয়ে মিলেমিশেই সংসার আর চাষবাসের কাজ সামলান। ধর্মানন্দ তো সন্ধ্যে হতে না হতেই নেশায় চুর হয়ে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে বসে থাকেন।

ঠাকুরসিংয়ের দু'টি যমজ কন্যা হয়েছে তাই ঠাকুরসিংয়ের দুঃখ। একটা যদি ছেলে হতো। ছেলে হয়ে কি স্বর্গে বাতি দিত, তা বুঝি না। এখানে তো দেখছি একটা মেয়ে তিনটে ছেলের ঝক্কি সামলায়। তবে বলবে, মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে। এ একটা কথা বটে। তা তারও তো উপায় তোমাদের হাতেই আছে। 'চোমো' বানিয়ে দাও। 'চোমো' মানে ভিক্ষুণী। কিন্নর দেশের প্রায় ঘরেই তো দেখি একজন করে ভিক্ষুণী...

তল্পিতল্পা নিয়ে হাঁটা দেবো ভাবছি। চৌকিদার এসে বললে, ঘোড়া এসে গেছে ভাড়া দেবে কে? লামা করম্পা রারঙ পর্যন্ত পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন। আপনার কাছে বেশী নেব না। দেবেন চারটে টাকাই। আমি বললাম, আমি ঘোড়া আনতে বলিনি তো। ঘোড়া আমার দরকার নেই। আসলে আমার রাগ হচ্ছিল তার কথা বলার ধরনে, যেন কত মস্ত উপকার করেছেন আমার! নইলে তেইশ মাইল পথের জন্যে কুড়ি টাকা ঘোড়ার ভাড়াও দিয়েছি। এ চার টাকা এমন কিছু নয়।

ক্লান্ত মন্থর পায়ে রারঙ পৌঁছালাম। সিমলা থেকে একশো বাহান্ন মাইল দূর। ৮৯০০ ফিটের মাথায় রারঙ গ্রাম। এ গ্রামে একবার আগুন লেগে সব বাড়ি-ঘর পুড়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে গ্রাম বসিয়েছে। এখানে চটি কিংবা ডাকবাংলো নেই। পি.ডব্লিউ. ডি.-র একখানা মামুলী বাড়ি রয়েছে। তারও ঘরদোরের অবস্থা ভয়াবহ। কড়িকাঠের চেহারা দেখলে মনে হয় যে, ওৎ পেতে আছে মানুষ শিকারের আশায়। কবে যে কার ঘাড়ে পড়বে বলা যায় না। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক শিথিলতার নমুনা!

নমুনা আরও অনেক কিছুই দেওয়া যায়। কিন্তু কি লাভ? সরকারী লোক গ্রামে এলেই সাড়া পড়ে যায়। একটা অলিখিত আইন আছে, গাঁয়ের মোড়লকে সরকারী

অতিথির আতিথ্যের জোগাড় করতে হবে। বলা বাহুল্য অতিথিসেবায় জোর-জুলুম কিছুটা হবেই। অনেকটা বিহারের জমিদারদের মহাল দেখতে যাওয়ার মতো। কার ঘরে তালো দুধ-ঘি আছে—আনো নজরানা। কার বাড়িতে মুরগীটা পাঁঠাটা আছে, মেরে নিয়ে এসো তেট। মদ নিয়ে এসো, পারলে মেয়েমানুষ জোগার কর। তারপর বেগারী মুটের ব্যবস্থা তো আছেই। এই সব সরকারী কর্মচারীরা সঙ্গে অনেক লটবহর নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। বেগারীদের কখনও-সখনও দয়া করে দু-চার আনা দিলেন তো দিলেন, নইলে তাও জুটল না। এ সব ব্যবস্থা আর কতদিন চলবে, তাই ভাবি।

পুণ্যসাগর সঙ্গে থেকে থেকে আমার মেজাজ খানিকটা বুঝে নিয়েছে। সে নিজেই খাবার জোগাড় করে নিল। তাকে বলেছিলাম বেগারীদের যেন দু-আনার জায়গায় তিন আনা করে দেওয়া হয়। বেগারী ব্যবস্থার বদলে সরকারী বাংলোগুলোয় মাইনে করা কুলি রাখা উচিত। যেমন পোস্টাফিসে পিয়ন রাখা হয়।

রারঙ গ্রামটা অনেক দিনের পুরনো। তোট ভাষায় এ গ্রামের নাম 'শা'। এদিককার প্রায় সব গ্রামেরই এই রকম দুটো-তিনটে করে পোশাকি এবং আটপৌরে নাম আছে। ইংরেজদের ম্যাপে কাগজে সে সব নাম আবার যথেচ্ছ বিকৃত করে লেখা হয়েছে। এটা অন্যায়, বিদেশীরা কোন অধিকারে জায়গার স্থানীয় নাম বদলায়? ভৌগোলিক নামগুলো যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখা উচিত। রারঙ গ্রামটি পুরনো হলে কি হবে, গ্রামে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। আছে এক আদ্যিকালের পাথর। তার বিচিত্র ইতিহাস। গল্পটা জমাটি—খুঁজলে তার মধ্যে ইতিহাসের মাল-মশলা পাওয়া যাবে।

একাদশ শতাব্দীতে রত্নভদ্র বলে একজন ভিক্ষু ছিলেন। প্রাচীন ভাষা থেকে অনুবাদ করায় তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। শতদ্রু নদীর ধারে রিব্বায় তিনি একটা সুন্দর বিহার (বৌদ্ধ মঠ) তৈরি করান। শতদ্রুর ওপারে রিব্বা, এপারে রারঙ। রিব্বার লোকে একবার চক্রান্ত করে রত্নভদ্রকে শেষ করে দেবার মতলব করল। বুঝতে পেরে রত্নভদ্র তাঁর বিহারের ছাত থেকে এমন লাফ মারলেন যে একেবারে রারঙয়ে এসে পড়লেন! তাঁর শরীরের চাপে একটা পাথরের বুকে বিরাট গর্ত হয়ে গেলো। রারঙবাসীরা আজও সেই পাথরটা সগর্বে লোককে দেখায়। —রত্নভদ্রের গল্প শুনছিলাম রারঙয়ের দেবমন্দিরের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে। যে বার রারঙয়ে আগুন লাগে, দেবমন্দিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল খুব। তাই ভাবছিলাম, নিজেকেও বাঁচাতে পারে না এমনই কপাল পোড়া দেবতা! হঠাৎ পায়ের আঙুলে টান ধরল। দেখি একটা শিরা বেয়াড়া রকম টেনে ধরেছে। দেবতা বোধহয় মুচকি হাসছেন—দেখ দেবতার মহিমা। আর গাল দেবে? দেবতার মহিমা আর রাস্তার অসুবিধেয় মিলে আমায় কতকটা কাবু করে এনেছে।

তহশীলদার সায়েব লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন, জংগীর রাস্তায় পায়ে হেঁটে যাবার মতো মহাপাতকের কাজ যেন না করি। সঙ্গে নম্বরদারের ঘোড়া দিয়ে দিলেন। আমার ভবঘুরেগিরির দিব্যি যেন ঘোড়ায় চড়ে যাই। খোঁড়া হতে যেটুকু বাকি ছিল, তাঁর ঘোড়া দেখেই সেটুকু সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। নিরুপায় হয়ে ঘোড়ায় চড়লাম। আজকের যাত্রাপথ মাত্র সাত মাইল। সুন্দর এই পথটুকু। পথের দু'পাশে ঘন দেবদারু আর ন্যোজার বন। নিভৃত সড়কে পায়ের ঠুক্-ঠুক্। আর কখনো কখনো দু-

একটা কাঠ-ঠোক্‌রার ঠক্‌ঠক এ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মনে হয় ঘুমিয়ে রয়েছি। পথে চলতে চলতেই একটা ছোট্ট নালা পেরোলাম। ঘোড়ার হাঁটু ভিজল আমার পায়ের পাতাও নয়। নিচে একটু দূরে 'অক্‌পা' গ্রাম। দেখলে মায়া হয়, কোথাও একটু সবুজের চিহ্ন নেই, গাছ শুক্‌নো, পাতা শুক্‌নো—রুক্ষ উষর ক্ষেত। একটা সরু সুতোর মতো রূপালি জলের ধারা বয়ে চলেছে। গ্রামবাসীর ঐটুকুই যা ভরসা।

দুপুর নাগাদ জংগী ডাকবাংলোয় পৌঁছে গেলাম। চমৎকার খাসা বাংলো অথচ যত্নের অভাবে, নষ্ট হতে বসেছে। কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ তদারকীর জন্যে চৌকিদার রয়েছে। তার মাস মাইনের অঙ্কও সন্তোষজনক। বাংলোর আউট-হাউস্‌টার তো ভেঙে পড়ার অবস্থা কে-বা দেখে, কে-বা শোনে। ছিল যখন শিকার-পাগল সাহেবরা, তখন সবই ঠিক ছিল। চৌকিদার সায়েবের দর্শন দুর্লভ। বাড়ির কাজ করেই ফুরসভ নেই তাঁর। বেশ খানিক বাদে দেখা দিলেন। ধীরে-সুস্থে বাংলোর দরজা খোলা হলো। পুণ্যসাগর রান্নাবান্নার জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চৌকিদার লোকটা এমনিতে মন্দ নয়, বেশ চালাক-চতুর! ওর ধারণা হয়েছে যে, আমি এখানে এসেছি কিন্নর দেশের উপকার করতে। সরকারও না-কি আমার কথা খুব মানেন। সে আমার প্রতি অযথা ভক্তিমান হয়ে উঠল। সন্ধ্যে নাগাদ সে আমায় নিয়ে জংগী গ্রামে বেরিয়ে পড়ল। যেখানে যা-কিছু আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালে। জংগীর জমি উর্বর। কিন্তু সে তুলনায় জলের ব্যবস্থা খুবই অপ্রচুর। ১৯১৮-১৯ সালের প্রবল ভূমিকম্পে এখানকার একটা 'চশমা' (জলের প্রস্রবণ) লোপ পেয়েছে। নদী-নালার জল, সেচের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। গত বছর হিমপ্রপাতের ফলে নদী-নালার জল বেড়েছে তাই, নইলে বেশ জলাভাব দেকা দিত। চৌকিদার বললেন, এদিককার জমি খুব সরেস, এ দিকের পাহাড়ে যথেষ্ট গাছপালা, গ্লেশিয়ারের আশঙ্কা নেই। কিন্তু এক জলের অসুবিধাই মারাত্মক। বললাম, দেবতার দোরে ধর্ণা দিয়ে দেখলে হয় না? চৌকিদার বললে, দেবতার সে ক্ষমতা নেই। তার কথায় বুঝলাম, লিপ্পার খদ্দ থেকে খাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা করা গেলে এ সমস্যা মেটবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সরকার ছাড়া সে ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আর কার আছে? গ্রামের লোকের তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অথচ সত্যিই সেচের সুবন্দোবস্ত যদি কোনোদিন হয় তবে এ গ্রামের তাক-লাগনো চেহারা হতে পারে। জলাভাবের মধ্যেও ক্ষেত-খামারের বেশ সমৃদ্ধি নজরে পড়ে। আখরোট, খোবানি, নাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, চুলী, বেমী, চালগোজা ইত্যাদি মেওয়ার ফসল অফুরন্ত হতে পারে একদিন। কিন্তু রাধা নাচবে আর ন'মণ তেল পুড়বে কি? কুম্ভকর্ণের নিদ্রা কি ভাঙবে!

শতদ্রুর তট থেকে জংগী অনেক উঁচুতে। সামনেই একটা ছোট্ট নদী। সেটা পার হলেই মোরাং গ্রাম। সে গ্রামের নিচের দিকে একটা প্রাচীন দুর্গ, খানিকটা পাথরের টিবি। লোকে ওটাকে পাণ্ডবদের দুর্গ নাম দিয়েছে। বলে পাণ্ডবরা বানিয়েছে। পাহাড় থেকে একটা ঝরণা বেরিয়ে অনেকটা নালার আকার নিয়েছে। সেটা আবার একটা পাহাড়কে বেড় দিয়ে দিয়ে শতদ্রুর কোলে নেমে গেছে। এর সঙ্গেও পাণ্ডব-ঘটিত কি একটা কাহিনী জড়িয়ে আছে।

জংগীও বেশ প্রাচীন গ্রাম। তবে দর্শনীয় বলতে এক নির্জন গুহায় কতকগুলো মাটির স্তূপ। স্তূপগুলোর গায়ে কয়েকটা শিলালিপি আবিষ্কার করলাম। কয়েকটা তিব্বতী ভাষায় লেখা, একটায় 'কুটিলাক্ষর' রয়েছে দেখলাম। 'কুটিলাক্ষর' লিপিমালা একাদশ শতকে ব্যবহৃত হতো। মনে হয়, একাদশ শতাব্দীর ওদিকে এখানে হয়ত কোনো বৌদ্ধ বিহার ছিল।

এইসব পুরনো গ্রামগুলোর বুকে কত সুপ্রাচীন, রহস্য, কত ঐতিহাসিক সম্পদ লুকিয়ে আছে—কে বলতে পারে? যে দিন বিদ্যা আর ধনের দুই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আর লক্ষ্মী এই পাহাড়ী গাঁয়ে বাসা বাঁধবেন, সে দিন হয়ত সেসব সম্পদ, সে-সব রহস্য জানা যাবে, কিন্তু ততদিন কি বাঁচব?

প্রাগৈতিহাসিক সমাধি

আজ আমার নতুন পথে প্রথম পদক্ষেপ করার পালা। তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়ক ছেড়ে আজ থেকে পায়ে চলার পাগডণ্ডী সম্বল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে, যাত্রাকালে দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ কিন্তু আমার শাস্তরে বহুদিনকার প্রথা—সকাল বেলায় দুধ রুটি খেয়ে যাত্রারম্ভ করা। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো।

আমার ঘোড়াটা ঘোড়া নয়, ঘোড়ী। বেচারী অশ্বিনী খুবই শান্তশিষ্ট ঠুক্-ঠুক্ করে চলেছে, কোনো প্রতিবাদ করে না। করে না তাই রক্ষে, নইলে বেঁকে বসলেই মুশকিল হতো। এ যা রাস্তা! দু'টো রামছাগল পাশাপাশি চলতে পারে না তার ওপর ভয়ানক রকম খাড়াই। কোথাও কোথাও পথ-ঘাটে তৃণগুল্ম কিছুরই চিহ্ন নেই। স্রেফ পাথর...আর পাথর। রুক্ষ, মসৃণ, ঢালু, এবড়ো-খেবড়ো নানা রকম পাথরের ওপর দিয়ে পথ চলা। ঘোড়া যদি একবার পিছলে যায় তবে আর রেহাই নেই। আমার হাড়গুলো এই হিমালয়ের অদৃশ্য গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে যাবে, আমার আত্মা প্রেত হয়ে কিন্নর দেশের দেবদারু বনে ঘুরে বেড়াবে। এটা তো তবু ভালো পরিণতি। কিন্তু যদি হাড়গোড়-ভাঙা 'দ' হয়ে দুনিয়ার বোঝা হয়ে বেঁচে থাকি?—না, সত্যিই এ পথে আসা ভুল হয়েছে। কিন্তু এখন সে কথা ভেবে আর লাভ কি? আমার হঠকারিতা আর গোঁয়ার্তুমিই আমার অঘটনের জন্য দায়ী, আর কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। ঘোড়া ঠুক্-ঠুক্ করে এগিয়ে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই যাচ্ছি। এক একটা বিপজ্জনক মরণঘাঁটি পেরিয়ে যাই আর আশায় উল্লাসে বুক ভরে ওঠে। আঃ বেঁচে থাকা কি আরামের!

বাইশ বছর আগের কথা মনে পড়ে। সে বারেও লাদাখ থেকে ফেরার পথে লিপ্পায় আসার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। কিন্তু পথের দুর্গমতার কথা শুনে এ পথে পা বাড়াইনি। অথচ তখন কোমরে জোর ছিল, দেহে মনে তারুণ্যের তাজা জোয়ার ছিল। লিপ্পার জ্যোতিষী দেবারামের কাছে যেতে পারলে তখন লাভও হতো কারণ তিব্বত আর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দেবারামের ছিল গভীর জ্ঞান। হেমিস্ লামার পরিচিতি-পত্র ছিল আমার কাছে, তবুও যাইনি। তখন কি বেশী বুদ্ধিমান ছিলাম—না, এখনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে, কে জানে!

এ রাস্তায় ভয়াবহ রকমের হিমপ্রপাত হয়েছিল তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এত দেবদারু গাছ হিমঝঞ্ঝায় কাৎ হয়েছিল যে, বন অনেক জায়গায় ফাঁকা। আর সেইসব গাছ একটা দুটো করে গ্রামবাসীর সকলের ঘরেই চালান গেছে। সম্বৎসরের জ্বালানি হয়েছে অনেকের। গতকাল ডায়েরীর পাতায় লিখেছিলাম যে, এখানে দেখবার মতো কিছু নেই। আজ দেখছি, অনেক কিছুই আছে। এখানে হিমপ্রপাতের ফলে অনেক সুবিধে হয়েছে। ঠাণ্ডা এখানে বেশী। উঁচু জায়গা, বরফ গলতে দেরি আছে। ধীরে ধীরে বরফ-গলা জলে ক্ষেত-নালা ভরে যাবে। চাষের পক্ষে তখন ভারী সুবিধে। জংগীর ক'জন চাষীও এখানে ক্ষেত করেছে।

আগের ঘোড়টা এখানে এসে ছেড়ে দিয়েছি। স্থানীয় এক তরুণ তার ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে চলেছে যদি প্রয়োজনে লাগে। পথের ধারে দেবদারুর ছায়ায় একটু বসলাম। ব্যাগ থেকে গ্লুকোজ বার করে দু-বাটি জল দিয়ে খেলাম। সামনেই আরেকটা পাহাড়ী বাঁক। সেটা পার হতেই সামনে লিপ্পা গ্রাম দেখা গেলো। আমার সুবিধের জন্যে একটা নয় দুটো সরকারী চাপরাসীকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই মহাপ্রভুদের কারও দর্শন পাওয়া গেলো না। আমি লোকটা কোথায় যে থাকব, সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করার দরকার বোধ করেননি তাঁরা। সন্ধ্যের আগেই গ্রামের মুখে টিকরীর ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর দম নিয়ে আবার রওনা হলাম গ্রামের দিকে। পুণ্যসাগর একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গাঁয়ের ভেতর চলে গেলো।

খানিকক্ষণ পরে দেখি পুণ্যসাগরের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক-লামা সোনম্। তাঁর পেছনে আরও একজন লোক। ওঁরা আসছেন আমায় নিয়ে যেতে। গাঁয়ের ভেতরেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা উৎরাই ভাঙতে লাগলাম। সামনে শতদ্রুর একটি বড়-সড় ধারা। সেটি পার হলে একটা পুরনো স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। আরও কিছুদূর গিয়ে একটা ঝিরঝিরে ছোট্ট নদী। তার ওপরেই লিপ্পা গ্রাম।

একরাশ মন-জুড়নো সবুজ দিয়ে গ্রামের সীমানা শুরু হয়েছে—লিপ্পা গাঁয়ের ক্ষেত-খামার। ছোট নদীটাতে কয়েকটা পানচাক্কি দেখলাম। সামনের টিলার মাথায় একটা বিহার। আমার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে সেখানেই। সেই উঁচু পাহাড়ের মাথায় হেঁটে ওঠবার চিন্তা করলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। সোনম্ লামা বিবেচক লোক। একটা ঘোড়া রেডি করে রেখেছেন। আমায় সবিনয়ে অনুরোধ জানালেন, 'একটু কষ্ট করে ঘোড়ায় চড়ুন। অনেকটা উঁচুতে কিনা।'—আহা, এমন করে ক'টা লোক বলে গো?

আগে বলেছি এটা একটা টিলা। কিন্তু এখন করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। বয়স হয়েছে, চোখের দোষে বুঝতে পারিনি। এটি মোটেই টিলা নয়, বেশ রীতিমতো পাহাড়। ওঃ এখানকার বাচ্চাগুলোও কি অসীম সাহসী! এই খাড়া চড়াই দৌড়ে উঠছে, দৌড়ে নামছে, একটু ভয়ডর নেই। মনে হয়, এরা বাচ্চাদের গৌরীশঙ্কর অভিযানের ট্রেনিং দেয়। দুর্গা নাম জপতে জপতে ঘোড়ার পিঠে বসেই বিহারের সিংহদ্বারে পৌঁছে গেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। হঠাৎ নিচের দিকে সোরগোল শুনে বেরিয়ে দেখি, একদল লোক শোভাযাত্রা করে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের পিঠের ওপর

একখানা করে ভারী বই। খুব গানবাজনা করে চলেছে। মেয়ে-পুরুষ সবাই নাচছে, গাইছে। পিঠের ভারী বইগুলো পাঁজির আকারে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওগুলো কঞ্জুরের পুথি। কঞ্জুরের ইতিহাস আছে একটু। সেটাই বলছি—

লামা সোনম্ ডুবগ্যার পরলোকগত পিতা দেবারাম লামার উদ্যোগেই এখানকার নবনির্মিত বুদ্ধ বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোনমের জন্মের পরে পরেই সোনমের মায়ের মৃত্যু হয়। শোকার্ত দেবারাম বিবাগী হয়ে যান। তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি তিব্বতে পৌছান। সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু আর বিয়ে-থা করলেন না। তিব্বতে থাকাকালীন জ্যোতিষ-চর্চাটা দেবারাম ভালোভাবেই করেছিলেন। তখনকার দিনে লাসায় জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা খুব হতো। লাসার রাজজ্যোতিষী পাঁজি লিখতেন। পাঁজির এক একটা পাতা লেখা হতো আর কাঠের মিস্ত্রী আখরোট কাঠের ফলকের ওপর সেই পাতার লেখাগুলি উল্টো করে খোদাই করত। সম্পূর্ণ পঞ্জিকাখানি এইভাবে খোদাই হয়ে যাবার পর—কালি মাখাও আর ছেপে নাও। দেবারাম কাশীতে লিথোপ্রিন্টিং পদ্ধতি দেখে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হলো তিনি নিজে একখানা পাঁজি লিখবেন। বেশ পরিশ্রম করে নতুন ভোট ভাষায় একখানি পাঁজি হাতে লিখে লিথো পদ্ধতিতে ছাপিয়ে নিলেন। লাসার পঞ্জিকায় হাতে তৈরি দামী কাগজ লাগত, খোদাই করবার কাঠ লাগত—সে তুলনায় লিথোয় ছাপার খরচ অনেক কম। তবে মুদ্রণ-ব্যবস্থা যতই সস্তা হোক, প্রকাশন ব্যবস্থায় লাসার মতো যখন যত খুশি তত ছাপাবার স্বাধীনতা দেবারামের ছিল না। দিল্লীর মতো কোনো শহরের প্রেস থেকে একেবারেই সব কপি ছাপিয়ে ফেলতে হতো তাঁকে। তা সে বিক্রী হোক বা না হোক। বিক্রী অবশ্য হয়েই যেত, পড়ে থাকত না কারণ তাঁর পাঁজি দামে সস্তা। লাসার পঞ্জিকার অর্দ্ধেক দামে তিনি পাঁজি বাজারে ছাড়তেন। পঞ্জিকার মধ্যে জ্যোতিষসংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব আলোচনাও তিনি করতেন। কাজেই তাঁর গ্রাহক-সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। এ অঞ্চলে ডাক-ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়, তাই দেবারাম নিজের লোক দিয়ে শিলিগুড়ি-কালিম্পংয়ের পথে, লাসা, টশিলুম্পো, গ্যাঙচী ইত্যাদি নানা জায়গায় পঞ্জিকা বেচতে পাঠাতেন। কয়েক বছরের মধ্যেই হু-হু করে তাঁর পাঁজির কাটতি হতে লাগল। বেশ কিছু পয়সা করলেন লামা দেবারাম। আজ দেবারাম নেই, কিন্তু তাঁর লিখিত পাঁজি আজও ভোট ভাষা-ভাষীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

দেবারাম মারা গেলে সোনম্ বাবার কাজ হাতে তুলে নিলেন। এখন পাঁজির চাহিদা এত বেশী যে সোনম্ এ কাজ একা সামলাতে পারেন না। একজন পরিবেশককে ঠিকা দেওয়া হয়েছে, তিনি প্রকাশক ও বিক্রেতা। এই গেলো পঞ্জিকার কথা। পঞ্জিকার ব্যবসায়ে দেবারামের যা কিছু লাভ হলো, তাই দিয়ে তিনি বৌদ্ধ বিহার স্থাপনায় হাত দিলেন। দেবারাম ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু (লামা) এবং জ্যোতিষী। কাজেই এ অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। বিহার প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি অনেকেরই কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য পেলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবার আগেই দেবারাম চোখ বুঁজলেন। ছেলে সোনমের হয়ত বাপের মতো যোগ্যতা নেই কিন্তু শ্রদ্ধা আছে। দেবারামের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করায় তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। ভোট ভাষা-ভাষী

না হয়েও সোনম্‌ ভোট ভাষাটা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। লাসার মঠ থেকে অনেক খরচ করে, অনেক পরিশ্রম করে তিনি কয়েক শত কপি কঞ্জুরের পুথি আনালেন। এ পুথিগুলি হাল আমলের সহজবোধ্য তিব্বতী ভাষায় লেখা। সোনম্‌ এই পুথির যথারীতি প্রচার আরম্ভ করলেন। কঞ্জুর ও তঞ্জুর নামের এই বৌদ্ধ পুথিগুলি আগের দিনে দুর্বোধ্য প্রাচীন লিপিতে লেখা হতো। বুদ্ধিমান পিতাপুত্র সেই প্রাচীন লিপির প্রতি কোনো দুর্বলতা না দেখিয়ে এই যে নতুন সহজ লিপির গ্রন্থ আনালেন এতেই তাঁদের সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি যখন দ্বিতীয়বার তিব্বত যাই, সেখান থেকেই এই নতুন কঞ্জুর-তঞ্জুর পুথির কয়েকখানি কপি নিয়ে আসি। কিন্তু এমনি বরাত যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দরজায় ঘুরেও সেটা ছাপবার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। অফিসারদের ধরাধরি করলাম, আমার বন্ধু জয়সবালজীও চেষ্টা করলেন। কথায় বলে, 'ধোবী বসিকে কা করে দিগম্বরকে গাঁও।' গাঁয়ে সবাই দিগম্বর, ধোপা কি করবে? এও হয়েছে তাই। বই যে ছাপবে—পড়বে কে? শেষে কলকাতা ইউনিভার্সিটিকে লিখতেই ওরা দৌড়ে এল। ওখানে জ্ঞানের-চর্চা হয়, ওরা এ সব পুথির কদর জানে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এসে কঞ্জুরের কপি নিয়ে গেলেন। আমার মনও আশ্বস্ত হলো। এত আশা করে পুথিখানা এনেছিলাম কারও কাজে না লাগলে মনস্তাপের কারণ হতো। সংক্ষেপে এই হলো কঞ্জুর-তঞ্জুরের ইতিকথা।

বাজনার আওয়াজ পেয়েই আমি একদৌড়ে আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিচে বিহারের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে একটা মেলার মতো হয়েছে, অনেক নরনারীর ভিড়। বেশীরভাগই তরুণ-তরুণী। সকলেই বেশ সুসজ্জিত, প্রায় সবারই মাথায় কানঢাকা টুপি। টুপিতে লাল মখমলের পাড় বসানো। টুপির কানে শ্বেতপুষ্পের গুচ্ছ। ফুলটা এরা সবাই বেশ ভালোবাসে। কিন্নর কিন্নরীদের মেলা, তায় রঙীন বয়েসের যুবক যবতীদের ভিড়—সেখানে ফুলের বাহার থাকবে না, এ হতেই পারে না—অসম্ভব ব্যাপার। কঞ্জুরের মেলা সচল মেলা। শোভাযাত্রা মন্দির থেকে বেরিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করে আবার এসে মন্দিরে ঢুকবে। একবার এ গ্রামে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। গাঁয়ের বাইরের এক জায়গায় একটা ছোট মন্দিরে পুরনো পুথি রাখা ছিল। সেখানো বেঁচে গিয়েছিল, পোড়েনি। দেবালয়ের মহিমা! শোভাযাত্রা থামিয়ে একটা ফটো নিলাম।

সন্ধ্যের মুখে বেরোলাম। লিপ্পা গ্রামের নিচে কঞ্জুর-লাখং। সড়ক চলে গেছে সোজা পাতাল বরাবর। দু-এক জায়গায় শুধু পা দিয়ে হাঁটা চলে না। চার হাত-পায়ে হাঁটতে হয়। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই করলাম। তখন দূর থেকে আমায় কেউ দেখলে মনে করত একটা বড় সাইজের পাঁঠা। সাধে কি এ পথকে অজপথ বলা হয়? কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্যি।

কিন্নরদেশে যদি আর একটু বাইরের আলো আসত, এরা কিছুটা লেখাপড়া শিখে যদি বাইরের খবর রাখত, আর জীবনযাত্রাটা যদি খানিকটা সহজ স্বচ্ছন্দ হতো তাহলে আর বাইরের লোককে পর্বত-বিজয় করতে হতো না। প্রতি বছরেই এরা এভারেষ্ট অভিযানের জয়মাল্য পেত। ভারতের পর্বত অভিযাত্রী দলে কিন্নরদের কখনও নেওয়া

হয়েছে বলে শুনিনি। কিন্নররা নৃত্যগীতে পটু বলে প্রসিদ্ধি আছে। কাজে তো দেখলাম বিপরীত। মেলায় এদের ছেলেরা যে নাচের নমুনা দেখালে তাতে নৃত্যকলার 'অ-আ-ক-খ' জ্ঞানও ওদের নেই বুঝলাম। নৃত্য মানে কলা ও ব্যায়ামের সমন্বয়। সে জিনিস নিয়মিত শিক্ষার বিষয়। খানিকক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তারপর গুটিগুটি ছাতের ওপরে গিয়ে একখানি চেয়ারে বসলাম।

একটু দেরি হয়ে গেছে আসতে। মেলা অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। যজ্ঞও হয়ে গেছে। এ বার প্রসাদ বাঁটোয়ারার পালা। প্রসাদও অনিভব। এক একটা আধপোয়া ওজনের ছাতুর নাড়ু আর কলসী কলসী মদ। উৎসবের দিনে মেয়ে পুরুষ সবাই ভূরিভোজন করে আকণ্ঠ মদ খায়। পুরুষদের মধ্যে অনেকে বেসামাল হয়ে পড়ে লোক হাসায়। মেয়েরা কিন্তু দেখেছি তেমন বেচাল হয় না। নারীসুলভ শালীনতা বেশ বজায় রেখেই চলে।

মেলায় লোক হয়েছে খুব। সব্বাই ঘর খালি করে এসেছে। তরুণেরা বৌ নিয়ে, মায়েরা ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসেছে। কারোর ঘরে যদি চোর ঢোকে তো চোর বেচারাকে খালি হাতেই ফিরতে হবে। এ রতি সোনা কেউ ঘরে রেখে আসেনি, সব অঙ্গে চড়িয়েছে। সোনা অবশ্য কথার কথা বললাম। জনাকয়েক বড়ঘরের মেয়েরা ছাড়া, কানে গলায় সোনার গয়না কেউই পরেনি। সব গয়নাই রূপোর। কানে একপো ওজনের ভারী রূপোর বালিয়া, তাতে ফুলপাতা নক্সার বাহার। গলায় হাঁসুলি আর পৈঁছেহার। বাঁ কাঁধের নিচে হাতের মুঠো ভরে যায় সাইজের ময়ূর-ব্রোচ দিয়ে পশমী শাড়ি আটকে রাখা হয়েছে। পিঠের ওপর সাপের মতো হিলহিলে বিনুনি কোমর ছাড়িয়ে নিতম্ব ছুঁয়ে দুলছে। বেণী পাতলা লাল রেশমী ফিতেয় বাঁধা। সুগঠিত দুটি স্তন রূপোর ঘুঙুর দিয়ে জড়ানো। চলতে ফিরতে ঝুনঝুন করে বাজছে। এদের শাড়ি পরার ধরন আলাদা। শাড়ির কোঁচা এরা সামনে না দিয়ে পেছনে দেয়। পেছনের এই অংশটুকুতে স্থানীয় তাঁতিরা নানা রকম কারুকার্য করে।

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছাতের একদিকে চেয়ার পেতে বসেছিলেন। তাঁদের গলায়, কানে, হাতে রূপোর বদলে সোনার অলঙ্কার। জেলার সাহেবের বৌয়ের নাকে একটা চেটা নাকছাবি, তাতে প্রায় চার আনার সোনা। সোনা দিয়ে মানুষের অবস্থা ও পদমর্যাদার বিচার হয়। কিন্নরসমাজও ভারতবর্ষের এই প্রচলিত রীতির বাইরে নয়। তাই মেলায় উৎসবে লোক সমাবেশে সোনা গায়ে দিয়ে বড়লোকমি জাহির করতে চাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এখানকার বড়ঘরের ছেলে-মেয়েদের মুখে সাধারণ কিন্নরদের মতো মোঙ্গলীয় ছাপ বিশেষ পাওয়া যায় না। তার কারণ, তাদের মায়েরা অনেকেই অ-কিন্নরভাষী কনেৎ ঘরের মেয়ে। এটাও অর্থ-বৈভবের নমুনা। পয়সা কড়ি বেশী থাকলে লোকে অন্য সমাজের সুন্দরী মেয়ে ঘরে নিয়ে আসে।

লিপ্পা খদ্দের ওপরে, চার দিনের পথ পার হলেই তিব্বত-সীমান্ত। সেখানকার লোক খাস তিব্বতী ভাষায় কথা বলে। তাদের মুখচোখের চেহারায় স্পষ্ট তিব্বতী ছাপ।

মদ খাওয়া এবং মদ তৈরি করার ব্যাপারে এখানে কোনো কড়াকড়ি নেই। বরং সমাজের সকল স্তরেই এর অবাধ প্রচলন। গান্ধীর নির্দেশে যখন সারাদেশে মাদক-

বর্জন আন্দোলন চলছে তখন এখানেও তার ঢেউ লেগেছিল একটু। তবে পরিণামে কৌতুক ছাড়া আর কিছুই হয়নি। মনে পড়ছে, গাজীপুরের এক আশ্রমের মোহন্তের কথা। আশ্রমের উঠোনে তিনি গাঁজার চাষ করেছিলেন। জিজ্ঞেস করাতে জবাব দিয়েছিলেন, "মহাত্মাজী কিনে খেতে মানা করেছেন। তাই 'স্বাবলম্বন' করছি।..."

আমাকে এখানে অনেকে অনুরোধ করেছেন, 'একটুখানি চলুক না' কিন্তু আমার চলে না। চলে না বলে যে আমি অন্যদের নিন্দে-মন্দ করব, কি মনে-মনে তাদের হিংসে করব—এমন বান্দা নই। ভাবনা আমায় নিয়ে নয়, পুণ্যসাগরের জন্যেই একটু উৎকণ্ঠিত ছিলাম। বেচারা আমার পাল্লায় পড়ে রোজ দু-ঘণ্টা করে আমার নাস্তিক বোলচাল শুনছে। তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে সকাল-সন্ধ্যে নিজের মনে রাজ্যের মন্ত্র আউড়ে পাপক্ষয় করতে হয়। এখন আমার সঙ্গজনিত পাপ কাটাতে গিয়ে যদি একটু অধিক মাত্রায় চরণামৃত সেবন করে থাকে, তবেই চিত্তির! আমি তার ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তার সুরাসক্তিতেও আমার কোনো নৈতিক আপত্তি নেই। কিন্তু ভাবের ঘোরে যদি তার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তা'হলে রাত্তিরে আর রান্না করতে হবে না! আমি রীতিমতো ভাবনায় পড়লাম।

এদিকে ক্রমেই মঞ্চের পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে। সূর্য ওপাশের পাহাড় ছুঁয়ে পাটে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন-চারজন করে প্রসাদসেবীর দল-বৃদ্ধি করতে লেগে গেছে। সন্ধ্যারতির লগ্নে, এক একজন ভক্ত আসছে আর ধ্যানমগ্ন লামা সোনমের আসনের কাছে একটি করে প্রণাম করে ভেতর দিকে যাচ্ছে। আকাশের রঙ লাল, ভক্তদের মুখচোখে তারই ঘোর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভক্তদের আসা-যাওয়া বন্ধ হলো। যখন আর প্রণাম করতে কেউ আসছে না, তখন সোনম্ লামা তাঁর আসন ছেড়ে উঠে এলেন। ভক্তবাহকেরা সবাই মিলে কঞ্জুর পুথিগুলো এক-এক করে মন্দির কক্ষে পৌঁছে দিলো। এদিকে বাজনার ধুন বেড়েই চলেছে। খানিক পরেই নাচের আসর জমে উঠল। উপস্থিত সবাই সেই নাচে অংশগ্রহণ করল। একদিকে ছেলেরা অন্যদিকে মেয়েরা। তাদের সবারই পেটে অল্পবিস্তর কারণবারি। কাজেই 'নাচ' জমতে দেরি হলো না। অবশ্য এদের নাচে নৃত্য-কৌশলের প্রয়োজন বিশেষ নেই—মেতে উঠতে পারলেই হলো। নাচলেন না কেবল জেলার-গিন্নী এবং কয়েকজন বড় ঘরের মেয়ে। তাঁরা বোধহয় আমায় দেখে লজ্জা পেলেন। আমি কিন্তু নিজে পারলে নাচতে নেমে যেতাম, পারলাম না বয়সের জন্যেই। যাঁরা ভবিষ্যতে ভবঘুরে হবেন বলে ঠিক করেছেন, তাঁরা নাচটা অতি অবশ্য শিখে নেবেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে, বিচিত্র সব সমাজে মিশতে হলে নাচের মতো এমন মোক্ষম মাধ্যম আর পাবেন না। সে সাঁওতালী নাচই হোক, আর মণিপুরী নৃত্য বা ভাংড়া বা গরবা—যাইহোক না কেন।

এবারে অনেক দিন পরে এমন একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সুষ্ঠু উৎসব দেখা গেলো। অনেকেই বললেন কথাটা। তার কারণও আছে। গত ক'বছর ভালো বৃষ্টি হয়নি, বরফ পড়েনি। চাষবাসের অবস্থা কাহিল, ফূর্তি লোকের মনে আসবে কোত্থেকে! মনের জোরটা আসা চাই তো। গত বছরের প্রবল হিমপ্রপাতে এ বছর নদী-নালা খাল সব ভরে আছে। চাষের ক্ষেতে আগের বছরগুলোর মতো সবুজের দৈন্য ঘুচেছে। শুকনো

খন্দে আবার জোয়ার এসেছে। হলুদ-হয়ে-যাওয়া খোবানীর গাছগুলো আবার চিকন সবুজ পাতায় ভরে গেছে। নাচ-গান, আমোদ আহ্লাদ করবার এই তো সময়।

আর একটা দিন লিপ্পায় থাকব। জানি, বেশী কিছু দেখার আশা নেই। তবুও থাকতে হবে কারণ আমার বিশ্রাম চাই। সামনেই আসছে ভয়াবহ রকম বিপজ্জনক পথ, সে পথের চেহারা দুঃস্বপ্নের মতো চোখে আসছ। হাঁটার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে। তাই বিশ্রাম নেওয়া দরকার। খবর দিয়ে পুণ্যসাগরকে আনালাম। কোথায় ছিল কে জানে। বললাম, 'কি হে! খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?'

ছাব্বিশে জুন। তারিখটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। লিপ্পা গ্রামে যে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক (অর্থাৎ প্রাক্‌বুদ্ধ) যুগের চিহ্ন দেখতে পাব তা আগে কল্পনাও করিনি। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত বিবরণ লিখব। কিন্নর দেশ আজ আমার চোখে নতুন হয়ে দেখা দিলো। একা আমি কেন, এ জিনিস কিন্নরভূমিতে কেউই আগে দেখেনি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে লামার সঙ্গে গল্প করছি। বৌদ্ধবিহার নিয়ে নানান কথা হচ্ছে। লামা বললে, 'আমার এক সম্বন্ধী থাকে এ গ্রামের ওপরে। সেখানে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটা বিহার করবে বলে সে জমি তৈরি করছে। ভিত খুঁড়তে গিয়ে সেখানে হাড় বেরিয়েছে।'

হাড়! আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। 'হাড় পেল কোথায়! কি রকম হাড়?'

সোনম্ বললে, 'মুসলমানদের কবর ছিল হয়ত কোনো কালে।'

'এখানে মুসলমান কোথায়, তার কবর পেলে? আচ্ছা হাড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি? বাসনপত্তর?'

'হ্যাঁ, হাড়ের সঙ্গে ক'খানা বাসনও তো পাওয়া গিয়েছিল বটে। তা এ সব আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জানে।'

লামার স্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হলো। সে এসে বললে, 'সে তো আজকের কথা নয়, আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। আমরা তখন ছোট। তবে মনে আছে, খানকয়েক বাসনপত্র পাওয়া গিয়েছিল!'

...ছুটলাম জায়গাটা দেখতে। শুনলাম আশপাশের ক'জনের ক্ষেতে লাঙল দেবার সময়ে ঐ রকম হাড় অনেক বেরিয়েছে। শুধু বিচ্ছিন্ন হাড় নয়, আস্ত নরকঙ্কালও না-কি পাওয়া গেছে। একটা ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে গেলাম। সেখানেও শুনলাম সেই একই কাহিনী। নমুনা দেখতে চাইলাম। আমাকে ক্ষেতের মালিক পঞ্জীরাম নিয়ে গেলো তার ঘরের পাশে। সেখানে স্তূপাকার মাটির নিচে জমা-করা নরকপাল দেখলাম। ওরা বোধহয় হাড়ের সার করবে বলে রেখেছিল। মাথার খুলিগুলো একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই আজকের কিন্নরদের সঙ্গে তার তফাৎ ধরা যায়। আজকালকার কিন্নরদের মধ্যে ভোট বা তিব্বতী রক্তের প্রভাব বেশী। তাই মুখের বাদনে মোঙ্গল-ছাপ। কপালের অংশ চাপা, করোটি গোল। অথচ কঙ্কালের খুলির চেহারাই আলাদা। তার কপাল প্রশস্ত, করোটির আকার লম্বাটে। বেশ বোঝা যায় এ কঙ্কালের অধিকারীদের রক্তে মোঙ্গল রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেনি। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে, ভোট সাম্রাজ্যের বিস্তারের আগের ইতিহাস। তখন শবদেহের সঙ্গে মদ আর খাবার দেবার প্রথা ছিল।

এতেও প্রমাণ হয় যে, এটা যে যুগের কথা, তখনও সমাজে বৌদ্ধধর্ম বা নব্য হিন্দুতন্ত্রের কোনো প্রভাব পড়েনি। যাইহোক, জল পড়ে পড়ে হাড়গুলোতে পচ ধরেছিল। নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। প্রাচীন বাসনপত্র যা পাওয়া গেলো খানকয়েক কিনে নিলাম। পয়সা আসছে দেখে পঞ্জীরাম সেই সঙ্গে ঘরের খানকয়েক পুরনো বাসনও এনে হাজির করলে। একটা কাঁসার বাটি, একটা মদখাবার পানপাত্র এগুলোও বুদ্ধিমান পঞ্জীরাম, কবরে-পাওয়া বাসনের সঙ্গে বেমালুম চালিয়ে দিলে। খবর নিয়ে জানলাম, এ রকম প্রাগৈতিহাসিক সমাধি এদিকে শুধু কনম্, স্পু আর তিব্বত সীমান্তের নম্‌গ্যা গ্রামেই নয় সুংনম্, পংগী মায় বস্‌পা উপত্যকার কামরু গ্রামে পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সে সব কবরে মৃতদেহের সঙ্গে মাটি আর কাঁসার বাসনপত্র, মদ্যাধার, এমন কি সুন্দর গাত্রালঙ্কারও পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে রীতিমতো অনুসন্ধান কার্য চালানো গেলে, সে যুগের ইতিহাসের পাতায় নতুন আলোকপাতের সম্ভাবনা প্রচুর।

আমার লিপ্পার মেয়াদ ফুরালো। যাবার আগে লিপ্পার প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। অনেক প্রাচীন যুগের কাহিনী লুকিয়ে আছে এ গ্রামের গর্ভে। অনেক দিনের গ্রাম। আজ এখানে লোকবসতি কম। এক কালে এ গ্রাম ধনে-জনে সমৃদ্ধ ছিল। সে আজ থেকে কম করেও ছ-সাতশো বছর আগের কথা। আজকের রুক্ষ পাহাড়ের গা খুঁড়লে পুরনো বনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। এক কালে একটা বিশাল দুর্গ ছিল এখানে। তারপর আগুন লেগে সে দুর্গটি পুড়ে যায়। সেও কম দিনের কথা নয়। আগুন কিন্নরপল্লীর একটা অভিশাপ। কাঠের প্রাচুর্যই এর জন্যে দায়ী। একে কাঠের ঘর, তায় দেবদারু কাঠের জ্বালানির স্তূপ একটু আগুনের আঁচ পেলেই দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। সব মিলিয়ে একেবারে জতুগৃহ—দরকার শুধু একটু স্ফুলিঙ্গের। ব্যস, আর দেখতে হবে না গ্রামকে গ্রাম ভস্মসাৎ হতে আর দেরী লাগে না। শেষবার যখন লিপ্পায় আগুন লাগে, তখনকার ঘটনা বলি—

স্থানীয় জমিদারের ঘরেই প্রথমে কাণ্ডটা ঘটে। বাড়িতে গৃহদেবতার মন্দির আছে, পূজারীও থাকেন। একদিন রাত্রে খেয়ে-দেয়ে পুরুতঠাকুর নিচে শুতে চলে গেছেন। ঠাকুরঘরের প্রদীপ নেভাতে মনে নেই। যখন খেয়াল হলো তখন অর্ধেক রাত। গিয়ে দেখেন ঘরের ভেতর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। আর যায় কোথায়—বাইরের পাহাড়ী হাওয়া হু-হু করে এসে ঘরে ঢুকল। চারদিকে শুকনো দেবদারু কাঠ বারুদ হয়েছিল। প্রদীপের আগুন ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে দেরী লাগল না। ঘর পুড়ল, বাড়ি পুড়ল দেখতে দেখতে সারা গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলো।

পথে বেরিয়েই নজরে পড়ে প্রকাণ্ড জমকালো বাড়ি। জেলদার বংশীলালের বাড়ি। ভদ্রলোক সঙ্গতিপন্ন, রুচিও বেশ আধুনিক এবং লোকটিও অতিথিপরায়ণ। নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। বাড়িটায় চীন-তিব্বতের সংস্কৃতির স্পর্শ পাওয়া যায়। সুন্দর চীনেমাটির কাপে, নুন-মাখন দেওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ তিব্বতী চা খেলাম; ডায়েবেটিস্‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হালুয়া, পুরী, তরকারী খেলাম। বংশীলালেরা তিন ভাই, ছোটভাই স্কুলের ছাত্র। তিন ভাইয়ের একই পত্নী—সুন্দরী, রন্ধনপটিয়সী।

ঘড়িটা মেরামত করতে সিমলায় পাঠিয়েছি, এখনও আসেনি। আন্দাজ ন'টা নাগাদ বংশীলালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। পথে রদ্দুর, সামনে আবার সেই হামাগুড়ি দেওয়া অজপথ। আগের তুলনায় এ পথ আরও দীর্ঘ, আরও খাড়াই, আরও ঢের বেশী সঙ্কটজনক। কিন্তু সে সব ভেবে সময় নষ্ট করবার অবকাশ নেই। 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।' অতএব—ঘোড়া সমানেই হাজির আর দেরী করা উচিত নয়।

বংশীলাল জেলদারদের পরিবারে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। তারা বর্তমানে তিন ভাই। একই বাড়িতে, এক সঙ্গেই বাস করছে। পাণ্ডববিবাহ প্রথানুসারে তিন জনেরই এক পত্নী। কাজেই যৌথ-পরিবারব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। এর ফলে সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ হচ্ছে। বংশীলাল আর তার পরের ভাই পড়াশুনা শেষ করে বাড়ির কাজ-কর্ম, জমি-জমা দেখাশুনা করছে। ছোটভাই রামপুরের ইস্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র। তিন ভায়েরই মন বাঁধা রয়েছে সংসারে। স্ত্রী সৌন্দর্যে তিলোত্তমা, রন্ধনবিদ্যায় দ্রৌপদী। মহিলা জাতে কিন্নরী নন—কোচী। হিন্দুস্থানী ভাবধারায় সুপরিচিতা, যথেষ্ট কৃষ্টিসম্পন্না। ছেলেপুলে এখনও হয়নি, হলেও ভাবনা-চিন্তার কারণ নেই। বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামীও ততদিনে সাবালক, কাজের মানুষ হয়ে যাবে। সন্তান পালনের যৌথ দায়িত্ব। এই একপত্নী প্রথা না থাকলে কবেই বারো ঘর তেরো উঠোন হয়ে যেত, কেউ কারও মুখ দেখত না। জায়ে-জায়ে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া, বাড়িঘর ভাগাভাগি হয়ে এতদিনে বংশীলালের দল সাধারণ চাষীতে পরিণত হতো।

ঘোড়া ঠুক্‌ঠুক্ করে অজগতিতে এগিয়ে চলেছে। কপাল ভালো, এ ঘোড়টাও বেশ ভালোমানুষ। নইলে দুর্গতির সীমা থাকত না। যেমন তেমন ঘোড়া হলেই পাহাড়ী পথে চড়া যায় না। ঘোড়া যদি দুর্বল হয়, চলতে গিয়ে বসে পড়ে তা'হলে আর রক্ষা নেই। এ পথে বসবার জায়গা নেই, ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে একেবারে অতলে গিয়ে পড়তে হবে। আবার যদি খুব তাগ্‌ড়া আর ছটফটে ঘোড়া হয় তা'হলে আবার বিপরীত অবস্থা। আমার ঘোড়া এ দুয়ের কোনাটাই নয়। কষ্টসহিষ্ণু, ধীরমেজাজ শান্তস্বভাবের অশ্বকুলতিলক। মনে মনে ঘোড়টার পিঠ চাপড়াই।

সুরাসক্তিতে কিন্নর দেশ পৃথিবীর যে কোনো দেশকে পিছনে ফেলে যেতে পারে, আর তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। আপেল, আঙ্গুর, নেসপাতি, খোবানী, হেন ফল নেই যা থেকে তার রস নিংড়ে মদ তৈরি না করা হয়েছে। আমি বললাম, 'বাছারা কিছুই তো আর ফেলে দিচ্ছ না। চালগোজা আর দেবদারুই বা বাকি থাকে কেন! একবার ন্যোজার কাঠ ছোট ছোট টুক্‌রো করে কেটে জলে ভিজিয়ে রেখে দেখ। আমার তো মনে হয় তা থেকেও নেশার উপযুক্ত রস বেরোবে।' এরা সরল লোক, আমার উপদেশটা কাজে লাগাবে মনে হয়। তা'হলে অন্তত সম্বৎসরের ফল-মেওয়াগুলো ছেলেপুলের পেটে যায়। নেশা একেই বলে!

এগারো হাজার ফিটের ওপর উঠে এসে খানিকটা সমতলভূমি পাওয়া গেলো। জায়গাটা মনোরম, চারদিক ঘন দেবদারু গাছের ছায়ায় ঢাকা। নিচের দিকে, দূরে কনম্ আর লব্রং-এর জনপদ দেখা যাচ্ছে। রাস্তা বেশ নিরাপদ, আর গড়িয়ে পড়বার

ভয় নেই। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম,ঠিক করলাম বাকি পথটুকু হেঁটেই যাব। বড় তেষ্টা পেয়েছিল। কাছে-পিঠে কোথাও জল পেলাম না। দু-পা এগিয়ে একটা খদ্দের ধারে গেলাম। চারপাশে বিগত হিম-প্রপাতের ধ্বংসলীলার নির্দশন কিছু কিছু ছড়ানো রয়েছে দেখতে পেলাম। স্থানচ্যুত পাথর, ঝড়ে উপড়ে-পড়া বড় বড় দেবদারু গাছ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

একটু বিশ্রামের পর আবার পথ চলা। এবার আর ঘোড়ায় চড়িনি। সহিস ঘোড়া নিয়ে হেঁটে চলেছে। ওরা লব্রং থেকে ফিরে যাবে। 'লব্রং' শব্দের অর্থ হলো লামা-মহল বা রাজমহল। ওখানে একটা বিশাল সাতমহলা দুর্গ আছে। লামা-মহল নামটা এখানে প্রযোজ্য নয়। কস্মিন্‌কালেও এখানে কোনো বৌদ্ধমঠ বা সংঘারাম ছিল না। রাজমহল নামটাই ঠিক মনে হয়। দুর্গটা যতটা উঁচু, তেমন লাগসই ধরনের লম্বা চওড়া নয়। স্থানীয় কোনো রাজা এ দুর্গ বানিয়ে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে, কোথাকার রাজা, কবে বানানো হয়েছে, এ সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পাওয়া যায় না। এ সব ব্যাপারে এদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এক বুড়ো বললে, 'রামপুরের রাজা আগে এর মেরামতী খরচা দিতেন, আজকাল তাও বন্ধ হয়ে গেছে!' সংস্কারের অভাবে সাতমহলা প্রাসাদটা জরাজীর্ণ, প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থা। একটা দেবমূর্তি আছে কিন্তু পুরোহিত নেই, ভোগারতির ব্যবস্থা নেই।

শোনা যায়, ভোটিয়া গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যেই এই দুর্গের প্রতিষ্ঠা। কথাটায় অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। কিন্তু কেবল ভোটিয়ারাই কেন বাপু, তোমরা কিন্নররাও কিছু কম যাও না। কথায় বলে, সব পাখিই মছ খায়, বদনাম মাছরাঙার। বেশীদিনের পুরনো কথা নয়, এই হালেই বেশ কিছু কিন্নরবাসী তিব্বতে লুটপাট করে বড়লোক হয়েছে। নাকোরে (হংরং) একজন সর্দার কিন্নর তরুণদের উৎসাহিত উত্তেজিত করে দিব্যি বড়সড় একটা ডাকাতের দল করেছিল। সেই দল কয়েকটা অভিযান চালিয়ে যা লাভ করেছিল, তার পরিমাণ অল্প নয়। নিয়ম ছিল, লুটের মাল চার ভাগ হবে, তিন ভাগ দলের আর এক ভাগ সর্দারের। তিব্বত আর স্পিতীর অনেক লোকই তখন ঐ কাজে দক্ষ ছিল।

লব্রং-এর দোকানে একটি তরুণ ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ। শিক্ষিতের সংখ্যা কিন্নর দেশে নগণ্য। প্রায় সবাই শীত পড়লে ভেড়া চরায় আর গরম পড়লে তিব্বতে বাণিজ্য করতে যায়। উপায় কি? লেখাপড়া শিখেও কোনো লাভ নেই। চিনীতে কনমের একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করে ট্রেনিং নিয়েছে, পোস্টমাস্টারীর কাজও শিখেছে কিন্তু চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভেড়া চরায়। প্রশ্ন করতে বললে, 'কি করব বলুন বাইশ টাকা মাইনেতে পেট চলে না। সরকারকে বললুম, নিজের গ্রামে আমায় চাকরী দাও—যাতে অন্তত মাস্টারী করেও দু-পয়সা কামাতে পারি। তাও করলে না। কাজেই ইস্তফা দিতে হলো। ভেড়া চরিয়ে আমার বাইশ টাকার বেশী রোজগার হয়। কথাটা সত্যি, বলবার কিছু নেই।

লব্রং-এর সাতমহলা দুর্গ পিছনে ফেলে নিচের দিকে নেমে চললাম। গ্রামের সীমানায় একটা খদ্দ। খদ্দের ওপর কোনোকালে একটা সেতু বানানো হয়েছিল, আজ

সেটার মরণদশা। তার পাশেই গাঁয়ের লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় একটা সেতু খাড়া হয়েছে। তার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে চলাচল করতে হয়, নইলে জীবনের আশঙ্কা! গুরুনাম স্মরণ করে সেতু পার হলাম। কনমের সীমানা-ক্ষেতের আলপথ ধরে চলতে চলতে খানিক দূর গিয়েই আবার তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়কের ওপর পা রাখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কনমের ডাকবাংলোয় এসে হাজির হলাম। ডাকবাংলোটা পি. ডব্লিউ. ডি.-র। আমি আগেই বলেছি এ ব্যাপারে আমার কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কিন্নর দেশের সব ডাকবাংলোই বুঝি বন-বিভাগের। সেই ধারণা অনুযায়ী বন-বিভাগের পাস নিয়েছিলাম, কিন্তু পাঞ্জাবের পি. ডব্লিউ-ডি.-র পাস নেওয়া হয়নি। ধারণাটা যে ভ্রমাত্মক সেটা পরে বুঝেছি। এখন এখানেও আবার সেই ঝামেলা। এরা পাস দেখতে চাইলে, জানালুম পাস নেই। তা কি ভাগ্যি! কোনো গোলমাল না করেই বাংলোর দরজা খুলে দিলে। না খুলতেও পারত। তরুণ চৌকিদার-তনয়ের ভদ্রতাবোধ প্রশংসা যোগ্য।

কনম্ একটা অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ জায়গা। এ জায়গার বিষয়ে অনেক কিছু বলবার আছে। সেটা অল্প সময়ে বলা যাবে না। তাই কনমের বর্ণনাটা ফেরার পথেই করব বলে স্থগিত রাখলাম। আপাতত এগিয়ে চলি। পথে অসহ্য রোদ্দুর—হ্যাট এনেছিলাম, ভুল করে সিমলায় ফেলে এসেছি। এখন হাত কামড়াই। যাত্রাপথের মাঝামাঝি শ্বাসো খদ্দের সেতু পড়ল। আগের বার যখন তিব্বত যাই, তখন তিব্বত ভারত রাজপথ এই শ্বাসো নদী পর্যন্তই ছিল। শ্বাসোর সেতু তখনও হয়নি। এ সব হয়েছে হালে। পুলের ওপার থেকে সড়ক ঘুরে গেছে। এ পথে গেলে অনেক হাঁটতে হয়। তাই গ্রামের হাঁটাপথ ধরলাম। পুণ্যসাগর জানালে, এদিকে 'স্পু' যাবার ঘোড়া বা 'বেগারী' মিলবে না। জানি না কতদূর সত্যি। ...চলছি তো চলছিই—পথের আর শেষ নেই। মাথার ওপর রুদ্রের প্রসাদ। আশপাশে বড় গাছ তো দূরের কথা একটা লতারও চিহ্ন নেই। ঠিক যেন তিব্বতের মরুপথ। চলতে চলতে দুপুর হয়ে গেলো। অবশেষে অদূরে 'শ্বাসো' গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলো।

একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বোঝা গেলো, এককালে একটা ডাকবাংলো ছিল, এখন পরিত্যক্ত। ভাঙা ঘরে ছাগল ভেড়া রাত্রিবাস করে—নোংরামির রাজত্ব। ঘরের কাঠামোটা আছে, দরজা জানালা পাচার হয়ে গেছে। এখান থেকে রাজপথ নম্‌গাঁ হয়ে স্পু পর্যন্ত চলে গেছে। কাজেই এখানে ডাকবাংলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এককালে এটা তৈরি করাতে নিদেনপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বাড়িটা ঠিক থাকলে গ্রামের ইস্কুলও হতে পারত। এর নাম সরকারী ব্যবস্থা!

গ্রামের বাইরে এক জায়গায় গাছের ছায়ায় বসে আছি। ঘোড়া আর বেগারী এল। বেগারী দু'জন, একজন পুরুষ অপরজন নারী—ষোড়শী। এদেশে কোলী মেয়েরাই সচরাচর মোট-ঘাট বওয়ার কাজ করে। কিছুসংখ্যক কনেত মেয়েও বেগারীর কাজ করে থাকে। কিন্নরদের কণ্ঠ মধুর, স্বর সুললিত। কিন্তু রূপের অভাব আছে। অথচ এই অস্পৃশ্য কোলী মেয়েটির কি অপরূপ তনুশ্রী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উঁচু নাক, সুঠাম দেহ, বড়-বড় চোখে মদির দৃষ্টি, পাতলা দু'খানি ঠোঁট অনাবশ্যক হাসিতে

রঙিন। সত্যিকারের রূপসী তন্বী তরুণী। ব্রাহ্মণ মহর্ষিরা এদের দেখেই বলে গেছেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

বেগারীরা অনেকক্ষণ চলে গেছে। খানিকটা ঘোল খেয়ে যাত্রা করলাম। ঘোলটা যেন অমৃতের মতো লাগল। এ বারে সারা রাস্তাই ঘোল খেতে খেতে যাব। তবে সেটা অন্য রকম ঘোল খাওয়া।

চলেছি সুংনমের পথে। মোটে চার মাইল রাস্তা। ভাবলাম দু'ঘন্টায় পৌঁছে যাব। ঘোড়ায় চড়লাম, চড়েই বুঝলাম, না-চড়াই ভালো ছিল। এটা এক সাংঘাতিক চরিত্রের জীব। সওয়ার পিঠে নিয়েই মালুম করিয়ে দেন যে তিনি পক্ষীরাজের বংশধর। এই রকম ডিঙি-লাফ-মারা ঘোড়ার পিঠে বসে এই আধ-কাঁচা আধ-পাকা রাস্তায় চলার চেয়ে আত্মহত্যা করা খুব বেশী খারাপ নয়। সঙ্গীদের সাহায্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। হেঁটে যাওয়াই প্রশস্ত। হাঁটছি, অসম্ভব চড়াই পথ। সোজা খাড়া হয়ে উঠে গেছে কঠিন চড়াই। মাথার ওপরে রোদ, সামনের পাথুরে রাস্তায় রোদ ঠিক্‌রে চোখে এসে লাগছে। ব্রহ্মতালু পুড়িয়ে দিচ্ছে। ক্লান্তিতে কোমর ভেঙে আসছে। হাঁটু অবশ হয়ে আসছে। ওপর থেকে ফেরার সময়ে এই চড়াই আবার উৎরাই হয়ে দেখা দেবে। এই সব ভয়াবহ চিন্তায় আর কষ্টে মাথার মধ্যে সব যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নিজের মনে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি—কেন মরতে এই বাহাদুরী করা! সুংনমে কি মধু আছে যে এই ঠিক দুপুরে ধেয়ে যাওয়া হচ্ছে? একবার তো যাওয়া হয়েছে সেখানে। কি এমন স্বর্গরাজ্য! —আর পারি না, বেগারীরা এগিয়ে চলেছে। মন বলছে, এখনও ফেরার সময় আছে, পরে পস্তাতে হবে। পুণ্যসাগর কাছাকাছি ছিল। হাঁক দিয়ে বললাম, 'সুংনম যাত্রা স্থগিত, বেগারীদের বলো শীগ্‌গির শ্বাসো ফিরে চলুক। ব্যস আর কথা নয়।'

শ্বাসো

অসম্ভব নোংরা জায়গা এই শ্বাসো। অবশ্য নোংরামির সঙ্গে আমার পরিচয় নতুন নয়। কিন্তু পিসু জারপোকার উৎপাতও যখন সঙ্গে থাকে তখন একেবারে অসহ্য বোধ হয়। ছোট্ট গ্রাম, কুল্লে দশ ঘরের বসত। শ্বাসোর 'বিষ্ট' বা উজীর পরিবার এককালে অর্থাৎ বিশ বছর আগেও খুব ধনশালী ছিল এখন অবস্থা পড়ে গেছে, আমদানি নেই। এক সময় বুশহর রাজ্যের সর্বত্র এই বিষ্ট বা উজীরের দল প্রভুত্ব করত। সেকালের প্রাচীন লিপির পুথিপত্তর পড়তে পারলেই তাকে বিদ্বান বলা হতো। ইংরেজি, ফার্সী লেখাপড়ার রেওয়াজ তখনও হয়নি। উজীরেরা ছিল গাঁয়ের মাতব্বর, প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের বচনকেই আইন বলে মানা হতো। আমদানির রাস্তাও তাদের যেমন ঢালাও ছিল, ক্ষমতাও তেমনি অসীম। গাঁয়ে গাঁয়ে বিষ্ট-বাড়ি রাজবাড়িকেও হার মানাত। দোর্দণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করতেন তাঁরা। এখন অবশ্য দিনকাল বদলেছে, উজীররা এখন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে গাঁয়ের মোড়লী করছেন—কেউ মানুক না মানুক। প্রতাপ-প্রতিপত্তি ঘুচে গেলেও অমরনাথের বাপ-পিতামহর আমলের প্রাসাদ আজও রয়েছে। এমন কি তাতে আউট-হাউসও আছে। অবশ্য সে সব ঘরে আজ

অনাহূত ছারপোকা পিসুর অভাব নেই তবুও আমি উজীর-বাড়ির আতিথ্য স্বীকার করাই শ্রেয় ভাবলাম। লোকজনকে বললাম, ছাতে আমার বিছানা করতে। বেলা ঢলে পড়েছিল। পুণ্যসাগর রন্ধন-যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন, আর আমি ছাতে বেড়াতে গেলাম।

বেড়াতে বেড়াতে নানা কথা ভাবছিলাম। বিষ্ট-বাড়ির বর্তমান মালিক অমরনাথের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বেচারা পাগল। তার ঠাকুর্দা ইন্দ্রদাস সে আমলের অত্যন্ত প্রতাপশালী লোক ছিলেন। এ বাড়ি তাঁরই তৈরি। বিত্ত-বৈভবের প্রচুর্যে বিষ্ট পরিবার তখন ঝলমল করত। অথচ দু'পুরুষেই কি দুঃসহ পরিণতি! ইন্দ্রদাসের ছেলে চরণদাসের সময়টাও মন্দ কাটেনি। চরণদাসের চার ছেলে, দু'ছেলে ছোটবেলায় মরেছে, বাকি দু'জনে পাগল! বড় সংসারচন্দ গ্যাবোঙ-এর গারদে আছে। অমরনাথ এখানেই থাকে। সে ঠিক বদ্ধ উন্মাদ নয়। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়, নইলে এমনিতে বোঝা যায় না। পাগলামি করলেও কারও কোনো ক্ষতি করে না। মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়ে অসংলগ্ন কথা বলে। দু'ভায়ের এক বউ। বেচারী বউয়ের কি দুর্ভাগ্য, তাই ভাবি। বুড়ি মা'ও সাংসারে আছে। শোকে-তাপে জর্জরিতা, না থাকার মতোই। আর আছে এক কুৎসিতদর্শনা বুড়ি ঝি। সে কানে শুনতে পায় না, তায় আবার এক পা খোঁড়া। অমরনাথ বা সংসারচাঁদের ছেলেপুলে নেই, হবার আশাও নেই। বৌয়ের বয়সও পঞ্চাশ হতে চলল। না হওয়াই একদিক দিয়ে ভালো, পাগলের বংশবৃদ্ধি হয়ে ক্ষতি ছাড়া ভালো হয় না। ইন্দ্রদাসের বংশ লোপ পেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। সহানুভূতি আসে জীবিত মানুষগুলোর জন্যে। আর মায়া হয় বেচারী বউটার কথা ভাবলে। নিঃসন্তান নিঃসম্বল। এত বড় পুরীটায় একটা মানুষ বলতে কেউ নেই যে ওর দুঃখ বুঝবে। কাঞ্চন-কৌলীন্যের কি মর্মান্তিক পরিণতি!

১৯ শে জুন সকালবেলায় বেরিয়ে পড়লাম, পুণ্যসাগর আর চাপরাসীকে রেখে গেলাম। ওদের বলে দিলাম বেগারী এলে তাদের নিয়ে রওনা হতে। ঘোড়ার আর দরকার নেই, ঘোড়া এলে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে গেলাম। কাল বিকেলেই শুনেছিলাম বেগারী এ গাঁয়ে আর মিলবে না। সুংনম থেকে বেগারী আসবে। কারণ এখানকার বেগারীদের সাপ্তাহিক মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এখন সুংনমের বেগারীদের পালা। পথে হঠাৎ সুংনমের জেলদার তোব্ গ্যারামের সঙ্গে দেখা। খুব দুঃখ করতে লাগল, আমার যাবার কথা ছিল অথচ যাইনি বলে। বললে, 'ওখানে সবাই আপনার পথ চেয়ে বসেছিল।' তোব্ গ্যারামের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় ছাব্বিশ বছর আগে সুংনম ডাঙের ওদিকে হংগোতে। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, ওর কিন্তু ঠিক মনে আছে। ভোরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়াটা এখনও কাটেনি। বাতাস উত্তপ্ত হয়নি— হাঁটতে ভালোই লাগছে। আস্তে আস্তে নিচে নামছি।

শ্বাসোর সেতু পর্যন্ত নামতে বেশী সময় লাগল না। সেতু পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। এই রাস্তা তৈরি হয়েছে ১৯২৭ সালে। তিব্বত-হিন্দুস্থান সড়কের এই অংশটি বানাবার সময়ে ইঞ্জিনীয়ার লালা রামচন্দ্র যান্ত্রিক কুশলতার অনেক পরিচয় দিয়েছেন। রাস্তায় চড়াই উৎরাই বেশী থাকতে দেননি।

কিছুদূর যাবার পরে মনে হলো, মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র খণ্ডিতাংশের বুক চিরে সড়ক চলে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওপরের পাহাড় থেকে বালুর স্তূপ বুঝি রাস্তার বুক ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু পরে বুঝলাম তা নয়, এ সব পবনদেবেরই কীর্তি। উন্মাদ বাতাসে বছর বছর লাখ লাখ মণ বালি এনে ফেলে সড়কের ওপর। লোক লাগিয়ে, সাজ-সরঞ্জাম আনিয়ে বালির স্তূপ ঝেঁটিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বহুবার। কিন্তু কোনো ফল হয়নি—আবার যে কে সেই।

যেতে যেতে একটি নাতিক্ষুদ্র দলের সামনাসামনি পড়ে গেলাম। না—ডাকাত নয়। সপারিষদ পি. ডব্লিউ. ডি.-র এস. ডি. ও. ইঞ্জিনীয়ার কাপুর সায়েব বাৎসরিক পরিক্রমা সেরে ফিরছিলেন। সঙ্গে ওভারসিয়ার, রোড ইন্সপেক্টর, আরও জনাদুয়েক ভদ্রলোক। আর প্রায় জনাবিশেক বেগারী। নমস্কার, কুশল বিনিময় হবার পরে আমার মনে পড়ল পি. ডব্লিউ. ডি.-র পাস যে আমার কাছে নেই তার একটা হিল্লে করা যায় না-কি! কাপুর সায়েব বললেন, 'পাস ইসু করেন তো চীফ এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার। তবে আমি বাংলোর চৌকিদারদের জানিয়ে দেবো।'

এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়েই হিমানীস্তূপের সামনে পড়ে গেলাম। এ বারে শীতকালে যে অজস্র হিমানী-সম্প্রপাত হয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এখনও রাস্তার ওপর টন-টন বরফ পড়ে রয়েছে। কিছু গলেছে, সব গলেনি। রাস্তার পাশ দিয়ে একদিকে হু-হু করে হিমগলা জল বয়ে চলেছে, অন্যদিকে স্তূপীকৃত তুষাররাশি। এই লক্ষাধিক মণ বরফ সম্পূর্ণ গলতে এখনও অনেক দেরী। এর মধ্যে এই বরফের খপ্পরে পড়ে কতকগুলো জন্তু-জানোয়ার বলি হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এই তো ক'দিন আগেই একটা খচ্চর আর গোটা তিনেক ভেড়া মারা গেছে বরফ চাপা পড়ে। রাস্তা জায়গায় জায়গায় দুরন্ত হিমবাহের ঘায়ে একেবারে ভেঙে গেছে। কোথাও বরফে পাথরে মিলেমিশে এক বিশ্রী ব্যাপার হয়ে আছে। না বুঝে পা দিলেই বিপর্যয় ঘটবে। এ সব রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। সমস্ত বরফ সরিয়ে রাস্তা সাফ করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সরকার স্থায়ী মজুরের ব্যবস্থা রেখেছেন কিন্তু তাদের সব সময়ে কাজে পাওয়া যায় না। সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে লাগলাম। নইলে একেবারে হিম-সমাধি লাভ করতে হবে—আর যতদিন না বরফ গলে লোকচক্ষে শবদেহকে দৃশ্যমান করে তুলবে, ততদিন সমাধিস্থ হয়েই থাকতে হবে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিপদের মাটি মাড়িয়ে চলা—এ তো লেগেই আছে। জীবন মানেই তাই। তবু পথ চলার বিরাম নেই। এই তো দু'ঘণ্টা আগেই এই তুষার-বিধ্বস্ত পথ দিয়ে একটা আস্ত যাত্রীদলের ক্যারাভান চলে গেছে। আর এখন আমি চলেছি—একা, সঙ্গীহীন।

একটা ব্যাপারে প্রায়ই আফসোস হয়, আহা, যদি ভূতত্ত্ব-বিদ্যাটা জানা থাকত! জ্ঞানীরা বলেছেন, 'বিদ্যা অনন্ত, জীবন সীমাবদ্ধ।' আমার মতো পর্যটকের এ সব কথা মানলে চলে না। এই যে আমার চারপাশে রঙ-বেরঙের পাহাড়, তার গায়ে বিভিন্ন বিচিত্র স্তরের বর্ণালী—জিয়োলজি জানা থাকলে এখনই কত সম্পদ খুঁজে বার করতে পারতাম। জগৎকে দিতে পারতাম কত অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্যের সন্ধান! কত প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৌন কাহিনী আমার সামনে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে অথচ আমি অন্ধের মতো তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছি। তাদের ডাকে সাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।

স্পু এখনও পাহাড়ের আড়ালে। রাস্তা এইবার শতদ্রু তট ছেড়ে বাঁ-হাতে ঘুরবে। পৃথিবীতে মানুষের জন্মের অনেক দিন আগে এইসব জায়গায় ছিল গ্লেশিয়র—নিত্য চলমান গ্লেশিয়র। সেই গ্লেশিয়রের লক্ষ বছরের পরিশ্রমে এই পার্বত্যভূমি তৈরি হয়েছে, আশপাশে তার গভীর খাদ, দুই দিকের দুই তীব্রস্রোতা তটিনী, সব সেই গ্লেশিয়রের দান। পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেছে—দিনে দিনে তিল তিল করে ক্ষইয়ে দিয়েছে কঠিন পাথরের স্তূপ, খনন করেছে পরিখা। ধন্য গ্লেশিয়র!

পথের পাশেই একটা গভীর খদ্দ, তাতে জল নেই, আছে কেবল পাথর। অসংখ্য ছোটবড় নুড়ি পাথর। সেইদিকে চোখ রেখে হাঁটছি। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা শেয়াল রাস্তা পার হয়ে, খদ্দ টপকে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো, শেয়ালটা অদ্ভুত। আমি অবাক হয়ে তার অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে চেয়ে রইলাম। মামুলী শেয়াল নয়, অত্যন্ত মোলায়েম মসৃণ গায়ের লোম। এই জাতের শেয়ালের চামড়া রীতিমতো চড়া দামে বিক্রী হয়।

এ রাস্তায় অনেকগুলো বাঁক, কিন্তু চড়াই-উৎরাই নেই বললেই হয়। সামনের বাঁকের মুখে মোড় নিতেই দূরে স্পু দেখা গেলো। আরও মাইল দুই হাঁটার পর দুপুরের কাছাকাছি ডাকবাংলোয় পৌঁছালাম। আজ সারা রাস্তা বেশ ছায়ায় ছায়ায় এসেছি। দিনটি মেঘলা-মেঘলা ছিল।

স্পুর অন্য নাম খুন্‌নু বা ফুগু। গ্রামখানি বেশ বড়-সড়। এ জায়গার বিশেষত্ব হলো, এখান থেকেই ভোট ভাষার চলন আরম্ভ হয়েছে; যদিও স্পু-বাসীর চেহারায় সাধারণ কিন্নরদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। আসলে রক্তের দিক দিয়ে এরা কিন্নরদেরই সগোত্র। তবে দীর্ঘদিন তিব্বতীদের সঙ্গে মেলামেলা, অল্পবিস্তর রক্তের সংমিশ্রণ এবং সামাজিক জীবনে তিব্বতী প্রভাবের ফলে এরা বেশভূষা, আচার-ব্যবহার এবং ভাষার দিক দিয়ে তিব্বত-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে। কনৌরের কোলীরা ভারতের সমতল অঞ্চল থেকে এসে বংশপরম্পরাক্রমে সেখানে বাস করলেও, তাদের পারিবারিক ভাষা (সে ভাষা হিন্দীর সগোত্র) বা আচার ব্যবহার ছাড়েনি। এখানের কোলীরা কিন্তু অন্যদের মতোই ভোটভাষী। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সবাইয়ের পোশাকই কিন্নরদের থেকে আলাদা। পোশাকের ব্যাপারে মেয়েরা একটু পুরনোপন্থী। কিন্নরীদের মতো এরা পাহাড়ী শাড়ি (দোড়ু) পরে না, পরে লম্বা কুর্তা আর পায়জামা। এখানে আমার একটা সুবিধে হলো কথা বলার। এরা সবাই ভোটভাষী।

ডাকবাংলোয় পৌঁছে দেখলাম বারান্দায় একখানা বেতের আরাম চৌকি পড়ে রয়েছে। বুঝলাম, এ হলো ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের পরিত্যক্ত আসন। কালবিলম্ব না করে গা এলিয়ে দিলাম। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব কিন্তু সে তো পুণ্যসাগর না এসে পৌছনো পর্যন্ত কিছু হবে না। অতএব, চেয়ারে পড়ে পড়ে চৌকিদারের ধ্যান করা যাক। সেও তো প্রায় ঈশ্বরের মতোই দুর্লভ!

স্পু-র উচ্চতা ৯২০০ ফিট, অর্থাৎ চিনীর তুলনায় এ জায়গা অনেক গরম। সেটা হয়ত এখানে বাতাস চলাচল কম বলে, কিংবা চিনীর গায়েই যেমন চিরতুষারাবৃত শিখরশ্রেণী এখানে তার অভাব বলেই। কারণ যাইহোক, স্পু-র উষ্ণতা অনেক বেশী।

ডাকবাংলোটি খাসা। চারপাশে চুলি গাছের ঘন বাগান—চুলি এখনও পাকেনি, একটা কাঁচা ফল ছাড়িয়ে মুখে দিতে মুখটা টক হয়ে গেলো। এদিক-ওদিক চেয়ে একজন লোককে আবিষ্কার করলাম। তাকে দিয়ে চৌকিদারকে ডেকে পাঠালাম।

প্রায় ঘণ্টা দুই-আড়াই পরে পুণ্যসাগর একা এসে পৌঁছলো। মালপত্র বেগারীর মাথায় চাপিয়ে চাপরাসীর সঙ্গে রওনা করে দিয়ে, সে জোর-পায়ে এগিয়ে এসেছে। বাংলোর চৌকিদার ইতিমধ্যে এসে গেছে। এসেই প্রথমে আমায় ঘোল করে খাইয়েছে। তারপর খাবার-দাবার তৈরি করার কাজে লেগে গেছে। এক ফাঁকে গিয়ে গ্রাম থেকে ঠাড় (বেগার খাটার চাকর) ডেকে নিয়ে এসেছে। ভারী চটপটে কাজের লোক। গাঁয়ের কোলী মোড়ল (হলমন্দী) গেলো ইন্ধনের জোগাড় করতে। সে বেচারা আবার চোখে দেখতে পায় না, আন্দাজে পথ চলে। অথচ তার ভাই শ্রীথরছিন বেশ কৃতী লোক, পাদ্রীদের কল্যাণে লেখাপড়া শিখেছে। আজকাল কালিম্পঙে থাকে। ভোট ভাষার একমাত্র সংবাদপত্রখানি সে-ই সম্পাদনা করে।

চৌকিদার ও পূণ্যসাগরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু আহার্য পরিবেশিত হলো। আগেই বলেছি, চৌকিদার নম্‌গ্যল ছোরিং লোকটি প্রকৃত কর্মদক্ষ। আস্তে আস্তে তার আরও পরিচয় পেলাম। সে শুধু যে ভালো মেজাজের লোক তাই নয়, সাধারণভাবে শিক্ষিত বলা যায়। তার পুরো নাম নম্‌গ্যল ছোরিং, নামের অর্থ—বিজয় দীর্ঘায়ু। আমরা সংক্ষেপে বিজয় বা নম্‌গ্যল বলেই ডাকব। বিজয়ের মাতৃভাষা ভোটিয়া, ভোটিয়া তো জানবেই, উর্দুও পড়তে লিখতে পারে। সে কেবল ধর্মেই বৌদ্ধ তাই নয়, বিজয় একজন লামা। ডুক্‌পা সম্প্রদায়ের লোক গৃহাশ্রমী লামাকে ভিক্ষু লামার চেয়ে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। শুধু তাই নয়, তাদের শীর্ষস্থানীয় লামা প্রবরও রিগ জিন্‌মা বা বিদ্যাধরী, কি ছনগ্যাছেগ মো বা মহামুদ্রারূপিণী নারীরত্ন পরিগ্রহকে ধর্মসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মানেন। এ কথা শুনে পাঠক যেন মনে করবেন না যে, এটা তিব্বতীদেরই একটা ঘৃণ্য প্রথা। মনে রাখবেন, ভারতেও (অষ্টম শতাব্দীতে) সরহপা, শবরপা, মীনপা ইত্যাদি চুরাশি সিদ্ধাইবৃন্দ স্থায়ী বা অস্থায়ী রূপে 'মহামুদ্রার' উপাসনা করে গেছেন। তা'ছাড়া শাক্তধর্মে ভৈরবীতন্ত্র, মহামুদ্রার মাহাত্ম্যের কথা আশা করি উল্লেখ করবার প্রয়োজন হবে না।

ষাট বছরের নাতিবৃদ্ধ বিজয় দীর্ঘায়ু সারা স্পুয়েই পরিচিত। একজন শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। বয়সের তুলনায় তার চুল পাকেনি বললেই হয়। এটা তা মোঙ্গলীয় রক্তের বৈশিষ্ট্য। বিজয়ের ছেলেবেলাটা কেটেছে মোরাবিয়ন মিশনারীদের আওতায়। সে আমলে কেনৌরের সর্বত্র মোরাবিয়ন পাদরীদের অসীম বোলবোলা। ছেলেমানুষ বিজয়ের মনে তখনই নিশ্চয় পাদরীদের ওপর খুব রাগ হতো। নাস্তিকদের কথা শুনলে ধর্মপরায়ণ লোকের মনে রাগ তো হবেই। আজও যে বিজয় তাদের ওপর খুব প্রসন্ন তা মনে হলো না। আমি বৌদ্ধ এ কথা জেনে সে তো প্রথমে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কয়েকটা ঘটনা পরিবেশন করলে। ক'ঘর কোলীকে পাদ্রীরা খৃশ্চান করেছিল, বিজয়ের দল তাদের আবার বৌদ্ধ করে নিয়েছে আর তাদের স্বজাতি-গোষ্ঠীতে মিলিয়ে দিয়েছে। বালতি জাতের একজন মুসলমান খৃশ্চান হয়ে গিয়েছিল; এখানে তাদের

জাতের কেউ না থাকায় এখন সে অবশ্য একাই বাস করে, তবে বৌদ্ধধর্মেই তার আস্থা। এ সব কথা বিজয় বেশ আগ্রহ নিয়ে শোনাল। তার ধারণা ছিল, আমি যখন বৌদ্ধ তখন এ জাতীয় খবরে নিশ্চয় বেশ উৎসাহিত হব। কার্যকালে সে দেখলে বিপরীত। আমি বরং উল্টে মোরাবিয়নদের প্রশংসা করলাম। তাদের শিক্ষা, জ্ঞান, শিল্প-বিস্তার প্রচেষ্টার নানা কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। তখন বিজয়ের আর এক রূপ দেখলাম।

এতক্ষণ সে যা বলছিল, সব প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে নজর রেখে সামাজিক সংস্কারের বাঁধা বুলিই তোতাপাখির মতো আউড়ে যাচ্ছিল! আমার কথায় কিন্তু তার কথা বলবার ধারাই বদলে গেলো। কৃতজ্ঞতায়, ভালোবাসায় দরদভেজা গলায় বিজয়ের অন্তরের মানুষটাই এ বারে সামনে বেরিয়ে এল। তার আড়ালে বৌদ্ধ লামার প্রবীণ তোতা-স্বর চাপা পড়ে গেলো।

কৃতজ্ঞতা মানব-চরিত্রের একটা মহত্তম গুণ। লামা নম্‌গ্যল ছোরিংয়ের সঙ্গে বসে কথা বলতে বলতে বারবার আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল। আজ যেখানে বসে কথা বলছি স্পু-র এই ডাকবাংলোটা তৈরি হয়েছে ১৯১৩ সালে। এর পেছনেও ছিল সেই বিদেশী পাদরীদের হাত। তাদেরই ক্রমাগত চেষ্টা-যত্নের ফলে স্পুতে গড়ে উঠেছে এই ডাকবাংলো, স্থানীয় লোকের মধ্যে হয়েছে অল্পবিস্তর আধুনিক শিক্ষার প্রসার। এই বাংলোর জন্মের প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে সর্বপ্রথম এখানে আসেন মোরাবিয়ন সোসাইটির মিশনরী রেস্‌লপ দম্পতি। তাঁদের এবং আরও কয়েকজন খৃশ্চান মিশনারীর মরদেহ এই স্পুয়ের মাটিতেই প্রোথিত রয়েছে। এই বাংলোর বাগানের এক পাশেই তাঁদের সমাধিভূমি। প্রায় অস্পষ্ট হয়ে-আসা কয়েকখানা প্রস্তরফলক আজও নজরে পড়ে। তার গায়ে গথিক ছাঁচের কয়েকটা অক্ষর উৎকীর্ণ—সমাধিস্থের পরিচয় বহন করছে। বাংলোর এ অংশটা গ্রামের নম্বরদারের সম্পত্তি। হয়ত কোনোদিন তার প্রয়োজন হয়ে পড়বে এই জমিটুকুর হয়ত সেদিন বিদেশী ধর্মযাজকদের এই সামান্য স্মৃতিচিহ্নটুকুও আর থাকবে না। এককালে মোরাবিয়নরা এখানে গির্জা তুলেছিল, আজ কোথাও তার চিহ্ন নেই। তাদের সব কীর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হয়ে যাবে একদিন। অনেক কিছুই করেছিল তারা। অনেক কিছুই ঘুচে-মুছে গেছে। যেমন গেছে ডাকঘরটা, ১৯১৩ সালে মিশন উঠে গেলো, ডাকঘরটাও গেলো বন্ধ হয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গেলো ইস্কুলটাও। সেটাও ঐ মিশনরীরাই করেছিল। কিন্তু কীর্তি কি সত্যিই মুছে যায়? এই যে সাধু বিজয় দীর্ঘায়ু, এও তো তাদেরই সৃষ্টি। দিনের পর দিন তাদের স্কুলে শিক্ষা পেয়ে মন মার্জিত হয়েছে তার, বুদ্ধি হয়েছে সংস্কৃত। সে সামান্য ডাকবাংলোর চৌকিদার, কিন্তু এই সামান্য কাজেই অসামান্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে সে। ছবির মতো করে সাজিয়ে রেখেছে বাংলোটাকে। এমন সাজানো-গোছানো চমৎকার ডাকবাংলো সারা কিন্নর দেশে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ। নিজের কর্তব্যে এই অবিচল নিষ্ঠার উৎস তার বাল্যশিক্ষার সুনীতি।

মোরাবিয়ন মিশনরীদের কথা বলতে বলতে বিজয়ের চোখে বাষ্প ঘনিয়ে ওঠে। পাদ্রী মার্কস সাহেব ছিলেন জার্মান। তাঁদের লেখা অনেক বই স্পু-র বহু বাড়িতে

আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে। মার্কস একজন নিপুণ দারুশিল্পী ছিলেন। এ গ্রামের বহু লোককে তিনি নিজে হাতে কাঠের কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়েছেন। তাদের উত্তরপুরুষেরা আজও স্পু-র নাম-করা কারিগর। মোজা বোনা, সোয়েটার বোনা এ সব কাজও মার্কসই এখানকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রবর্তন করেন। আজ অনেকেই এই বোনার কাজকে পেশা করেছে, তাই দিয়েই করে খায়। স্পু-র মাটিতে প্রথম আপেল, নেসপাতির গাছ লাগান পাদরী মার্কস। স্পুয়ের লোক তার আগে এ সব ফল চোখে দেখেনি। সেই মার্কসের মেওয়াবাগিচা আজ অবহেলায় অযত্নে বিশাল পোড়ো বাড়ির পেছনে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে।

মার্কসের বাংলো, বাগান সবই আজ হিমাচল সরকারের মালিকানায়। আর একটু কম উপেক্ষা যদি দেখাতেন সরকার! দরজা-জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ে গেছে, ঘরের দেওয়ালে আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে। মেঝেতে-বসানো চকমিলানো পাথরের অর্ধেকের বেশী ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত, সাপখোপের বাসা। নেহাৎ ভিত শক্ত ছিল, দেওয়ালের গাঁথুনি আর ঘরের কড়িকাঠগুলো মজবুত ছিল তাই কোনোমতে আজও কাঠামোটা খাড়া আছে। কিন্তু তাই বা আর ক'দিন থাকবে? অথচ কারও ব্যক্তিগত নয়, রাজ্যের সম্পত্তি। একটু দেখাশুনা করলেই হতো। আজও এর ওপর সামান্য কিছু খরচ করলেই একটা সুন্দর ইস্কুল বাড়ি হয়ে যায়। তা তো হবে না, তৈরি বাড়িটা এমনিভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর টনক নড়বে যে, ওখানে একটা মিডিল স্কুল হওয়া দরকার। তখন আবার সরকার থেকে জনগণের টাকা খরচ করে স্কুলের বাড়ি তৈরি করা হবে। কিন্তু বিশহাজার টাকা খরচ করলেও আজকের দিনে এমন একটা জমকালো বাংলো করা যাবে না, এটা জানা কথা।

কত আন্তরিক দরদ নিয়ে এসেছিল সেই সাগরপারের বিধর্মীরা (!) কত বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিল এক একটা জিনিস। কত কষ্ট সহ্য করে এই পিছিয়ে-পড়া পার্বত্য এলাকায় জনসেবা করে গেছে। আর প্রতিদানে কি পেয়েছে? বালির বুকে পায়ের ছাপের মতো তাদের কথা আজ ম্লান হতে হতে লুপ্ত হয়ে গেছে লোকের ভাবনায়। তাই ভাবছিলাম, কৃতজ্ঞতাই...

ঘণ্টা দুই বেলা থাকতে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম ঘুরে দেখতে। প্রথমেই গেলাম লোচোয়া-লাহ্খঙ। এটা একটা মন্দির। 'লোচোয়া' শব্দের অর্থ হলো, অনুবাদক আর 'লাহ্খঙ' মানে মন্দির। অনুবাদক বলতে এখানে একাদশ শতকের বিখ্যাত ভাষাবিদ্ রত্নভদ্র, স্থানীয় নাম ছিল রিন্ ছেন্ জংপো। এই মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি। মন্দিরের মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীন। রত্নভদ্রের জন্মস্থান এখানে থেকে মাত্র দু'দিনের রাস্তা, শিপ্‌কীর কাছেই। তবে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল থোলিং আর স্পুরঙ। সে জায়গাও অবশ্য বিশেষ দূরে নয়। তিনি একাধিক বার কাশ্মীরে যান। যাতায়াতের পথ ছিল এইটাই। কাজেই যাবার সময়ে এখানে বিশ্রাম করেছেন। তারপর তিনি নিজেই মন্দির স্থাপন করে থাকুন কি অন্যদের তৈরি-করা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে থাকুন অসম্ভব কিছু নয়। মন্দিরের অভ্যন্তরে, প্রিয়শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত আর মৌদগল্যায়ন সমভিব্যাহারে শাক্যসিংহের মৃন্ময় মূর্তি দেখলাম। আর একটু নিচে সরে এসে দেখতে

পেলাম বোধিসত্ত্বের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। এখানকার লোকে অবলোকিতেশ্বরকে 'মা তারা' বানিয়ে রেখেছে। আমি বিজয়কে ডেকে বললাম, 'দেখ এটা নারীমূর্তি হতেই পারে না। এর বুকে স্তন নেই এবং বাম বক্ষে মৃগলাঞ্ছন রয়েছে।' বিজয় দেখেই বললে, 'হ্যাঁ, এটা অবলোকিতেশ্বরেরই মূর্তি—মৃগমুখ-লাঞ্ছন তাঁরই চিহ্ন।'

মোরাবিয়ন মিশনের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখতে দেখতে আমরা মূল গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে ক্ষেত-খামার অঞ্চলে এসে পড়লাম। সমতল অংশে একটা ছোট মন্দির দেখলাম। শুনলাম মন্দিরের ভেতরে 'দোংজুর' অর্থাৎ কোটি কোটি মন্ত্রভরা ঘোরানো ঢোল আছে। এই ঘোরানো ঢোল বা 'মানী'র প্রথা তিব্বতে প্রচলিত হয় পনেরো শতকের পরে। এখানে তো আরও অনেক পরে। কিন্তু এখানের এই সমতলভূমির কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের অস্তিত্ব আমার মনে সংশয় জাগিয়ে তুলল। নিশ্চয় এখানে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই মন্দির ছিল। বিজয় লামা বললে, 'না না এটা নতুন মন্দির।' আমি সে কথা না শুনে মন্দিরের ভেতরে গেলাম। মন্দিরের ভেতরে একটা বড় 'মানী' নিয়ে শ্রীথরছিনের বড়ভাই ভক্তি সহকারে ঘোরাচ্ছিলেন। দুঃখ করে বললেন, 'বুড়ো হয়েছি, নজর চলে না। এখন এই ধর্মকর্ম করে বাকি ক'টা দিন কোনোমতে কাটিয়ে দিচ্ছি।' বিজয় বললে, 'কি আর দেখবেন এখানে, এক ঢোল ছাড়া আর কিছুই নেই' আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না যে, 'মানী' ছাড়া আর কিছু নেই। 'মানী'-র পেছন দিকে গিয়ে দেখলাম দুটি পুরনো, খুব পুরনো বোধিসত্ত্ব মূর্তি রয়েছে। ঐ দুটি ছাড়া আরও একটির জায়গা খালি পড়ে রয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে আরও একটি মূর্তি ছিল। আসলে এ মন্দির বোধিসত্ত্ব শাক্যমুনি কিংবা 'অবলোকিতেশ্বর মঞ্জুশ্রী বজ্রপাণি' বোধিসত্ত্বত্রয়ের মন্দির। পরে, লামাদের বাজারে এই 'মানী' ঢোলের দর বাড়ল। কারণ, পুণ্য অর্জনের এমন শর্টকাট দুনিয়ায় আর নেই। একবার ঢোল ঘুরোলেই তার গায়ে লেখা লক্ষ-কোটি মন্ত্রজপের কাজ হয়ে যায়। অতঃপর মূল বিগ্রহের চেয়ে স্বভাবতঃই ঢোলের কদর বেশী হয়ে দাঁড়াল—মূর্তি পড়ল ঢোলের পিছনে ঢাকা। সব দেখে-শুনে লামা বিজয় দীর্ঘায়ুর চোখ কপালে উঠল। এই পুরনো মন্দিরের সাহায্যেই আমরা স্পুয়ের ইতিহাসকে এগারো শতক পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু স্পুয়ের ইতিহাস তার চেয়েও পুরনো। লিপ্পার মতো এখানকার মাটিতেও সমাধি গহ্বরের প্রাগৈতিহাসিক বাসন-কোসন পাওয়া গেছে, এখনও পাওয়া যাচ্ছে প্রায়ই। তবে এ সব জিনিস আকস্মিকভাবেই পাওয়া যায়, ফরমায়েসী জিনিস নয় যে হুকুম করলেই দেখা যাবে। অনেক বলা-কওয়ার পর একজন একখানা বাসন জোগাড় করে এনে দিলো। দেখলাম লিপ্পার তুলনায় এটার গঠন-সৌন্দর্য অনেক নিচুস্তরের। সব দেখেশুনে এসে শয্যাগ্রহণ করলাম—এখন নিদ্রা ছাড়া করণীয় নেই কিছু।

পরের দিন ২০শে জুন সকালবেলা বেরুলাম গ্রাম দেখতে। প্রথমে গেলাম ডুক্‌পা সম্প্রদায়ের পুরনো মঠ 'গুম্ফা' দেখতে। ভেবেছিলাম পুরনো মঠ যখন, নিশ্চয় পুরনো দিনের দ্রষ্টব্য কিছু পাব। সে গুড়ে বালি। গিয়ে দেখলাম মঠ আর নেই। আগের সাধুরা বিয়ে থা করেছেন। তাঁদের ওপর মা ষষ্টির কৃপারও অভাব হয়নি। বাচ্চা-কাচ্চায় মঠ ভরে গেছে। মঠ না বলে এখন গেরস্ত-বাড়ি বলাই ভালো। যৌন বিষয়ক কড়াকড়ি

করার ফলে মঠের সাধুদের (সে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্চান আর যে কোনো ধর্মেরই হোক) যে কুৎসিত প্রতিক্রিয়া দেখেছি, তাতে গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে। মনে হয়, পরিব্রাজকদের জীবনে যৌন-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি শিথিল করা দরকার, নইলে এর প্রতিফল পেতে হবে। কিন্তু যৌন স্বাধীনতা পেলেই তো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মঠের মধ্যে ঘর-গেরস্থালি শুরু হয়ে যাবে, তার কি উপায়?

তিব্বতের রালুঙ মঠে যৌন-সংসর্গের অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। তার পরিণাম মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। পরিব্রাজক-পরিব্রাজিকাদের যৌন-সম্ভোগের স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ফলে বছর না ঘুরতেই মঠ ভরে গেলো নবজাত শিশুর ভিড়ে। সেইসব শিশুরা বড় হলে, ছেলেরা হলো পরিব্রাজক, মেয়েরা পরিব্রাজিকা। তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষে পরিব্রাজিকাদের একটা আস্ত গ্রামই বসে গেলো। মঠের যা দেবত্র সম্পত্তি ছিল তাতে আর সকলের সঙ্কুলান হয় না। সাধারণ লোকের মনেও আর মঠের প্রতি কোনো ভক্তির আকর্ষণ রইল না। কাজেই অনিবার্যভাবে আয় কমে গেলো। এমনটা হতো না যদি যৌন-উপভোগ আর জন্মনিরোধ দুটোর প্রতি একসঙ্গে লক্ষ্য রাখা হতো। তা'হলে এত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। ক্ষেত-খামারের পরিমাণ অনুযায়ী আয়ের মাত্রা হ্রাস হবার কোনো প্রশ্নই উঠত না। বাইরের লোকের চোখে হেয় না হলে পূজার্চনায় প্রণামী আসাটা বন্ধ হতো না। সব দিক তো বিবেচনা করেই চলা উচিত।

ডুক্‌পা-গুম্ফা থেকে বাইরে বেরিয়ে পথে চলতে চলতে ক'টি মেয়েকে দেখলাম। বেশ ছিমছাম মার্জিত রুচির তরুণী। ওরা মোজা বেনিয়ান বুনতে বুনতে পথ চলছিল। এই অভ্যেসটি, আমার বড় সুন্দর লাগে। বোনার অভ্যেস ওদের আগেও ছিল, কিন্তু এই সহজ-সরল পন্থাটি পাদরীদের শিক্ষার দান।

বরছো বস্তীতে ভূতপূর্ব নম্বরদার দেবীচন্দের বাসায় গেলাম। সে টাকা-পয়সায় গোলমাল করায় পদচ্যুত হয়েছিল। তার কাছে না-কি অনেক প্রাচীন জিনিসপত্র বিশেষ করে পুথিপত্র আছে। তার সব কথা ষোলো আনা বিশ্বাস করা যায় না তাই এসেছিলাম নিজের চোখে পুরনো জিনিস দেখব বলে। শুনলাম, সে বাড়ি নেই। আমার সঙ্গে দেখা করতেই না-কি বাংলোয় গেছে। দুর্ভাগ্য আমার।

দেবীচন্দ্র লোকটা বেশ সমঝদার। তুচীর সঙ্গে তিব্বত ঘুরে এসেছে। বললে, 'তুচী তিব্বতের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বোঝা ভারি হয়ে যাবার ভয়ে, তা থেকে ছবিগুলো কেটে রেখে তুচী নিজেই পুথিগুলি পুড়িয়ে ফেলেছেন।' আমি জানি, এ সব কথার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিতে হয়। প্রাচীন পুথি অত সস্তা নয় যে, পেলাম আর চুলিগাছের পাতার মতো পুড়িয়ে ফেললাম। দেবীচাঁদের বাসার কাছেই একটা পুরনো দুর্গ রয়েছে দেখলাম। দুর্গ না বলে আজ সেটাকে ভগ্নস্তূপ বলাই উচিত। দুর্গের নাম ছিল সিদ্ধার্থপ্রাসাদ। কে এক তহশীলদার এই দুর্গের অনেকগুলো পাথর খুলে নিয়ে গিয়ে একটা নতুন পান্থশালা বানিয়ে দিয়েছেন।

এখানকার নরনারী ভোট ভাষাভাষী হওয়ায় আমার পক্ষে খুব সুবিধে হয়েছে কথা বলার। আমার আর দোভাষীর দরকার হচ্ছে না। কাজেই বেশ মন খুলে কথাবার্তা

বলছি। আর অভিজ্ঞতাও লাভ করছি বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। মনে রাখতে হবে, এখন আমি ভারত সীমান্তের সর্বশেষ গ্রামটিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে এই শতাব্দীর আলোর রেশটুকু এখনও পৌঁছায়নি। ইংরেজরা যে এ দেশ ছেড়ে গেছে, এ খবর এদের অজানা। এরা মনে করে, এখনও ইংরেজদের গোলাম রামপুরের রাজার রাজত্ব চলছে। রাতারাতি সব পাল্টে গেছে, হিমাচল সরকার গঠিত হয়েছে, এরা এ সব কিছুই জানে না। বলতে গেলে উল্টে সংশয় প্রকাশ করে। ইংরেজ চলে গেছে তো নোটের ওপর তাদের রাজার ছবি কেন? তা তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কেবল নোটের ওপর রাজার ছবির কথাই নয়, আরও এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাতে এরা তো অবুঝ অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক, সত্যিকার লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান লোকেরও ভ্রম হয়, তবে বুঝি এখনও বৃটিশের তাঁবে আছি। এই ধরুন না ইংলণ্ডের রাজা-রাণীর জন্মতিথি উপলক্ষ নিয়ে কি ঘটা, কি বাড়াবাড়িটাই হলো আমাদের দেশে।

এখান থেকে চার-পাঁচ দিনের রাস্তা—গর্ভোকে প্রতি বছর গরমকালে ভারত সরকারের বাণিজ্যদূত গিয়ে থাকেন, তিনি আজও 'বৃটিশ ট্রেড এজেন্ট' বলেই পরিচিত। এ সব দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি নেই। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান কিংবা প্রশ্ন করুন, এমন ধোঁয়া-ধোঁয়া রকমের জবাব, এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাবেন যাতে কিছুই পরিষ্কার হবে না। বোকা-সোকা সরল গেঁয়ো লোক, চিরকাল দেখে এসেছে ইংলণ্ডের রাজাই হিন্দুস্থানের শাসনকর্তা, তাই তার ছবি এরা আজও শাসনযন্ত্রের প্রতীক হিসাবেই মনে করে।*

মিশনরীরা থাকতে এখানে ডাকঘর ছিল, তারা স্কুলও খুলেছিল। তাদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুই-ই বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের বাড়িটা এখনও আছে। ক'বছর আগে রামপুর রাজ্যের তরফ থেকে স্কুলটাকে আবার চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু ছাত্র-সংখ্যা কম বলে সে চেষ্টা আর সফল হয়নি। এক হাজারের মতো বসতি যে গ্রামে সেখানেও আজ একটা স্কুল নেই। স্কুলে ছাত্র হলো না অতএব স্কুল বন্ধ করে দাও—এ নীতিতে শিক্ষাবিস্তার হয় না। কেন ছাত্র হয় না, তার কারণ অনুসন্ধান করা নেই—কোনো চেষ্টা নেই। একবার ধর্মসাক্ষী স্কুলের দরজা খোলা হলো, ঘন্টা বাজানো হলো—কেউ এল, কেউ এল না—দাও দরজা বন্ধ করে। এ রকম করে শিক্ষার প্রসার হয় না। এখানকার স্থানীয় ভাষা 'ভোটিয়া' (তিব্বতী)। সুতরাং এদের প্রাথমিক শিক্ষা ঐ ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। তিব্বতী ভাষায় হিন্দী শব্দ নেই। প্রথম থেকেই হিন্দীতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা করলে এদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে। এরা লেখাপড়া শিখতেই চাইবে না। আমার মতে প্রথম দুটো শ্রেণীতে একমাত্র তিব্বতীই পাঠ্য হওয়া উচিত। 'হনুমান চরিত' গোছের ধর্মপুস্তক ভোট ভাষায় অনুবাদ করিয়ে দিলে, এরা খুব নেবে। এরা ঐ

* লেখকের 'কিন্নর দেশে' ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা, হয়ত সাম্প্রতিক সরকারী কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলবে না। উদাহরণত, নোটের ছবি বদলেছে। শাসনযন্ত্রে পরিবর্তনের চিহ্ন দেশের সর্বত্রই আংশিকভাবে লক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ এমন এক কাহিনী যার দুর্গম দূরত্বের কথা লেখক পূর্বাহ্নেই জানিয়েছেন। —*অনুবাদক*

জাতীয় বই, ভূত-ছাড়ানো বা পুণ্য করবার জন্যেই পড়ে থাকে। খুব সহজেই প্রথম দুটো শ্রেণী ছাত্রেরা অতিক্রম করে যাবে। তত দিনে তাদের মধ্যে শেখবার-জানবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠবে। তারপর তৃতীয় শ্রেণী থেকে তিব্বতীর সঙ্গে হিন্দী চালান- দেখবেন শেখার উৎসাহ। আমি চীফ কমিশনার শ্রী এন.সি. মেহতাকে এই ব্যাপার নিয়ে লিখেছিলাম। তিনিও আমার মতেই সায় দিলেন। বললেন, 'এই ব্যবস্থাই করা দরকার।' তারপর আর কতদূর কি হলো জানি না। হয়ত সত্যিই একদিন এখানে স্কুল হবে কিন্তু সে কবে তা কে বলবে!

কর্তৃপক্ষের আদেশে স্পু'র স্কুল উঠে গেলো। উঠে গিয়ে কিছুদিন হঙগো গ্রামে স্কুল বসল। এটাও 'হঙরঙ' (হঙরঙ তিব্বতী বা ভোট ভাষাভাষী অঞ্চল। যেমন স্পু, হঙগো ইত্যাদি) তিব্বতী ভাষাভাষী এলাকা। কিন্তু সেখানেও চলল না। ইন্সপেক্টর সায়েব বললেন, চলবে কোত্থেকে? ওখানকার লোকে চায় না স্কুল, পাঠশালা—তাদের ছেলেরা আসবে কেন? কাজেই সে স্কুলও বন্ধ হয়ে গেলো। ওখানকার লোক চায় না কারণ তারা মূর্খ, তাদের উন্নতি কিসে হবে এ তারা জানে না। তাই স্কুল, পাঠশালাকে বিলাস মনে করে ত্যাগ করে।

এতে করে 'শুবা'র লোকেরই সুবিধে। হঙরঙের লোক যত মুখ্যু থাকবে, 'শুবা'র লোকের ততোই লাভ (শুবা—কিন্নর ভাষাভাষী অঞ্চল। যেমন সুংনম, লিপ্পা)। শুবার মহাজনেরা চিরকাল হঙরঙের চাষীদের শোষণ করে এসেছে, তাদের শোষণযন্ত্রের কায়েমী ব্যবস্থার ফাঁদে পড়ে ভোট ভাষাভাষী লোকগুলো প্রায় উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ বুশহর রাজ্যের সার্ভে করালেন। দেখা গেলো যদি হঙরঙবাসীদের অবিলম্বে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করা যায়, তা'হলে শুবাওয়ালাদের হাতে তাদের যথাসর্বস্ব খোয়াতে বেশীদিন লাগবে না। শুবার মহাজনদের শোষণের পদ্ধতিটি বেশ নিখুঁত। হঙরঙে গরীব চাষীর বাস—তাদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর— দিন আনে দিন খায়। নিত্য প্রয়োজনে তাদের অভাব লেগেই আছে। শুবার মহাজনদের দরজায় হাত পাততে হবেই তাদের, আর মহাজনরা তো তাই চায়। তারাও দরাজ হাতে ওদের ঋণ দিতে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসল, আনাজপত্রেই কর্জ দেবার রীতি। তারপর বছরের শেষে সুদে আসলে যা দাঁড়াল, তার পরিমাণ আসলের চেয়ে দেড়গুণ, দু'গুণ। তখন সেটাকে মূল ধরে আবার সুদের চক্রবৃদ্ধি হিসেব চলতে থাকে। তারপর একদিন দেখা গেলো—ঋণের পরিমাণ অধমর্ণদের পরিশোধ ক্ষমতার বাইরে; ব্যস মহাজনদের পোয়াবারো। দেখতে দেখতে জোতজমি ক্ষেতখামার যার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল—সব দেনার দায়ে গিয়ে উঠল মহাজনদের ঘরে। মানে, পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে শোষণের যে নিয়মিত প্রক্রিয়া চলে আসছে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কর্জ পরিশোধে অসমর্থ হতভাগ্য হঙরঙের চাষী এক শুভদিনে (!) সমাজের সামনে মহাজনের মাথায় তেল লাগিয়ে দিয়ে প্রমাণ করত যে, তার জমি জায়গা এখন মহাজনের কাছে বিক্রীত।

রঘুনাথ সিংহ প্রথমে এই ব্যবস্থার প্রতিকার করতে চাইলেন। তিনি আইন জারি করে এই জমি 'কিনে নেওয়া' নিষিদ্ধ করে দিলেন। এতে আংশিক কাজ হলেও

শোষণের পথ একেবারে বন্ধ হলো না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে নানান নতুন ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করেছে শুবাওয়ালারা। 'ক্ষেত কিনতে' না পারলেও, বন্ধকী জমি হিসেবে ভালো ভালো চাষের ক্ষেতগুলো সব তারা হস্তগত করেছে। 'রেহন' বন্দোবস্ত করে ফসলের বেশ মোটা ভাগ নিজেরা আত্মসাৎ করছে। ভাগচাষীরা অন্যত্র বিঘা পিছু দু'মণ করে ফসল মহাজনকে দেয়। আর এখানে তাদের বিঘা পিছু ছ'মণ করে দিতে হয়। রেহনের কোনো দস্তাবেজ নেই। তহশীলদার সায়েব দেনাদারের মুখের কথা কাগজে লিখে দেন—সেটাই প্রমাণ। আবহমান কালের চিরন্তন শোষণ-ব্যবস্থা, সেই একই প্রবঞ্চনার ইতিহাস, অথচ আমরা না-কি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা!

প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ভারত সরকারের অধীনে স্বাধীন হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছে—তাতে এই গরীব অশিক্ষিত প্রজার কি লাভ হয়েছে, একটু খতিয়ে দেখা যাক। সরকার এখনও বিত্ত-বৈভব এবং পুথি-পড়া বিদ্যার প্রভি যথেষ্ট মোহগ্রস্ত। এইসব গরীব মুখ্যুলোকেরা না জানে দুটো কথা গুছিয়ে বলতে না কেউ সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা শোনে। তাদের হয়ে, তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার জানাবার কেউ নেই। অন্যদিকে, মহাজন পক্ষ ধনী এবং তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়। তারা সরকারের দরবার করে দেশীয় রাজার আমলের যত 'একদেশদর্শী' আইন রদ করে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে নতুন কানুন চালু করবার চেষ্টায় আছে। পাছে ইতিমধ্যে সরকারের ছেলেমানুষিতে হঙরঙের 'বিত্তহীন, 'চিরমূর্খের দল' লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে মানুষ হয়ে যায়, তাই তাদের দ্বিতীয় চেষ্টা হলো এখানে স্কুল স্থাপন না করতে দেওয়া। আর এ কাজে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কথা দুঃখের, কিন্তু সত্যি।

এখানে একটা কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদি সরকার সত্যিই হঙরঙের বাসিন্দাদের লেখাপড়া শেখাতে চান, তা'হলে অবিলম্বে এই নীতিগুলি পালন করতে হবে : (ক) জানতে হবে, মহাজনশ্রেণী এই শিক্ষা সম্প্রসারণ উদ্যোগের পরিপন্থী, কাজেই এই বিভাগে তাদের কোনো প্রতিনিধি রাখা চলবে না; (খ) মহাজনদের পেটোয়া কোনো লোককে পড়ানোর কাজে রাখা চলবে না; (গ) তিব্বতী ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম এবং এই অঞ্চলের অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলে গণ্য করতে হবে; (ঘ) তৃতীয় শ্রেণী থেকে নিয়মিত হিন্দী শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করতে হবে; (ঙ) লাদাখের সর্বত্র তিব্বতী তাষার পাঠ্যপুস্তক, বর্ণমালা, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ানো হয়, সেই জাতীয় বই চালু করতে হবে।

তিব্বতী বর্ণমালা, ব্যাকরণ আর চারখানি পাঠ্যপুস্তক আমি নিজেই লিখেছি। বর্ণমালাটি আমারই আবিষ্কার। এই ধরনের প্রচুর বই ভবিষ্যতে লেখা হবে, আশা করি।

কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন কথা আর কি বলব? মনে হয়, সরকার ইচ্ছে করলেই এর সুরাহা করতে পারেন। একজন বিশ্বস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির অধীনে কমিশন নিয়োগ করা যেতে পারে। এমন একজন লোককে নির্বাচন করতে হবে, যিনি মহাজনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন না। কমিশনের কাজ হবে রামপুরের সেরেস্তা ঘেঁটে পুরনো নথিপত্র বের করে আসল অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা। গত পঞ্চাশ বছরের কাগজ দেখলে

হয়ত জানা যাবে আসল কর্জের পরিমাণ কত ছিল। তারপর হঙরঙে স্থানীয় তদন্ত করে বের করতে হবে— জনে জনে প্রশ্ন করে, জমির পরিমাণ, সুদের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কেমন করে জমি হাত-ছাড়া হয়েছে তার ইতিহাস।

তহশীলদার মংগলরামজী আমাকে দুঃখ করে বলছিলেন, 'হঙরঙের ভূমির উর্বরতা অসীম, সোনার ফসল ফলে। অথচ, যারা ফসল ফলায়, তারা সারা বছর আধপেটা খেয়ে, না-খেয়ে, জীর্ণ পোশাক পরে কাটিয়ে যায়। তারও মনে করে মহাজনদের দয়ায় বেঁচে আছে।' এই অবস্থা, এই রক্তশোষণ নীতির অবসান কি সরকার ঘটাতে চান? তা'হলে আজই কোমর বেঁধে লাগতে হবে। দশ বছরের বন্ধকী জমি সব খালাস বলে ঘোষণা করে দিতে হবে। গত দশক ধরে পাওয়া টাকা পরিমাণে তাদের আসল পাওনা ছাপিয়ে অনেক বেশী হয়ে গেলে তার ব্যবস্থাও নিতে হবে। ঋণ শোধের হিসাব হঙরঙের প্রচলিত শোষণের ধারা হবে না—হবে রাজ্যের অন্যত্র প্রচলিত ধারায়। তাও ফসল হলে তবে। ফসল না হলে সে বছর কর্জ মকুব করতে হবে। এইসব ব্যবস্থা যদি শীঘ্র না করা যায়, তা'হলে সামনে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। বাইরে বাতাস বইছে, আগুনের সামান্যতম স্ফুলিঙ্গটিও বিপর্যয় ঘটিয়ে তুলতে পারে। একবার যদি দেশ বিদেশের হাওয়া আসতে শুরু করে, তবে এ রাজ্যে গোলমাল বিশৃঙ্খলা হবেই। স্মরণ রাখতে হবে এটা সীমান্ত অঞ্চল, পাশেই একটা বিদেশী রাজ্য (তিব্বত)। এখানে গোলোযোগ হলেই সেটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে, তখন বিপদ সামলানো যাবে না। সব ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে বলার কারণ আছে। গোলমালের সূচনা আমি নিজেই দেখে এসেছি।

একটা উদাহরণ দিই। সামনেই সাধারণ নির্বাচন। মাস দুয়েক আগে ওপর থেকে হুকুম এল একুশ বছরের বেশী বয়সের স্ত্রী-পুরুষদের নামের তালিকা পাঠাও। তহশীলদার বেচারা পুরনো দিনের রিয়াসতের (দেশীয় রাজ্যের) কর্মচারী। ভোটাভুটি, নির্বাচন এ সব বোঝবার কোনো দরকার তার কখনও হয়নি। কয়েকটা টেক্‌নিকাল পয়েন্ট বুঝি বুঝতে পারেনি। তার মধ্যে একটা ছিল, বিশেষ অপরাধের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এই কথটা তহশীলদারে বোধগম্য হয়নি। সে বেচারা রামপুরে লিখল, স্পষ্ট করে জানাও কিসের অপরাধ, কাকে বঞ্চিত করতে হবে...ইত্যাদি। কাকস্য পরিবেদনা, তারা জবাবই দিলো না। বিষয়টির অবোধ্যতা খোলসা করা তো দূরের কথা, বারবার তাগাদা দিয়েও কোনো ফল হলো না। এদিকে আদেশ, প্রতি মাসে পক্ষকালীন রিপোর্ট, ভোটদাতাসূচী প্রণয়নের প্রগতির বিবরণ জানাতে হবে।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার এলাকার ভোটারসূচী তৈরির কাজ কেমন এগোচ্ছে?' তখন সব কথা শুনি। বেচারা তহশীলদার হাত গুটিয়ে বসে আছে— কবে রামপুর জবাব দেবে। আমি বললাম, 'আপনার চিঠি গিয়ে দেখুন রামপুরে পড়ে পচছে। এ সব কানুনী ব্যাখ্যা কি ছাই তারাই বড় বুঝেছে? ও দিকে হিমাচল সরকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—ভোটার লিস্ট তৈরি হচ্ছে। নির্বাচনী তারিখ কাছাকাছি এসে গেলে তখন টনক নড়বে তাদের। রামপুর তখন বলবে, আমরা কি জানি, আমরা তো

ঠিক সময়ে খবর দিয়ে দিয়েছি। আমাদের কি দোষ? আপনার চিঠির কথা তারা বেমালুম চেপে যাবে। তখন সরকারের কাছে আপনিই অযোগ্য সাব্যস্ত হবেন। ও সব অপরাধীর দণ্ড, ভোটাধিকার প্রত্যাহার ইত্যাদির দায়িত্ব জেলা-শাসকের, আপনার নয়। আপনার এলাকায় ভোট দেবার অধিকার দিলেন কবে যে কেড়ে নেবেন? ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এইবেলা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাবালক মেয়ে-পুরুষের একটা মোটামুটি ফর্দ বানিয়ে ফেলুন। আর বেশী সময় নেই। শুধু পাগল আর বিদেশী, এবং ভিনগাঁয়ের লোককে তালিকাভুক্ত করবেন না।'

এই তো গেলো ফুল্‌কির ইতিহাস। এখনও আসল দাবানল বাকি আছে। তার চেহারা দেখুন কি হয়। চারদিকে নানা ধরনের লোক আছে। কেউ বা গোঁড়া আত্মভোলা কেউ বা মতলববাজ মুনাফাখোর রক্তপায়ী। তারা সবাইকে বোঝাবে—হ্যাঁ, একুশ বছরের জোয়ান ছেলে ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠাবে। জোয়ান মেয়ে এখানেই পঞ্চাশ টাকা দর। নিচে গেলে তো আক্‌ছার একশো টাকায় বিকোবে।

ভারত-তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম নম্‌গ্যা। গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভৌগোলিক গুরুত্বের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। ভেবেছিলাম, বোধহয় নম্‌গ্যায় যাবার সুযোগ হবে না। ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছিল না, রাস্তা দুর্গম। শেষে তহশীলদারের চিঠি পেয়ে নম্বরদার ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে ফেললে।

২৮শে জুন নম্‌গ্যার রাস্তায় রওনা হয়ে গেলাম। নম্‌গ্যা গ্রাম এখান থেকে পাকা আট মাইলের পথ। সিমলা থেকে ১৯৪ মাইলের মাথায়। প্রথম আড়াই মাইল সমানে নিচের দিকে নামতে হলো। সামনেই শতদ্রুর ওপর ১৬৫ ফিট লম্বা লোহার ঝোলানো সেতু। সেতু পার হয়ে ডুব্‌লিং গ্রামের ক্ষেত, গ্রামটা আরও কিছুটা দূরে। ডুব্‌লিংয়ের কাছেই ডাব্‌লিং গ্রাম। তাই লোকে সংক্ষেপে নদীর ওপারকে 'ডুব্‌লিং-ডাব্‌লিং বলে থাকে। সেতু পার হয়ে রাস্তা কিছুটা সমতল, তরপরে চড়াই। চড়াই শেষ হলো একটা বাঁকের মুখে। সেখান থেকে 'খব' গ্রাম দেখা যায়। খব থেকে নম্‌গ্যা মাত্র মাইল খানেক, মাইল দেড়েক রাস্তা। এ পারের গ্রামগুলি খুব ছোট। ডুব্‌লিং-ডাব্‌লিং-এ ২৫ ঘর; খব-এ ৮ ঘর; নম্‌গ্যায় ৩০ ঘর; নম্‌গ্যার ওপর টশিগংয়ে ৯ ঘর বাসিন্দা। অপরূপ সুন্দর সবুজ ক্ষেত-ভরা গ্রামখানি। ফল-মেওয়ায় এর ৯৮০০ ফিটের ঠাণ্ডা সবুজ বাগ-বাগিচা সব সময়ে ভরে আছে। অথচ চালান দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

খব গ্রামের কাছে একটা ছোট নদী এসে শতদ্রুতে মিশেছে। এটাই স্পিতী নদী। নম্‌গ্যার এক ভক্তের ঘরে একটা পুরনো তিব্বতী পুথি পেলাম। তাতে শতদ্রুর নাম 'লং-ছেন-ছু' অর্থাৎ হাতী। পুরাকালের ঋষিরাও বলেছেন গন্ধমাদন আর হিমবাহ পর্বতের মাঝে 'অনবতপ্তসর' (মানস সরোবর) হ্রদের চারদিকে চারটি মুখ আছে। সেই চার মুখ থেকে চারটি বিভিন্ন নদী বেরিয়েছে, যার গোমুখ থেকে গঙ্গা। গজ মুখ থেকেও একটি নদী বেরিয়েছে।—সেটাই শতদ্রু। নম্‌গ্যা থেকে দু'মাইল দূরে ভারত-তিব্বত সীমানা—একটা শুক্‌নো নালা।

নম্‌গ্যায় আট-ন'বছর আগে একবার [illegible] আগুনে সব ঘরবাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এ অঞ্চলে হাওয়ার [illegible]ই বেশী। একবার বইতে থাকলে

তারা উনপঞ্চাশ ভাই একসঙ্গে কাজে লেগে যায়। কাঠে বাড়িঘরে আগুন লেগে পুরনো গ্রাম একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এরাও লড়াইয়ে পিছপাও নয়। কুছ পরোয়া নেই—কোমর বেঁধে লেগে গেলো নতুন গ্রাম বানাতে। তা'ছাড়া উপায়ই বা কি? ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের মতো অফিসের ফাইল ওল্টাতে আঠারো মাসে বছর করলে তো এদের চলবে না। মাথার ওপর শীত, দশ হাজার ফিটের ঠাণ্ডা, চব্বিশ ঘণ্টা তুষারপাত, হিমেল হাওয়ার উৎপাত—বাঁচতে হবে তো? আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, আমাদের শরণার্থীদের কথা ভেবে। গোটা বর্ষটাই মাথার ওপর নিয়ে কাটিয়ে দিলে মশায়...

নম্‌গ্যা একবার দুর্ধর্ষ 'কজ'ক'দের আক্রমণ থেকে জোর বেঁচে গেছে। ইসলামের ধ্বজা ধরে চালাকি করতে গিয়েছিল একদল ধর্মান্ধ বদমায়েস। সোভিয়েত কির্গিজিস্তানের কথা বলছি। তারা কতকগুলো মেয়েপুরুষকে মেরে কেটে, রক্তারক্তি করে, ভেবেছিল সোভিয়েত ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে—কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই। শেষকালে মার খেয়ে পালাতে পথ পায় না। তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে হন্যে কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল চীন-তুর্কিস্তানে, সেখান থেকে তিব্বতে। তিব্বতের গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে শিপকীর দিকে পা বাড়াল। তিব্বতের এলাকা থেকে বহু আর্ত নরনারী ত্রাণ নিতে এল নম্‌গ্যায়। দস্যুদলের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে আর এদের হাতে এমন কোনো হাতিয়া নেই যে তাদের রুখবে। বিধি সদয়। শেষ পর্যন্ত কজাকরা আর এল না। বোধহয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নতুন করে হিমালয় পার হবার শক্তি ছিল না। গিয়ে জুটল কাশ্মীরে। অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে আশ্রয় ভিক্ষা করল। কিছুদিন কাশ্মীরে কাটিয়ে তারপর হাজরা জেলায় ডেরা জমিয়েছিল। এখন তাদের নিরাপদ আশ্রয় জুটেছে। তারা এখন পাকিস্তানের নাগরিক। সংখ্যায় সহস্রাধিক এই হীন দস্যুদল অনেক ঐতিহাসিক কুকীর্তির স্রষ্টা।

শান্ত স্তব্ধ রাত্রি। চারপাশে দশ হাজার ফিট উর্দ্ধের মনোরম শৈত্য। বাংলোর ভেতরে নিবিড় কবোষ্ণ শয্যার উত্তাপ। পিসুর কামর নেই, ছারপোকার জ্বালা নেই। আরামে ঘুম নেমে আসার কথা। কিন্তু ঘুম এল না। চিন্তা! চিন্তায় ভেসে এল অতীতের কাহিনী।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ (৬৪০-৫০ খৃঃ.), প্রথম ভোট সম্রাট স্রোংচন্‌গম্বো আর তার বর্বর হিংস্র যাযাবর সৈন্যদল। সমস্ত হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চল আর শান্তিপ্রিয় লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে চলেছে। নম্‌গ্যা হয়ত প্রতি মুহূর্তে কাঁপছিল ভয়ে ভাবনায়—কখন আসে শমন। এই গ্রামের সে সময়কার বাসিন্দা ছিল কারা, তা কে জানে! ইতিহাস হয়ত বলতে পারে। তারা শুনেছিল এ শত্রু ভীষণ, অপরাজেয়। এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেউ রক্ষা পায়নি। পালিয়ে গিয়েও রেহাই পাইনি। একমাত্র বাঁচবার উপায় হলো—তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। তারা কি করল তা বলতে পারি না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারি— বশ্যতাই স্বীকার করেছিল। হয়ত কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছিল। তাদের বিদেহী আত্মা অনেক শতাব্দী আগেই পরেলোকে চলে গেছে। তাদের দেহগুলো আজ শান্তিতে, হয়ত বা অতৃপ্তি নিয়েই, না জানি শুয়ে আছে মাটির

তলায়—কবরের নিচে। হয়ত তারা ছিল বীর, ছিল দেশপ্রেমিক অথচ তাদের কথা কেউ জানে না। তাদের ভাষায় কেউ আর আজ কথা বলে না। তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। হয়ত সেই পুরনো জাতের লোকগুলো আজ পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে অন্য কোনো নামে বেঁচে আছে। কি ভাষায় তারা কথা বলত, ইতিহাস বলতে পারে। কিন্তু নম্‌গ্যা (না. তখন এর নাম অন্য ছিল) মেনে নিয়েছিল পরাক্রান্ত শত্রুর অধীনতা। তাই বেঁচে গিয়েছিল। আর এই বেঁচে যাওয়া, বেঁচে থাকাটাই সব। কি করবে তারা? পালিয়ে যাবে কোথায়, নিচেয় গরমে বাঁচবে কেমন করে? আর সমস্ত হিমাঞ্চলটাই তো স্রোংচনের দখলে। তারপর পালাবে কেমন করে? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা দিচ্ছে দুর্ধর্ষ নারীমাংসলোলুপ ভোট সৈন্য—তারা মেয়ে নিয়ে পালাতে দেবে! তা সত্ত্বেও হয়ত কেউ কেউ পালাল, বেশীরভাগই রয়ে গেলো তিব্বতী রাজার অধীনে। তারপর এল তিব্বতের ধর্মগুরুর দল, ভোট-ভিক্ষুরা প্রচার করল তিব্বতের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি।

শত শত বছর কেটে গেছে। সে দিনের নম্‌গ্যার পুরনো নাম আজ সবাই ভুলে গেছে। সে দিনের বাসিন্দাদের কথা আজ আর কারও মনে নেই। কবরে শুয়ে যারা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে তাদের ভাষা কেউ বোঝে না শুধু নম্‌গ্যা কেন, সারা পৃথিবীর মানুষের এটাই ইতিহাস।

কিন্নর দেশ

২৩শে জুন বেলা ন'টায় স্পু ফিরে এলাম। দু'-তিন দিন থাকবার ইচ্ছে। স্পুতে পনেরো ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। তবুও জায়গাটা বেশ আকর্ষণীয়। ফেরার পথে সেই মোঙ্গল যাযাবরের সঙ্গে দেখা, অনেক কথাবার্তা হলো। ও বেচারা আগে একজনের বাড়িতে পূজো-আচ্চা করত। কিছু করে খেতে হবে তো। তিরিশ বছর আগে দেশ ছেড়েছে। লাসার ডেপুং অঞ্চলে প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর কাটিয়েছে। তারপর গত পাঁচ-ছ'বছর 'সিদ্ধাই' নিয়ে আছে। লাসার বন্ধু-বান্ধবদের কথা তার কাছে শুনলাম। 'গেশে ভন্দর'কে ওরা মেরে ফেলেছে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে রইল...

পুন্যসাগর আমায় পরে খবর দিলে, মোঙ্গল একা নেই। তার সিদ্ধাইচর্যার সঙ্গিনী এক যোগিনীও তার সঙ্গে রয়েছে। দু'জনেই দেশে ফেরার ইচ্ছা রাখে। যদিও দেশের প্রচণ্ড গরমে গায়ে বড় বড় ফোস্‌কা পড়ে যেতে পারে। তবুও—দেশ, সে দেশই।

২৫শে জুন সকালে স্পু ছাড়লাম। শ্বাস্যোর সেতু পর্যন্ত হেঁটেই এলাম। রাস্তায় গ্লেসিয়ার অনেক গলেছে কিন্তু এখনও অনেক জমে আছে। মজুরেরা রাস্তায় কাজ করছিল, তাই রক্ষে। নইলে পথে যে কোনো সময়ে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কনম ডাকবাংলোয় যখন পৌঁছালাম, মাথার চাঁদি যেন ফেটে যাচ্ছে। মনে হলো 'লু' লেগেছে, কিন্তু এখানে 'লু' লাগার সম্ভাবনা নেই। আসলে, খালি মাথায় এতখানি পথ চলাটাই খারাপ হয়েছে। রোদের তেজও খুব। কনম আমাদের দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। নেহাতই নামমাত্র বৃষ্টি কিন্তু বাইরে যাওয়া চলে না। বাংলোর বারান্দায় চৌকি বিছিয়ে বসলাম। বেলীরামের ভাই নম্বরদার অমরজিৎ এই বাংলোর চৌকিদার। তার সঙ্গে বসে গল্প-গাছা করতে লাগলাম। কাল সারাদিন ঘুরে কনম দেখা যাবে। আজ বিশ্রাম।

২৬শে জুন আমরা অর্থাৎ আমি আর পুন্যসাগর গ্রাম দেখতে চললাম। প্রথমেই গেলাম 'কগ্যুর-লাখং' অর্থাৎ পুথিমন্দিরে। তারপর গ্রাম-দেবতা শ্রীঢবলার দর্শনে যাব। মন্দির কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটা ঠিক করে বলা যায় না। এখানকার লোকের ধারণা এ মন্দির সত্যযুগের। তবে আমার অনুমান, বাদ্‌শা শাহ্‌জাহান যখন আগ্রার কেল্লায়, ছেলে আওরঙ্গজেবের হাতে কয়েদ খাটছেন, সেই সময়েই এই পুথি তিব্বতে ছাপা হয় এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাও নিশ্চিয় তার অল্পদিন পরেই হয়েছে।

চিনীর পরে এখানেই আর একটা প্রাইমারী স্কুল দেখলাম। স্কুল তো আর ধর্মস্থান নয় যে প্রতিষ্ঠা করলে পুণ্য হবে। তাই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে চাঁদা মেলে না। মন্দিরের (পুথিমন্দিরকে 'মন্দির' বলুন মন্দির, আর গ্রন্থাগার বলেন তো গ্রন্থাগার) বারান্দায় স্কুল বসে। তহশীলদার কি কোনো আফিসার এলে-গেলে এই বারান্দাতেই বিশ্রাম করেন। তখন ছেলেরা উঠোনে রোদে বসে পড়া মুখস্থ করে। ভারতের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী স্কুলের শিক্ষক মহাশয় স্কুল-ভবনের জন্যে ওপর মহলে অরণ্যে রোদন করে আসছেন।

বেশ সমীহ নিয়মে দেব মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মহা প্রতাপান্বিত দেবতা এই ঢবলা (অনেকে বলে ঢব্‌লস)। কন্‌মের লোকের মতে কিন্নর দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দেব চতুষ্টয়ের মধ্যে ঢবলাও অন্যতম। চিনীর লোকেরা অবশ্য এ কথা মানে না। তারা বরং পাশের গাঁ লব্রঙের অধিষ্ঠাতা দেবতা শক্ষ কংগুকে এঁর চেয়ে বড় স্থান দিতে রাজি, কিন্তু ঢবলাকে নয়।

ঢবলা বেশ অবস্থাপন্ন দেবতা। সেটা তার মন্দিরের টিনের ছাদ দেখলেই বোঝা যায়। ঢবলা যেমন তেমন দেবতা নয়। খাস তিব্বতে 'এন সরক্' নামে তার প্রসিদ্ধি আছে। উনি একবার দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন যে কিন্নর দেশের কন্‌ম গ্রামই ওঁর যথার্থ কর্মক্ষেত্র। তখনই গৃধ্রের রূপ ধরে উড়ে চলে এলেন। তারপর ভক্তদের স্বপ্ন দিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

ঢবলা শব্দের অর্থ হলো ভিক্ষুগুরু। ইনি বৌদ্ধধর্মাচার্য, অবিবাহিত ভিক্ষু। বৌদ্ধ দেবতা, বলি-টলির ধার ধারেন না। বুদ্ধপূজা, উৎসব বা লামাদের সৎকারের ব্যাপারে খুব পয়সা খরচ করেন। অন্য দেবতাদের মতো তত কঞ্জুস নন। আমি যখন দর্শন করতে গেলাম, তখন দুর্ভাগ্যবশত তিনি সুরফুগ মঠের বার্ষিক উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এখন নিজের মন্দিরে ফিরবেন না। দিনকতক 'খছেল খঙ'-এ বিরাজ করবেন। আমার সৌভাগ্য খুব দুর্গম জায়গায় গিয়ে ডেরা জমাননি—ঠাকুর দর্শন হয়ে যাবে। নইলে দেবতাদের ঠিকানা পাওয়া কি কম কথা? লব্রঙ গেলাম, বেশী দূর নয়। রাস্তায় কোলিদের ক'টা জরাজীর্ণ ঘর দেখলাম গতবার এখানে বসে জুতো মেরামত করিয়েছিলাম মনে আছে। লব্রঙ-এর পথেই বেলিরামের ভাই অগ্রজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সেও আমাদের সঙ্গে চলল। 'লব্রঙ' শব্দটা 'ব্লব্রঙ-ব্লম্-ফোরঙ' শব্দের অপভ্রংশ। এর অর্থ হলো গুরুর প্রসাদ। কনৌরের সর্বশ্রেষ্ঠ লামা অবতার পুরুষ 'লোছেন রিম্‌পোছ'-এর নিবাস-স্থান এই লব্রঙ। ছোট জায়গা, কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য নেই, থাকবার কথাও নয়।

তিব্বতের লামা সম্প্রদায়ের মধ্যে একবার অবতারবাদের ঢেউ উঠল। বিখ্যাত অনুবাদক রত্নভদ্র (রিন্ ছেন্ জঙ পো) মারা গেছেন চার-পাঁচশো বছর আগে। হঠাৎ

দেখা গেলো তাঁর একজন অবতার বেরিয়েছেন। এই অবতারটিকে আগেই আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে আজ বছর দশেক আগের কথা। তখন অবতারের বয়স দশ-বারো বছর। এতদিনে বাইশ-তেইশ বছরের জোয়ান ছেলে হয়েছে। লেখাপড়া কিছু শিখেছে কি-না জানি না। ভক্তদের ঠেলার চোটে, মায়ের পেট থেকে পড়েই পূজো পেতে অভ্যস্ত। পড়াশুনো হবে কোত্থেকে! অথচ যাঁর অবতার, তিনি একজন কালজয়ী পণ্ডিত লোক। একেই বলে ভক্তি। তা যে কথা বলছিলাম—লব্রঙের আদিকথা। ১৯২৬ সালে এই লব্রঙের কুঠিতে কাটিয়েছিলাম। তখন এই মন্দির ঘাস-খড়, কাঠ-কাটরা শুকোবার জায়গা ছিল। ইদানিং আরও ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। তবে পরিচ্ছন্নতার কথা আর না বলাই ভালো। ওদের শিক্ষা-দীক্ষা তিব্বতে।

'খছেল খঙ' এখানকার প্রধান মঠ। এর অর্থ মুসলমান মন্দির (মসজিদ) এবং কাশ্মীরী মন্দির দুই-ই বোঝায়। কে এক মাতব্বর এদের বুঝিয়েছে যে, আগে এখানে মসজিদ ছিল বলেই এই নাম। লোকেও তাই বুঝে এসেছে এ পর্যন্ত। আসল কথা তা নয়। এখানে কস্মিনকালেও মুসলমান ধর্মের আধিপত্য হয়নি। মসজিদ-টসজিদ বাজে কথা। খুব সম্ভব মহাপণ্ডিত রত্নভদ্র এই পথে কাশ্মীর যাতায়াত করার সময়ে, কাশ্মীরের স্থাপত্যকলায় প্রভাবিত হয়ে ঐ মডেলের কোনো মন্দির এখানে স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তাই থেকেই কাশ্মীর-মন্দির নাম। আরও একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে আসছে। ভারতের শেষ সংঘাচার্য কাশ্মীরের প্রসদ্ধি পণ্ডিত শাক্য শ্রীভদ্র তিব্বতে 'খছে পন্‌ছেন্' বা কাশ্মীরী মহাপণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীভদ্র ভারত থেকে পলায়ন করে তিব্বতে দশ বছর কাটিয়ে, যখন তিনি আবার দেশে ফিরেছিলেন, তখন সম্ভবত উনি এই কিন্নর দেশের পথেই গিয়েছেন এবং এখানে একটি বিহার বানিয়ে গেছেন। তাঁর স্থাপিত বিহার বলেই হয়ত এর নাম, 'খছেল খঙ' হয়ে থাকবে। এই গেলো নামের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। তবে পুরনো দিনের কোনো চিহ্নই আজ নেই। আজকের এই মন্দিরটার বয়স বিশ বছরের বেশী কোনোমতেই নয়। এটির নক্সা করেছেন লামা টোমো গেশে। পুরনো স্থাপত্যের কোনো নির্দশন নেই—নিতান্ত মামুলী একটা মঠ।

টোমো গেশের সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কালিম্পং থেকে লাসা যাবার পথে 'টোমো' বা চুম্বী উপত্যকায় এক সাধু থাকতেন। তিনিই লামা গেশে। অত্যন্ত সদালাপী এবং কুশলী লোক ছিলেন তিনি। টোমোতে থাকতেই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বতের নাম ভাঙিয়ে যে সব ইউরোপীয়ান, থিয়োসফি আর যৌগিক কলা-কৌশলের ব্যবসা চালিয়েছিল, তারাও অনেকে এঁকে গুরু বলে মানত। গেশে এলেন কিন্নর দেশে। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, স্বয়ং মহারাজ পদম্ সিং পর্যন্ত তাঁর অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাজপরিবারের কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগ কিছুতে সারে না। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার বললেন—টি.বি.। গুণীলোকে বললে, 'রামোঃ। রাজবংশে কি যক্ষ্ম হয়? ও হলো ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মদৈত্যের কোপ পড়েছে!' অনেক ওঝা-রোজা, বামুন-পুরুত ডাকা হলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ইতিমধ্যে টোমো গেশের আবির্ভাব, মহারাজ লামা

গুরুর শরণ নিলেন। টোমো গেশের মন্ত্রতন্ত্রের জোরে, ব্রহ্মদৈত্য রাজপুরী ছেড়ে পালাল। গেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি তুঙ্গে উঠল। কিন্তু কথায় বলে ব্রহ্মদত্যি। সে কি ছাড়বার পাত্তর। যেই গেশের আজ্ঞায় তিব্বত থেকে কঞ্জুর-তঞ্জুর এনে রাজমহলে রাখার ব্যবস্থা হলো অমনি ব্রহ্মদৈত্য একেবারে রাজমহলে আছড়ে পড়ল। কচকচিয়ে চিবিয়ে খেলো কাঁচা মাথাগুলো। রাজবংশ একেবারে নির্বংশ করে ছাড়ল। তখন ব্রাহ্মণদের দাপানি দেখে কে—আনাও, অধার্মিক বৌদ্ধদের পুথি আনাও! ভয়ে পড়ে কঞ্জুর-তঞ্জুর পুথিপত্র তাড়াতাড়ি লামা মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো—না জানি আরও কি অকল্যাণ ঘটে!

সবাই জানে, রামপুরের রাজবংশ যক্ষ্মায় নির্মূল হয়ে গেছে। বুড়ো রাজা পদম্ সিংও ঐ রোগেই মরেছে। আমার এক বন্ধু চিনী থাকতেই আমায় চিঠি দিয়ে ব্রোক্মীর বাংলোয় থাকতে মানা করেছিলেন। তাঁর মতে যক্ষ্মা জীবাণুগ্রস্ত রাজপরিবারে লোক, রুগ্ন অবস্থায় ঐ বাংলোয় কাটিয়েছিল।

কিন্নর দেশের বৌদ্ধমহলে লামা টোমো গেশের কীর্তিকথা খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। তাঁর ইশারা পেতেই এত টাকাকড়ি জোগাড় হয়ে গেলো যে, মঠ (খছেল খণ্ড) পুনরায় তৈরি হতে দেরী লাগল না। খছেল খণ্ড যখন আবার বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় এখানে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো। তাঁর বাড়ি সিংহলে। তাই তাঁর নাম হলো সিংলা গেলঙ (সিংহলী ভিক্ষু)। সিংহলী ভিক্ষুও মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ। কাজেই তাঁরও বেশ নামডাক হতে লাগল। কিন্তু এক বনে দু'জন সিংহ বাস করে না। একটা খাপে কি দু'খানা তলোয়ার রাখা যায়? চলল সিদ্ধাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কে বড় কে ছোট—এই নিয়ে দু'দলের ভক্তবৃন্দের মধ্যে তর্ক-বিতর্কও হতে থাকল। তখন আর এক জায়গায় থাকা যায় না। খদ্দ পার হয়ে সিংলা গেলঙ লব্রঙ চলে গেলেন। সেখানেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা খুব শোনা যেতে লাগল। এমন কি তাঁর তপঃপ্রভাবে দেবতারাও বিচলিত হয়ে পড়লেন। লব্রঙের দেবতা শঙ্ক কংগু তো তাঁর কাছে মাথা নোয়ালেনই, ঢবলার মনেও বেশ খানিক ভয়ভক্তির সঞ্চার হব-হব হলো। এমন সময় সিংলা গেলঙ একদিন স্থানীয় দুই দেবতাকে ধরে খুব কড়কে দিলেন। বললেন, তোমরা না নিজেদের দেবতা বলে প্রচার কর। তোমরা না-কি লোককে পথ দেখাবে, এত দম্ভ তোমাদের? বলি, লোকের কাছে পূজো নাও তোমরা কোন আক্কেলে? লজ্জা করে না, নদীর এপারে-ওপারে তোমাদের বাস অথচ দুই দেবতায় মিল নেই, ঝগড়া-বিবাদ নিয়েই আছ! ভগবান শাক্যসিংহ বুঝি এই শিক্ষা দিয়েছেন? এ সব কথা শুনে দুই দেবতাই তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে জড়সড়। শঙ্ক কংগু তো একেবারে একপায়ে খাড়া, যা গেলঙ লামা বলবেন, তাই হবে। ঢবলাও অমতা আমতা করছেন। তা এ সব কথা তো আর গোপনে হয় না। দেববাহকের (ব্রোক্স) মুখ দিয়ে কিছু কথা হলো, দেবতা নিজেও মাথা নাড়িয়ে সঙ্কেত দিয়ে কিছু বললেন। আশপাশে শ্রোতাও কিছু ছিল না এমন নয়। কাজেই পাঁচ কান হতে হতে কথাটা টোমো গেশের কানেও গেলো। গেশের মনে ভাবনা হলো—সিংলা গেলঙ বেটা যদি কায়দা করে এদের দুই দেবতাকে মিলিয়ে দেয় তবেই তো চিত্তির। তখন লোকে

বুঝবে ওর সিদ্ধাইয়ের জোর আমার চেয়ে বেশী, নইলে দেবতাদের বশ মানায়। রাতারাতি টোমো গেশে গিয়ে ঢবলার সঙ্গে কথা বলে তাকে ছ'মাসের জন্যে ধ্যানে পাঠালেন। ধ্যানে বসাকে বলে 'ছম্'-এ যাওয়া। ঢবলা যদি ছ'মাসের জন্যে ধ্যানে বসে তো কথাবার্তা বলা চলবে না। ব্যস টোমো গেশেরই বাজি মাৎ। সিংলা গেলঙ লামার এক গাল মাছি।

একবার একটা গল্প শুনেছিলাম—ঠিক এমনি ধরনের—বিহারের কাহিনী। দুই গাঁয়ে দুই সিদ্ধপুরুষ এসেছেন। লোকে তাঁদের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ। নিত্যি কিছু না কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছেন তাঁরা। ইনি বড় না উনি বড় তা কে বলবে? একদিন ভোরে ইনি চাতালে বসে দাঁতন করছেন এমন সময় উনি বাঘের পিঠে চড়ে দেখা করতে এলেন। নদীর একপারে ইনি, আর ওপারে উনি। উনি এসেছেন বাঘের পিঠে। মজা দেখতে লোক ভেঙে পড়েছে। 'ওঁর' মনে খুব গর্ব—দেখ আমার সিদ্ধাইয়ের শক্তিটা। এদিকে 'ইনি' ওপারে বসে দাঁতন করছেন। ভাবলেন, ও বেচারা বাঘ নিয়ে এপারে আসবে কেমন করে। আমিই যাই ওপারে দেখা করতে। বলে যে চাতালে বসে দাঁতন করছিলেন তাকে ডেকে বললেন, 'চল বেটা চেলার সঙ্গে দেখা করে আসি।' সর্বসমক্ষে পাথরের চাতাল 'এঁকে' নিয়ে ওপারে উড়ে গেলো। বাঘের পিঠ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি 'উনি' এঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন....

গল্প করতে করতে নম্বরদার অগ্রজিৎ, পুণ্যসাগর আর আমি 'খছেল খণ্ডে' পৌঁছে গেলাম। প্রাঙ্গণের তিন দিক ঘিরে দোতলা কুঠি, খালি দিকটায় মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ মোহান্ত মশায়ের ঘর। মোহান্ত মশায় (কা-ছেন) খবর পেয়েই দৌড়ে এলেন। হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। দেখে বেশ বিনয়ী মনে হয়। কুড়ি বছরের মতো টশিলুম্পোর মঠে কাটিয়েছেন। তিব্বতী সামন্তবর্গের আদবকায়দা, শিষ্টাচার খুব শিখেছেন। মন্দির খোলা হলো। এই মন্দিরেই সংঘের ভোজ-উৎসব ইত্যাদি হয়। একটা আসন একটু নীচু গোছের, সেইটায় বসে ভিক্ষুরা পূজার্চনা করেন। আমাকে একটা উঁচু মতো আসনে বসানো হলো। চা এল—মাখন-সোডা-নুন মেশানো তিব্বতী চা। তিব্বতী গড়নের চীনে মাটির চায়ের বাসন। ঘন্টাখানেকের জন্যে আমরা খাস তিব্বতের আবহাওয়ায় চলে গেলাম।

কা-ছেন হিন্দী জানেন না, আমিও কিন্নর ভাষা জানি না। তাই কথাবার্তা তিব্বতীতেই চালালাম। শুধু কিন্নর কেন, সুদূর মোহলিয়ায় গেলেও আপনার তিব্বতী ভাষা জানা থাকলে আর ভাবনা নেই। কা-ছেন ছাড়াও আর একজন ভিক্ষু এখানে থাকেন। তিনি এলে দেখলাম—তিনি আমার পূর্বপরিচিত। ১৯২৯ সালে আমার প্রথম তিব্বত যাত্রায় ইনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। তারপর, কিছুকাল উনি তিব্বতেই থেকে যান। দ্বিতীয়বার গিয়েও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভিক্ষুর নাম সুখরাম। এখানে 'গেশে সুখে' বলে পরিচিত।

গেশে সুখে ভিক্ষু হলেও গৃহী। ঠিক স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য নেননি। দায়ে পড়ে নিতে হয়েছে। কোনো তরুণী ভিক্ষুণী বুঝি নজরে পড়ে গিয়েছিল। সন্তান নিরোধ সম্ভব হয়নি। লোক জানাজানি হয়ে যায় আর কি। তখন নিরুপায় হয়েই বিয়ে করতে

হয়েছে। এখন কিন্নর দেশে থাকতে হলে চুটিয়ে ঘর-সংসার করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই।

পুরনো বন্ধুটিকে দেখে আমার মনে অনেক কথার উদয় হলো। এই সমস্ত বিদ্বান প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিদের কি অবস্থা! অথচ ভারতবর্ষ জানে না, নেগীলামা, গেশে সুখে, ছোগ্রম্পা, কলজোং, গ্যাবঙ লাবম্পা—এঁরা যে কোনো দেশের গৌরব। কাশীর পণ্ডিতদের হয়ত ধারণা নেই, এইসব জ্ঞানপিপাসু তপস্বীরা সারা জীবনের সাধনায় যা অর্জন করেছেন, তার সামান্যতম সঞ্চয় দিয়েই কাশী প্রয়াগের মতো বিপুল গ্রন্থাগার খোলা যায়। বছরের পর বছর এঁরা তিব্বতের মঠে বসে তিব্বতী ভাষার মাধ্যমে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন? সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহ। দিঙনাগ-নাগার্জুন-ধর্মকীর্তি-চন্দ্রকীর্তি-অসঙ্গ-বসুবন্ধু—এঁরা হলেন ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এঁদের কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে এঁদের সৃষ্টিতে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এইসব মনীষীদের মূল সংস্কৃত রচনা আজ দুর্লভ। বারাণসীতে পাবেন না, প্রয়াগে পাবেন না, পাবেন না দক্ষিণ ভারতের কোনো বিদ্যাপীঠস্থানে। ভারত থেকে এইসব প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থগুলি লোপ পেয়ে গেছে। যা কিছু আছে—সব তিব্বতে! সেখানের মঠে এইসব শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অমর সৃষ্টিগুলি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়ে, স্তরে স্তরে মণি-মাণিক্যের মতো সাজানো আছে। যে যায়, যে আহরণ করবার অধিকার নিয়ে যায়, সে বঞ্চিত হয় না। আজ সবচেয়ে প্রয়োজন তিব্বতী ভাষায় জ্ঞানার্জন করা। লাসা ডেপুঙের বৌদ্ধবিহার থেকে সযত্নে তিব্বতী গ্রন্থের সংস্কৃত বা হিন্দী অনুবাদ করা প্রয়োজন। যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্নর হিমাচলের পর্বতকান্তার থেকে তাঁদের সমাদার করে নিয়ে আসা প্রয়োজন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের দায়িত্বের সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। কাশীর সংস্কৃত-জানা কূপ-মণ্ডুকেরা এ সব কথা শুনলে আঁতকে উঠবে—তা জানি। সম্পূর্ণানন্দ না থাকলে এইসব অবহেলিত ভারতীয় প্রতিভার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাই অসম্ভব হতো। তিনি নিজে একজন বিদগ্ধ রসবেত্তা লোক। তাই যুক্তপ্রদেশে [অধুনা উত্তরপ্রদেশ—অনুবাদক] প্রকৃত বিদ্যাচর্চার সুযোগ একদিন আসবেই, মনে হয়।

ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় পণ্ডিত শ্রেবার্ভস্কী, ধর্মকীর্তিকে ভারতের কাণ্ট আখ্যা দিয়েছেন। আমি বলি, তিনি কাণ্ট ও হেগেলের সমন্বয়। আবদুল গফুর খান যখন জানতে পারেন যে, বৌদ্ধদর্শনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অসঙ্গ আর বসুবন্ধু পাঠান দেশের লোক ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের রচনা ও জীবনী সংগ্রহের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন! আমি তাঁকে মাত্র এইটুকুই জানিয়েছিলাম যে, দু'জনেরই জন্মস্থান পুরুষপুর (পেশোয়ার)। আর তাঁদের পরিচয় হলো একজন বৌদ্ধধর্মের প্লেটো অপরজন অ্যারিস্ততল।

ভারতের শিক্ষাবিভাগের ভার দেওয়া হয়েছে মৌলানা আজাদকে। এর পেছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে, আমি ভেবে পাই না। আজাদ সায়েব আরবী মাদ্রাসার আলিম ব্যক্তি, আরবী এবং ঐশ্লামিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবান লোক, তা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ব্যাপারে তিনি কোন কাজে লাগবেন! কি জানেন তিনি বেদান্তদর্শন সম্পর্কে, বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারা

ভারতবর্ষকে কি দিয়েছে, প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক মানবতাবোধের নাড়ীর যোগ কোথায়—এ সব বিষয়ে মৌলানা আজাদ আমাদের কি নতুন কথা শোনাতে পারেন? অনেকে বলবেন, কেন তাঁর সঙ্গে তাঁর সহকারী ডক্টর তারাচাঁদ তো আছেন? শুনলে আমার হাসি পায়। মনে পড়ে সেই হিন্দী ছড়া : 'রাম মিলায়া জোড়ী, এক অন্ধা এক কোড়ী।' মৌলানা আজাদ আর ডক্টর তারাচাঁদ—মণিকাঞ্চন যোগ...যাক সে কথা। কথার পিঠে কথায় আজাদ-তারাচাঁদ পর্বে এসে পড়েছি; আবার ফিরি।

অনগ্রসর কিন্নর দেশে আজ এমন এমন বিদ্বান লোক রয়েছেন এবং তৈরি হচ্ছেন যাঁদের তুলনা ভারতের অন্যত্র খুব বেশী পাওয়া যাবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ধারাটি তাঁরা সযত্নে বহন করে চলেছেন। ভারতীয় মাত্রেরই উচিত নয় কি, এইসব অজ্ঞাত-অখ্যাত-উপেক্ষিত প্রতিভাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া? কিন্তু কে বা কার কথা শোনে? কার গোয়ালে, কে দেয় ধুঁয়ো? যদি কোনোদিন হিমাচল প্রদেশের সুদিন আসে, যদি নেপাল সীমান্ত থেকে চন্দ্রভাগার অববাহিকা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটা এক অখণ্ড শাসনের অধীনে আসে, তবে হয়ত কাজ হতে পারে। সে দিন যখন সারা হিমাচল অফুরন্ত ফল-মেওয়ার বাগানে ভরে থাকবে, ছেয়ে থাকবে জলবিদ্যুৎ পাওয়ার স্টেশনে, খনি আর কলকারখানায় যখন হিমাচলের ঘরে ঘরে সম্পদ আর শ্রী বিরাজ করবে হয়ত সে দিন এ দেশের যোগ্য নেতারা খুঁজে বার করবেন এই অবহেলিত প্রতিভাদের; দেবেন তাদের যোগ্য মর্যাদা—কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ যদি কেউ খণ্ডিত হিমাচল প্রদেশের কাছে এই নিয়ে দরবার করতে যায়, তবে কি শুনবে? কর্তৃপক্ষ সবিনয়ে ভারত সরকারের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেবেন। ভারত সরকারের কর্ণধার 'ভারত আবিষ্কারক' নেহেরুজী আবার অঙ্গুলি সঙ্কেত করবেন, তাঁর পরম নির্ভরযোগ্য (!) শিক্ষা-বিভাগের দিকে। তারপর ফল যা হবে, তা বুঝতেই পারা যায়। হয়ত অনেকে আমার কথাকে কটূক্তি ভেবে, আমার ভুল বুঝবেন, দুঃখ পাবেন। তাঁদের বলি, এ আমার কটূক্তি নয়—বিলাপোক্তি—এ আমার ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস।

সুখ-দুঃখের কথা শেষ হলো, আমি ওঁদের জিজ্ঞেস করলাম, 'ঢবলাদেব কোথায় থাকেন?' শুনলাম তিনি ছাদে বিরাজ করছেন। আমরা ছাদে গেলাম দেবদর্শনে। ছাদে বেজায় রোদ, কিন্তু ঢবলা তপস্বী-দেবতা, তাঁর কাছে রৌদ্র, ছায়ার বৈষম্য নেই। নম্বরদারের কাছ থেকে ঢবলার সঙ্গে কথা বলার সাঙ্কেতিক কায়দা কালই শিখে নিয়েছি। ঢবলার তিন-তিনজন মানুষ মুখপাত্র (প্রোক্ষ)। তবে তাঁদের একজন দুগ্ধপোষ্য বালক, অপরজন স্বর্গে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তিটি স্বর্গের কাছাকাছি—সিমলায় ভ্রমণ করতে গেছেন। কিন্নরের দেবতারা কাঁচা লোক নন। মানুষের ওপর যে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে নেই এ জ্ঞান তাঁদের আছে। তাই এই সঙ্কেতপূর্ণ শিরশ্চালনার ব্যবস্থা। মাথা যখন বনবন করে চারপাশে ঘুরবে তখন নেতিবাচক ইঙ্গিত বোঝাবে। প্রশ্নকর্তার দিকে মাথা ঝুঁকলে বুঝতে হবে—হ্যাঁ। ওপর নিচে খুব ওঠা-পড়া করলে প্রসন্ন সম্মতি বোঝাবে, আর যদি একবার প্রশ্নকর্তার দিকে সোজা তাকিয়ে মাথা পিছন দিকে ঘুরে

যায়—তা'হলে সকলেরই মাথা ঘুরে যাবে। কপাল বুঝি ভাঙল! দেবতা বিরূপ হয়েছেন। সাঙ্কেতিক ভাষা তেমন অস্পষ্ট নয়। বোঝার অসুবিধা কিছু নেই।

ঢবলার কোনো অবয়ববিশিষ্ট মূর্তি নেই। কিন্নর দেশের অন্য দেবতাদের মতো তিনিও একটি চৌকো কাঠের ঢিপি। এই গোল্যকৃতি গম্বুজটার ওপরে খুব কায়দা করে পাঁচ-ছ'টা রূপোর-তৈরি মাথা ফিট করা আছে। এই মাথা প্রয়োজন হলে যাতে চারপাশে ঘুরতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। আমরা যেতেই দু'পাশ থেকে দু'জনে ধরে ঢবলাকে তুলে ধরল।

ঢবলা অরিজিন্যালি তিব্বতের লোক। আমি তাঁর সঙ্গে তিব্বতী ভাষায় কথা বলতে পারতাম। কিন্তু পাছে কথা বলতে গিয়ে আদব-কায়দায় ভুল করে ফেলি, সেই ভয়ে নিজে কথা না বলে নম্বদার অগ্রজিৎকে দোভাষী নিয়োগ করলাম। কথাবার্তা যা হলো তা বিশদভাবে জানাচ্ছি—

দেবতার দিব্য দেহ থরথর করে কাঁপছে। পাশে দাঁড়ানো লোকটি অবিশ্রান্ত ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। আমি হিন্দী ভাষায় প্রশ্ন করলাম এবং ঢবলাদেবের সঙ্গে কথোপকথনের অনুমতি চাইলাম। নম্বরদার শ্রদ্ধানম্রস্বরে হাত জোড় করে আমার বক্তব্য কিন্নর ভাষায় পেশ করলে ঢবলাদেবের কাছে।

আর্জি পেশ করা হলো—ডম্বর সাহেব, কাশীর মহাপণ্ডিত রাহুলজী আপনার চরণে তাঁর ভক্তিনম্র প্রণাম জানাচ্ছেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ধৃষ্টতা মার্জনা করুন।

মাথা ওপরে নিচে বার দুই ওঠা-নামা করল। বুঝলাম, দেবতা সদয় হয়েছেন; প্রশ্ন করবার অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন—কোঠির দেবী ইদানীং বড়ই দুর্নীতিপরায়ণা হয়েছেন। তাঁর আচরণে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনাদর দেখা যাচ্ছে। তিনি বেজায় কোপণ-স্বভাবা হয়েছেন আজকাল। কনৌরের সমস্ত দেবতা যেখানে ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ মতো চলছেন, সেখানে কোঠির দেবী কোন আক্কেলে রক্তমাংসলোলুপা ক্রোধ-ভীষণা হয়ে ঘুরে বেড়ান? তাই মনে হয়, যতদিন দেবী কুমারী থাকবেন ততদিন তাঁর এই বদ-মেজাজ ঘুচবে না। তার চেয়ে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

ঢবলার দিব্য মস্তক ওপর নিচে আন্দোলিত হতে হতে প্রশ্নকর্তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। অর্থাৎ আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। দেবতাকে বেশ খুশী মনে হলো। তখন আবার প্রশ্নাঞ্জলি—কোঠির দেবী যে-সে দেবী নয় ডম্বর সায়েব। যার তার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা পাড়া যায় না।

মাথা ওপর নিচে নড়ল, তারপরে সামনে ঝুঁকল। অর্থাৎ সত্যিই তো, তা কেমন করে হয়!

তখন আমড়াগাছি করা হলো ঢবলা দেবতাকে। —হে মহাপ্রভু, ডম্বর সাহেব! আপনি স্বর্ণমধুপের মতো অজড়, অমর। আমরা তৃণের মতো জন্মাচ্ছি—মরছি। কথাটা কি সত্যি নয়?

মাথা অনুমোদন জানাল।

—ডম্বর প্রভু, আপনি জনগণের কল্যাণ কামনায় ভগবান তথাগতের ধর্ম প্রচারার্থে এদেশে বিরাজ করছেন—এও ঠিক নয়।

—ঠিক, ঠিক কথা। খুবই ঠিক।

আপনি সদাই ধর্মের রক্ষাকর্তা। অধার্মিককে ধর্মশিক্ষা দান করাও কি আপনার কর্তব্য নয়?

—বটেই তো, বটেই তো। তা কি বলতে চাও বাপু?

—আপনার মতো বিরাট মহান্ দেবতাকেই পতিত্বে বরণ করতে পারেন কোঠির চিরকুমারী চণ্ডিকা দেবী। অন্যথা...

কথায় বাধা পড়ল। শিরশ্চালন এমনই সবেগে হতে লাগল যে, আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। দেবতা নিশ্চয় রেগে গেছেন। পাশের লোক দু'জন আমাকে আশ্বস্ত করলে। দেবতা ক্রুদ্ধ হননি। তবে তিনি বিবাহ অসম্মতি জ্ঞাপন করছেন (কেনরে বাবা? মেয়ে পছন্দ হয়নি!)

—ক্ষমা করুন ডম্বর প্রভু আমাদের পণ্ডিতমশায়, জানতেন না যে, আপনি ভিক্ষু, চিরকৌমার্যের ব্রতধারী। তাঁর এ ভুল ক্ষমা করুন।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। ক্ষমা করা হলো।

—কোঠির দেবীর বিয়ে হোক এটা তো আপনি চান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়।

—তা'হলে পাত্র নির্বাচনটা আপনিই করে দিন। কার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় দেবীর? —শঙ্ক কংশুর সঙ্গে?

—না, না। ওর 'পজিশন' অনেক নীচুতে।

—তাহলে জংগীর দেবতার সঙ্গে ঠিক করা যাক্।

—না, তাও নয়। ওটাও ছোট দেবতা।

—তা'হলে রোগীর নারায়ণ, চিনীর নারায়ণ, উরনীর নারায়ণ?

—দূর, দূর। ওগুলো আবার দেবতা কিসের! তা'ছাড়া ওরা দেবীর বোনপো হয় যে।

—তা'হলে সুংরার মহেশু, ভাবার মহেশু কিম্বা চাঁগাওয়ের মহেশু?

—মাথা সবেগে ঘুরতে লাগল চারপাশে। —আরে না, না। ক্ষেপেছ না-কি? দেবীর মা'র পেটের ভাই বানাসুরের ছেলে না ওরা?

—তাই তো, তাই তো। তা'হলে দুনী, পংগী কিংবা রারঙের দেবতা?

—উহুঁ। ও সব ছোট দেবতা।

এ বার প্রশ্নকর্তা এক লাফে নদী পার হয়ে বস্‌পা উপত্যকায় পৌছে গেলো;

—তা'হলে ডম্বর সাহেব, কামরুর বদ্রীনাথের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়?

এ বারে ঢবলাদেবের সানন্দ অনুমোদন পাওয়া গেলো। কোঠির দেবীর একটা হিল্লে হয়ে গেলো। বিয়ের কথা পাকা করে আমরা ফিরলাম।

ঢবলার মন্দির থেকে ফেরার পথে আমরা ভিক্ষুণীদের মঠ দেখলাম। ভিক্ষুণীরাও কিন্নরের মেয়ে। কিন্নরী মেয়েরা অসাধারণ পরিশ্রমী। ঘরের কাজ সব তারাই সামলায়

এবং ক্ষেতের কাজের বৃহত্তর অংশটাও তাদের দায়িত্বে থাকে। যে সব ভিক্ষুণী ঘরে থাকতে চায় না, তাদের মঠে বাস করবার স্বাধীনতা আছে। জংগীতে ভিক্ষুণীদের একটা সুন্দর মঠ দেখে এসেছি।

নম্বরদার অগ্রজিৎ ঢবলা মন্দিরের ব্যবস্থাপক। হিসেব-নিকেশ সব তারই হাতে। এইসব ব্যাপারে দেবতার সঙ্গে প্রায়ই তাকে যুক্তি-পরামর্শ করতে হয়। তাইতো দেব-মানব আলাপচারীর ব্যাপারে সে বেশ সিদ্ধহস্ত। ঢবলা একটু উৎসবপ্রিয় দেবতা। উৎসবাদির ব্যাপারে প্রায়ই তাঁর খোশ মেজাজ এবং দিলদরিয়া ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢবলার প্রতি অগ্রজিতের আনুগত্যের অভাব নেই। তার দৈবে বিশ্বাস কেমন জানতে চেষ্টা করলাম। মাথা চুলকে অগ্রজিৎ জবাব দিলে, 'অবিশ্বাস, সংশয় মাঝে মাঝে যে আসে না তা নয়। তবে কি-না ভয় আছে তো। দেবতা প্রায়ই যে ভয় দেখিয়ে বলেন, তাঁর কথা না শুনলে তিনি 'গুপ্ত' হয়ে যাবেন। তা সত্যি। এই অজ পাড়াগাঁয়ে, জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে বাস করে মুঠোখানেক মানব সন্তান। না আছে সিনেমা, না আছে থিয়েটার না আছে চিত্তবিনোদনের অন্যতর কোনো উপায়। এক দেবতা আর দৈব উৎসবই একমাত্র সামাজিক মিলন এবং আনন্দের উৎস। সেই দেবতাই যদি গুপ্ত হয়ে পড়েন, তা'হলে মুশকিল বই কি—ভয়ের কথাই।

দু'সপ্তাহ হলো চিনী ছেড়েছি। এ বার ফেরার সময় হলো। রোজকার ডাক অবশ্য স্পু পর্যন্ত বরাবর পেয়ে এসেছি। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া হয়নি। এ বার চিনীতে বসে চিঠির উত্তর লিখব, পার্শেল যদি কিছু এসে থাকে তো সেগুলো খুলতে হবে। অতএব জোর পায়ে চলা চাই।

২৭শে জুন জলপানের পর আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লাম চিনীর পথে। এ সব রাস্তায় ঘোড়া ছাড়া যেমন চলে না, তেমনি দেখে-শুনে ঘোড়া নিতে না জানলেও বিপদ। তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয়। এ পথটা রারঙ পর্যন্ত বেশ সমতল। কোথাও ঢালগড়ানে নয়, গড়িয়ে পড়ার ভয় নেই। ঘোড়া যদি ঠিকমতো চলে দু'ঘন্টাও লাগবে না জংগী পৌঁছাতে। বেগারী চাপরাসীদের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলো। আমি ঘোড়ায় চড়লাম। মাইল দুই চলবার পর লিপ্পার খদ্দ এল। তার কিছুদূর আগে থাকতেই উৎরাই। ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চললাম। খদ্দ পার হয়ে চড়াইয়ের মাথায় ঘোড়ায় চড়তে গেলাম। রেকাবে পা দিতে-না-দিতে রেকাব ভেঙে খসে পড়ল। অগত্যা হেঁটেই চললাম। জংগী পৌঁছাতে প্রায় দুপুর হয়ে গেলো। ব্যস শুরু হলো অশ্বসঙ্কট। জংগী থেকে রারঙের পথটুকুতে অশ্বিনীকুমার যা খেল দেখালেন সেটা আর ভোলবার নয়। কখনো সার্কাসের মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, কখনো ঘুরপাক খেয়ে ফের উল্টো হাঁটা দেয়। জেরবার হয়ে ঘোড়াকে সহিসের হাতে সমর্পণ করে হেঁটেই চললাম। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখছি—ঘোড়া ঠিকই আসছে। আসল কথা আমায় ওর পছন্দ হয়নি।

বেশ বেলা থাকতে থাকতে রারঙ পৌঁছে গেলাম। ঘোড়া বিভ্রাট না ঘটলে এই সময়ের মধ্যে পংগী পৌঁছে যাবার কথা। এখন এখানে বসে মাছি তাড়াই। পংগীর ডাকবাংলোখানি খাসা। বড় বড় দরজা-জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসে। অথচ

পোকা-মাকড়-পিসুর উপদ্রব নেই। দরজায় জাল লাগানো। একটা মাছি পর্যন্ত ঢোকবার উপায় নেই। যাক গতস্য শোচনা নাস্তি।

রারঙে থাকতে থাকতেই আজকের ডাক পেলাম। অন্য সব চিঠিপত্রের মধ্যে হিমাচল প্রদেশের চীফ কমিশনার মেহতাজীর চিঠিও ছিল। তিনি আমায় লিখেছেন—

"আপনার বহুমূল্য প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার আয়োজন করতে আমার সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। যাতায়াতের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সরকার যাতায়াত ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়েছেন। সমগ্র হিমাচল প্রদেশে ফল উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার সুচিন্তিত যুক্তিগুলি সর্বদা গ্রহণীয় বলে আমার সরকার বিবেচনা করেন। বস্তুত এ কাজে আমরা ইতিমধ্যেই আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হয়েছি। কেনা-বেচা (মার্কেটিং) ও দ্রুত পরিবহনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি সমবায়ী সংস্থা (কো-অপারেটিভ) সংগঠিত করা হবে। এ ছাড়া, আপনার উপদেশানুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্কুলে ফল চাষের কাজের উপযুক্ত শিক্ষক-মালী ও ছাত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে। স্কুল-সংলগ্ন বাগানে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও হবে।

"চিনী ও তৎসন্নিহিত এলাকায় ডাক্তারের প্রয়োজন সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জানবেন। যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত এলাকায় একাধিক ডাক্তার প্রেরণ করা হবে। হিন্দী শিক্ষার বিষয়ে আপনি যা লিখেছেন তার জবাবে জানাই—আমাদের সরকার ইতিপূর্বেই হিন্দীকে এ রাজ্যের (হিমাচল) সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। কোনো কোনো অঞ্চলে তিব্বতী ভাষাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে আপনি যে মত প্রকাশ করেছেন, সেটি খুবই সঙ্গত বলে আমার বিশ্বাস। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঐ সব অঞ্চলে তিব্বতী ভাষায় শিক্ষা প্রসারের অনুকূল মত পোষণ করি। আপনি যদি স্থানীয় কোনো তিব্বতী জানা লোককে এ কাজের উপযোগী বলে মনে করেন, তবে দয়া করে আমাকে তার নাম জানাবেন। আমরা যথাসাধ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাঁকে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করব। সংস্কৃত-শিক্ষার ব্যাপারটাও আমরা ভেবে দেখছি।

"আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বুশহর এবং আশপাশের কয়েকটা গ্রাম নিয়ে আমরা একটা নতুন জেলা স্থাপন করেছি—নাম মহাস। আশা করা যায়, বুশহরে খুব শীঘ্রই একটি ফল-গবেষণাগার খোলা হবে।

"আর একটি ঔৎসুক্য আছে আমার। এই যাত্রাপথে আপনার কোনো পুরাতাত্ত্বিক বস্তু নজরে পড়েছে কি? যদি..."

এতদিনে সত্যিকার খুশী হবার মতো একখানা চিঠি পেলাম। আমার কথাগুলো তবে অরণ্যে রোদন হয়নি। দিন দুই পরেই (২৯শে জুন) আমি চিনী থেকে মেহতাজীর পত্রের উত্তর দিলাম। আমি লিখলাম—

"আমার ষোলো দিনের পরিক্রমা সাঙ্গ করে সবেমাত্র গতকাল ফিরে এসেছি। এবারকার যাত্রায় আমি তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত ভারতের শেষ গ্রাম নম্‌গ্যা ছুঁয়ে চলে এসেছি। তিব্বতী-সংস্কৃত শিক্ষা-পরিকল্পনার কথায় পরে আসছি। তার আগে ক'টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই :

"(১) রারঙ, অক্‌পা আর জংগী এই তিনখানি গ্রামই জলাভাবে 'ত্রাহি ত্রাহি' করছে। অবিলম্বে এর ব্যবস্থা করা দরকার। অক্‌পার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ওখানকার ক্ষেতগুলোয় জল নেই। চাষ-আবাদ বন্ধ। আখরোট, চুলী, খোবানী, বেমী ইত্যাদির গাছ সবই প্রায় শুকিয়ে গেছে। লোকে এক রকম অভ্যাসের বশে জমি আঁকড়ে পড়ে আছে। হাড়-জিরজিরে আধমরা কয়েকটা ভেড়া ছাগল সম্বল। আমার মতে অক্‌পা গ্রাম উজাড় করে বাসিন্দাদের অন্যত্র চলে যাওয়াই মঙ্গল। রারঙ বা জংগীর অবস্থা এতটা খারাপ নয়। তবে সেখানেও প্রভূত জলকষ্ট রয়েছে। তিনখানি গ্রামই সিমলা থেকে একশো বাহান্ন থেকে একশো সাতান্ন মাইলের ভেতরে। জংগী থেকে তিন মাইল সামনের দিকে আর রারঙ থেকে চার মাইল পিছনে দুটি বড় বড় ধারা এসে শতদ্রুতে পড়েছে। সেখানে ডিনামাইট, সিমেন্ট আর কুশলী এঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন। বেচারী গরীব গ্রামবাসীদের দু'খানা হাত ছাড়া তাদের আর সম্বল কিছু নেই। আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এখানে খাল কাটা হতে পারে। লোকজন গায়ে-গতরে খাটার জন্যে তৈরি আছে।

"(২) সিমলা থেকে ১৭০ মাইলের মাথায় কনম-সুংনম। তার ওপাশে তিব্বতী ভাষাভাষী হঙরঙ এলাকা। এখানকার স্পু অঞ্চলে আজ থেকে সত্তর বছর আগে মোরাবিয়ন মিশনারীরা জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করে গেছে। গত বিশ্বযুদ্ধের আগে তারা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর এখানকার ডাকঘরটি বন্ধ হয়ে গেছে, স্কুলটিও উঠে গেছে। এখানে অবিলম্বে কয়েকটি স্কুল খোলা দরকার। এখানে প্রথমেই তিব্বতী ভাষায় স্কুল খুলতে হবে। পরে সেই স্কুলেই হিন্দী বিভাগ খোলা যেতে পারে। তখন বিদ্যার্থীর অভাব হবে না। আর পাদরীদের দরুন একটা চমৎকার বাংলো এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা এখন সরকারী সম্পত্তি। বাংলোটা বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

"(৩) হিন্দী হিমাচল প্রদেশের রাজভাষা হয়েছে লিখেছেন। কিন্তু তহশীলদারদের সে খবর জানা আছে বলে মনে হয় না। তারা হিন্দী খুব ভালোই জানে। অথচ মামলা মোকদ্দমায় বা অন্য কাজকর্মে, সব কিছুতেই দেখতে পাই উর্দুর প্রাধান্য। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন মহলের হস্তক্ষেপ দরকার। স্থানীয় স্কুলসমূহে এখনও উর্দু বাধ্যতামূলক কেন? উচিত হচ্ছে হিন্দীর পরে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে তিব্বতী ভাষা শেখানো।

"(৪) দেশের পরিবর্তন সম্বন্ধে হিমাচল প্রদেশের লোক একেবারে অজ্ঞ। হিমাচল সরকারের উদ্যোগে হিন্দীতে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করা উচিত। জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে সচিত্র মাসিক পত্রিকা একটা বার করুন। তার নাম দিন 'হিমাচল'। প্রথমে মাসিক থাক, পরে সাপ্তাহিক সংস্করণও হতে পারে। দেখবেন দামটা যেন সস্তা হয়, আর সকলের নাগালে যেন আসে।

"(৫) প্রচার জিনিসটাও সরকারের একটা কর্তব্য। এই প্রচার উপযুক্ত ডাক-ব্যবস্থা নইলে সম্ভব নয়। এ দিকে ডাকঘরের সংখ্যা অতি নগণ্য। চিনী তহশীলের বিভিন্ন গ্রামে আরও দশটা ডাকঘর খোলা আবশ্যক। পোস্টমাস্টারের কাজের জন্য প্রথমেই অন্য লোক দরকার নেই। স্কুলের শিক্ষকেরাও সে কাজে নিযুক্ত হতে পারেন।

"(৬) পুরনো জিনিসের মধ্যে বিশেষ কিছুই পাইনি। তবে পেয়েছি প্রাক্ তিব্বতীয় বা প্রাক্-বৌদ্ধযুগের একটা সমাধিগহ্বর। পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এর মূল্য অসীম। আমার বিশ্বাস, ভালোভাবে অনুসন্ধান চালালে এ রকম আরও ঐতিহাসিক সংগ্রহ পাওয়া সম্ভব।

"(৭) বিভিন্ন ফলের চাষ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাগান করা সম্বন্ধে আলাদা করে তহশীলদার সাহেবকে দিয়ে নোট পাঠিয়েছি। হয়ত পেয়ে থাকবেন। এ ছাড়া বস্‌পা উপত্যকার একটা কুণ্ডে আমি খনিজ তৈলের গন্ধ পেয়েছি। কোনো কোনো পাথরে সীসার আভাস দেখেছি। অল্প-সল্প নমুনা জোগাড় করেছি। আপনাকে সামনের ডাকে পাঠিয়ে দেবো। এ সব অঞ্চলে কাজের জন্যে একজন জিওলজিস্টের (ভূতত্ত্ববিদ) প্রয়োজন।"

* * *

রারঙের জংলী কুঠিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈ-চৈ শুনলাম। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, একদল লোক মশাল নিয়ে চলেছে। শোনা গেলো রারঙের দেবতা বাড়ি ফিরছেন। আজ একটা জোরালো ভোজ আছে। কুঠির মেট দৌড়ে গিয়ে খানিক পরেই একটা থালা ভর্তির করে প্রসাদের নমুনা নিয়ে এল। থালায় রয়েছে—ঘিয়ে-ভাজা গুড়ের হালুয়া, চুলীর তেলে ভাজা মোটা মোটা পুরী, মাখন আর ছাতুর নাড়ু, আর একটা তণ্ডুল জাতীয় বস্তু—দিব্যি ভোজ।

ফেরার টানে

ষোলো দিন পরে চিনীতে ফিরে এলাম। এই ষোলো দিনে কোনো বিশেষ পরিবর্তন নজরে পড়ল না। 'ডাক্তার' ঠাকুর সিং তেমনি দিনের বেলায় সদানন্দ, রাত্তিরে নেশার ঝোঁকে তুরীয়ানন্দ হয়ে থাকেন। দিনে মাছি আর রাতে পিশুর উপদ্রব ঠিক আগের মতোই রয়েছে। কেবল ক্ষেতের সবুজে কোথাও কোথাও, কিছু কিছু হলুদ-সোনালী ছোপ ধরেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফসল অর্ধেকের বেশী কাটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর একটা খুশী হবার মতো জিনিস হয়েছে। ঘরে ঘরে অন্নাভাবের বদলে শাক আর ফলে (প্রধানত খোবানী) সকলের ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে আছে। যে ভাগ্যবান যাযাবর, আগস্টের শুরু থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত এ দেশে কাটাতে পারবেন, ফল এবং তরিতরকারির প্রাচুর্য তাঁর বরাতে জুটবেই।

আমি নিতান্তই অভাগা। আগস্ট পড়তে না পড়তেই আমার এখানকার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এখানে আসবার সময়ে ঠিক করেছিলাম, চিনীকেই পাকাপাকিভাবে গ্রীষ্মাবাস করব। আজ ফেলার সময়ে ভাবছি—আর কি কখনও এখানে আসা হবে?

ডাক বিভাগকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, আমার রোজকার চিঠিপত্র, খবরের কাগজ ইত্যাদি আমার ভ্রাম্যমাণ ঠিকানায় পাঠাতে আর পার্শেলগুলো তাদের কাছে (চিনীতে) রেখে দিতে। এখানে এসে পার্শেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যা পেলাম তা হলো—শ্রীনিবাসজী-প্রেরিত আমার আকাঙ্ক্ষিত বইগুলি, মশলার জার, চা, সাবান আর টিন ভর্তি মাছ আর মাংস। মাংসের টিনগুলো কেনবার সময়ে ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গির

উদারতায় মুগ্ধ হতে হয়। হেন জীবন নেই যার মাংস সংরক্ষিত হয়নি টিনগুলোয়। সর্ব জাতির, সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্ষ্য এবং অভক্ষ্য মাংস তার মধ্যে রয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই—আমি যাযাবর, আমি সর্বভুক।

বইগুলোর ওপর স্থাবর মালিকানার স্বত্ব আরোপ করার ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিলাম কাউকে দিয়ে যাব। কিন্তু কাকে দেবো? এখানকার লোক, অর্থাৎ শিক্ষকমহল মোটেই গ্রন্থ-প্রেমিক নন। আমার ইচ্ছে ছিল স্কুলে দান করে যাই। কিন্তু তাতে লাভ কি? যোগ্যপাত্রে দান না করলে দানের অমর্যাদাই হয়। একমাত্র রেঞ্জার দেবদত্ত শর্মা, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর বোন—এঁদের যদি বইগুলো দিই তো তার সদগতি হতে পারে এবং সেটাই করব ঠিক করলাম।

পুরাকালে লোকের ঘড়ি ছিল না। তবুও তারা সময়ের হিসাব রাখত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বহু বছর ধরে হাতে ঘড়ি বেঁধে ঘুরে-ঘুরে বদ অভ্যেস হয়ে গেছে। বেলা দেখে সময়ের আন্দাজ করবার আদিম কৌশলও জানা নেই। কি করব? সঙ্গে তো আর ঘড়ির দোকান নিয়ে ঘোরা যায় না! ঘড়ি একটা যন্ত্র। মেরামত করার দরকার হয় মাঝে মাঝে। বেচারী বহুদিনের সঙ্গীকে তাই সিমলায় রজনীদেবীর হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; দিনকতক সিমলার ঘড়ি-হাসপাতালে থেকে লুপ্তস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে। মাঝে মাঝে আজও যখন অভ্যাসবশে কবজির ওপর চোখ পড়ে যায়, মনটা ছাঁৎ করে ওঠে।

পোস্ট অফিসের আজকাল একটা নতুন নিয়ম হয়েছে, কোনো জিনিসের ফিরতি রসিদ না পাঠানো। বোধহয় অপ্রয়োজন বোধেই তারা পাঠায় না। আমরা সাধারণ মানুষ, ভেবে মরি। যে জিনিসটা পাঠানো হলো সেটা শেষ পর্যন্ত পৌছালা না মাঠে মারা গেলো! জানি না, আপনাদের কখনো এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে কি-না। আমার কিন্তু হয়েছে বেশ কয়েকবার। এ বারে সত্যার্থীজীকে যে বস্তুটি পাঠিয়েছিলাম, সেটার ব্যাপারেও ডাকঘরের একই রকম নীরব নির্লিপ্ত ভাব দেখেছি। ভাগ্য ভালো সেটা তিনি পেয়েছিলেন, না হলে 'কিন্নর দেশে' আপনাদের হাতে পড়ত না। সত্যার্থীজীর কড়া তাগাদা না থাকলে এ বই যে লেখা হতো না—সে কথা নিশ্চিত। আমি ভ্রমণে যত পটু, বাক্‌বিতরণে তার চেয়ে কম নই। কিন্তু লেখা-টেখার ব্যাপারে আমার আলস্য প্রায় হিমালয় প্রমাণ। আর কিছুদিন যাবৎ বলে লিখিয়ে নেওয়ার (ডিক্টেশন) অভ্যেস করায় কলম ধরার অভ্যেসটাও প্রায় চলে গিয়েছিল। সত্যার্থীজী কড়া লোক। আমি যাত্রার তোড়জোর করতেই তিনি বলে রেখেছিলেন, লেখা চাই, ভুলবেন না। সেই হুকুম মাফিক আমি রামপুর থেকে ক'টা অধ্যায় তাঁকে পাঠিয়ে দিই। তিনি সেটা পেয়েই আবার জোরালো তাগাদা করে এ বার একেবারে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। হায় সত্যার্থীজী হায়রে বেচারা টেলিগ্রাম! উনি বোধহয় ভেবেছিলেন আমি সিমলার আশপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি যে সিমলা থেকে দেড়শো মাইল দূরে ঝোলাকম্বল কাঁধে নিয়ে চক্কর কাটছি, বেচারী সত্যার্থীজী তা আর কেমন করে জানবেন! সে যাইহোক, তাঁর কথা অন্যথা করব না বলে আমি শপথ করলাম, যে, অতঃপর রোজ ষোলো পাতা করে লিখে যাব।

রামপুরেই শুনেছিলাম যে কনৌরে মধু খুব পাওয়া যায়। আর মধুর চেয়ে চিনির দাম বেশী হওয়ায়, ভেজাল হবার আশঙ্কা নেই। মধু যে ডায়েবেটিসে খাওয়া চলে, এ তথ্যও আমার রামপুরে শেখা। কাজেই, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মধুভোজী ও মধু-সঞ্চয়ী হয়ে পড়েছি। এই সঞ্চয়ই আবার ফেরার পথে গোল বাধাল। এই দু-তিন সপ্তাহে প্রায় সের তিনেক মধু জমেছে। লাল মধুই জোগাড় হয়েছে অবশ্য, সাদা মধুর সীজন এখন নয়। কিন্তু এখন এ বোঝা বই কেমন করে? শেষে এক বুদ্ধি ঠাউরালাম। পুণ্যসাগরকে বললাম, 'ওহে হয়েছে—মধুর সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি।' পুণ্যসাগর তো অবাক—কেমন করে? আমি বললাম, 'গতবার রুশ দেশে থাকতে মিষ্টি মিষ্টি আটার পিঠে খেয়েছি। ঐ জিনিসটা আমার ভারী প্রিয়। রুশে ওটা প্রাচীন খাবার; কিন্তু প্রাচীন যুগে ওরা চিনি গুড় পেত কোথায় যে পিঠেতে মিষ্টি দেবে? নিশ্চয় তা'হলে বীট পালঙের চিনি। কিন্তু সেটাও এমন কিছু পুরনো জিনিস নয়। অতএব সত্যযুগে ওরা সব মধু খেয়েই থাকত নিশ্চয়ই। চালাও পান্‌সি। আমিও তাই করব। তুমি (পুণ্যসাগর) ভালো করে 'ময়েন' দিয়ে খুব মুচমুচে বেশ খানকয় পিঠে কর দেখি।' পুণ্যসাগরও যথারীতি কোমরে গামছা বেঁধে লেগে গেলো। ফলত মধুস্রোতে ভাঁটা পড়ল।

চিনীতে মামুলী চেনা-পরিচয় হয়েছে অনেকেরই সঙ্গে। কিন্তু সেই পরিচয় মামুলীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছায়নি—এক জায়গায়ও না। দোষটা হয়ত উভয় পক্ষেরই। সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন ডাক্তার ঠাকুর সিং। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কমপাউণ্ডার-ডাক্তার, পুরো ডাক্তার নন। চিনীর বহুদিন ডাক্তার-সঙ্গ-বঞ্চিত হাসপাতালের রুগীরা আর তাদের পরিজনেরা আদর করে ঠাকুর সিংকে অনারারী ডক্টরেট উপাধি দিয়েছে।

ঠাকুর সিংয়ের দিনে দু'বার রূপ বদলায়। এক রূপ সূর্যোদয়ের আগে। অন্য রূপটা দেখা যায় সূর্যাস্তের পরে। নিয়মিত মদিরা সেবন করে থাকেন সিংজী। সুরাপানের প্রাচুর্যের ফলে মাঝে মাঝে জিভ এড়িয়ে যেতে দেখেছি তাঁর। আড়ষ্ট জিভ নিয়ে কথা বলতে অসুবিধে হয়েছে, কিন্তু হাত-পা টলেছে কখনও? কেউ বলতে পারবে? নৈব নৈব চ। প্রায় অশক্ত জিভ নিয়ে ঠাকুর সিং কিন্তু অনর্গল বক্তৃতা করেছেন—একই সঙ্গে সুর ও সুরার গুণকীর্তন, দেবতা ও সোমরসের মহিমা বর্ণনা। ঠাকুর সিং মদ্যাসক্ত হলে কি হবে, মাংস তিনি ছোঁন না একদম। সিংজীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা যা কিছু হয়েছে—তা সবই প্রায় দুপুরের ঝোঁকে। যখন অপ্রকৃতিস্থ হতে তাঁর অনেক সময় হাতে থাকে, তখন। সুরা সম্বন্ধে সিং মশায়ের অত্যন্ত সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পেয়েছি। তাঁর মতে পুরাকালের ঋষি-মহর্ষিদের প্রেরণার উৎসস্থল না-কি এই সুরা। সোমরস মদেরই নামান্তর। —কথাটা প্রণিধানযোগ্য।

ঠাকুর সিংয়ের সহপায়ীদের মধ্যে আমার আলাপ হয়েছিল ধর্মানন্দের সঙ্গে। ষাটের ওপর বয়েস। আগে তহশীলদারের মুহুরী ছিলেন, বর্তমানে পেন্‌সন নিয়েছেন। মদ খাওয়ার ব্যাপারে দুটি জিনিস মেনে চলতে তিনি নারাজ। এক—সময়, দুই—মাত্রা। বন্ধুবান্ধব কেউ দেখা করতে এলেই, তাদের সম্মানার্থে তিনি দু-এক ঢোক পান

করেন। আর পরিমাণ? তা ও সব ব্যাপারে মাত্রাধিক্য ঘটেই থাকে। একবার এক ইয়ার-দোস্তের বাড়ি থেকে পানান্তে ফিরে আসছিলেন। উঁচুনীচু রাস্তায় পায়ের ঠিক রাখা মুস্কিল। গড়িয়ে পড়ে কর্ণমূলে চোট পেলেন বেশ! রক্তটক্তও মন্দ ঝরল না। ভাগ্য ভালো, যাতায়াতের পথের ওপরেই পড়েছিলেন। কারও নজরে পড়ে যেতেই সে ঠাকুর সিংকে গিয়ে খবর দেয়। তখন সিংজী আবার লোকজন জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে আনেন।

এ সব শুনে পুণ্যসাগর একদিন আমায় বললে, 'এমন কোনো বই নেই যা পড়লে লোকে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজে পাবে?' হা হতোস্মি! মদ খাওয়া ছাড়বে যুক্তিপ্রণোদিত হয়ে, বই পড়ে? সেই আনন্দেই থাকো। আরে বই থাকবে না কেন? অনেক আছে। কিন্তু দেখছ চোখের সামনে, পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে রক্তপাত হচ্ছে তবু লোক মদ খাওয়া ছাড়ছে না। সেখানে বই পড়িয়ে উপদেশ গিলিয়ে মদ খাওয়া ছাড়াবে! যা হবার নয়, সেটা নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান মাথা ঘামায় না।

অমৃতসরের তরুণ রেঞ্জার পণ্ডিত দেবদত্ত শর্মার সঙ্গেও আলাপ হলো। সদ্য বিবাহিত যুবক। বৌ আর বোনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। জোয়ান রক্ত—কাজেই পরিশ্রমী আর কাজে নিষ্ঠাও আছে প্রভূত পরিমাণে। ভাবি, এ রত্ন এখানে টিকলে হয়। ঘুষ নেবার ব্যাপারে ভীষণ রকম মারমুখো প্রকৃতির নীতিপরায়ণ ব্যক্তি!

পাঞ্জাবের হিন্দুরা হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারটা মা-বোনেদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল এতদিন। হালে দেখছি অবস্থার বদল ঘটেছে—হয়ত দায়ে পড়েই। পাঞ্জাবের রাজ্যসরকার 'গুরুমুখী'কে রাজ্যভাষা (প্রাদেশিক) করে দিয়েছে। বাধ্য হয়েই শর্মাজীর মতো তরুণদের হিন্দী শিখতে হয়েছে। তাতে সরকারী চাপও বেশ। শুনলাম, অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই না-কি হিন্দীর পরীক্ষা হবে। তা শর্মাজী আমাদের বেশ উন্নতি করেছেন দেখলাম। বইপত্র যা আনিয়েছিলাম, শর্মাজীর বোন এবং বউ তার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। শর্মাজীর মিশুকে স্বভাবের জন্যেই হোক আর আমার এই নাছোড়বান্দা অভ্যেসের জন্যেই হোক—দু'জনের বেশ মিল হলো। আমার ডেরায় তাঁর পদার্পণ প্রায়ই ঘটতে লাগল। 'কিন্নর দেশে'-র অংশবিশেষ মাঝে মাঝে তাঁকে পড়ে শোনাতেও হচ্ছিল। রোববার রোববার সন্ধ্যার দিকে আমিই যেতাম তাঁর আস্তানায়। কাটছিল মন্দ নয়। আমার দুঃখ হতো শর্মার বৌ আর বোনের জন্যে। বেচারীদের অবস্থা সঙ্গীন। এসে পড়েছে একেবারে জঙ্গলে। কি করবে? পর্দানশীন তারা না হলেও, যাবেই বা কোথায়? কাজেই হয় রান্নাঘরের তদারক কর, নইলে বাড়ি বসে বসে বই পড়। বর্ষা এখানে কম হলেও একেবারে অনাবৃষ্টি নেই। সেই ক্ষণবর্ষণের ভরসাতেই লোক চাষবাস করে। ওপর-পাহাড়ের কাণ্ডাতে পুরো চাষটাই মেঘ দেখে হয়।

খুব ভালো ভুট্টা হয়েছে এ বার এখানে। পথে যেতে যেতে দেখি আর জিভে জল আসে। এ অঞ্চলে আলুর চাষও ভালো হয়। জগজ্জয়ী ফস্‌ল। বস্‌পার লোকেরা বলে, তারা ধান উৎপাদনের অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু কাজ হয়নি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুযায়ী তাদের কিছু উপদেশ দিলাম। বললাম, 'কাঠের বড় ভাস্‌-জাতীয় জিনিসে বেশ মাটি, জল দিয়ে ধানের বীজ পুঁতে দিন। তারপর দিনের বেলায় রোদ্দুরে রেখে

রাত্তিরে ঘরের ভেতর আগুনের পাশে রেখে দিন। ধানের চারারা যা খায় তা দিনের বেলায় খায়, সূর্যের আলো-বাতাস খেলেই ওদের চলে, রাত্তিরে ওদের কোনো বায়না নেই। জুন মাসে বীজধানের চারা ক্ষেতে লাগিয়ে দিন। দিয়ে দেখুন দিকি একবার—কদ্দূর কি হয়?'

ওরা খুশী হয়ে বললে, 'বাঃ এর আর এমন কি কষ্ট? আমরা তো মূলোও এমনি করেই লাগাই।'

আমি বললাম, 'দেরাদুনের বাসমতী চালের পরেই দোসরা নম্বর হলো রাম-জোয়ান। তার বীজ এনে লাগিয়ে দিন। চাল হবে এক একটা বড় মটর কলায়ের সমান। দেখবেন সিমলায় হাঁক-ডাক পড়ে যাবে।'

চৌঠা জুলাই হাল্কা বৃষ্টি হলো। কনৌরী কিষাণের মন যত ভিজল, মাটি তত ভিজল না। সকালে বৃষ্টি, অথচ সন্ধ্যেবেলায় আবার রাস্তার ধুলো উড়ছে। এখানে আমার ডেরার বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে—শতদ্রুর কিনারা দিয়ে মেঘগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে, জড়াজড়ি করে, দৌড়াদৌড়ি করে চলেছে, বাতাসে সাঁতার কাটছে। আর মাঝে মাঝে সেই দুধ-সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের সোনালী আলো, এক ঝলক আলোর ঝরণা—ধানের ক্ষেতের মতো আমার মনকেও ভরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এ সব দেখে শুনে, মনে হয় আমার মতো একটা নীরস লোক এখানে না এসে যদি একজন কবি কি শিল্পী আসত! কিন্তু সে কি এই কিন্নর চাষীদের ত্রাহি ত্রাহি রব সহ্য করে টিকতে পারত? সন্দেহ আছে।

আমার এখানে সৌন্দর্য উপভোগ করবার অবসর কোথায়? একদিকে মাছি, অন্যদিকে শ্বেতপক্ষধারী মশা, এই উভয়ের যুগপৎ আক্রমণ থেকে অবিরত বাঁচবার চেষ্টাতেই সব শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট মশা, কিন্তু কি উদগ্র কামড়! কিন্তু মশা মাছির তো তবু পার আছে সব চেয়ে যা অপরাজেয় তা হলো পিসু। একটা শ্লোক আছে—

ক্ষীরাব্ধৌ হরিঃ শেতে, হরঃ শেতে হিমালয়ে।
ব্রহ্ম চ পঙ্কজে শেতে, মন্যে মৎকুণশঙ্কয়া ॥

তা এ মৎকুণ—আমার মতে ছারপোকা কি উকুন না হয়ে পিসুই হওয়া উচিত। পিসুর উপদ্রবে অস্থির। কি করে বাঁচবেন আপনি। ঘরদোর সাফ করলেন। বাইরের অতিথির গায়ের জামাকাপড় থেকে আবার এল। ভেবেছিলাম, উকুনের হাত থেকে বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। ও মশাই সে দিন সকালে দেখি কাপড়ের ফাঁকে এক শ্বেতাঙ্গ উকুন! অথচ ফি-রোববার গরমজল করে সাবান মেখে স্নান করি। জামাকাপড় সাফ করার কমতি নেই। আপনারা বলবেন, হপ্তায় একদিন কেন? রোজ নাইলেই তো হয়। রোজ নাওয়ার কষ্টটা আর কি? পুণ্যসাগরের জল গরম করতে আলস্য নেই, জ্বালানি কাঠের অভাব নেই, ব্রোক্বীর বাংলোয় একটা স্নান-ঘরও মজুত রয়েছে—তবে? কষ্ট বা অসুবিধা কিছু নেই, কিন্তু একটা স্থান-মাহাত্ম্য আছে তো? এ জায়গার নাম হিমালয়। এখানে রোজ চান করলে কৈলাসের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ন হয়। আটত্রিশ বছর আগে কেদারনাথে বসে বাবা ধর্মদাস যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা ভুলি কেমন করে? তিনি

বলতেন, 'বাচ্চা, এ স্থানে রোজ স্নানের কোনো প্রয়োজন নেই। কৈলাসের হাওয়াই স্নানের কাজ করে।' আমি গুরুর উপদেশ লঙ্ঘন করিনি।

তা তো হলো, কিন্তু উকুন এল কোথা থেকে? খোঁজ, খোঁজ। সন্ধান পাওয়া গেলো, যে মহোদয় কাপড় কাচেন, তাঁর পুণ্য অঙ্গ থেকেই উকুনের আবির্ভাব ঘটেছে।

এখানে সড়কের দু'ধারে ফলের গাছ। অজস্র ফল ধরেছে। তার মধ্য বড় জাতের আপেল আছে। আর আছে খোবানী। স্থানীয় নাম চুলী। আশ্চর্য, আজ এখানে ফলের কোনো কদর নেই। যে যত পারে কুড়িয়ে খায়, পেড়ে খায়, বাকি সব পড়ে থাকে, পচে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায়। অথচ 'নাচার' পর্যন্ত মোটরোপযোগী রাস্তা হয়ে যাক, তখন দেখবেন—পড়তে পাচ্ছে না। পাকা ফলই তখন পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। কাঁচা, আধপাকা অবস্থাতে সে ফল তখন হয়ত চালান হয়ে যাবে দেশের অ-ফলা অঞ্চলগুলির প্রয়োজন মেটাতে। আমিও তাই চাই। কিন্তু সেটা কবে হবে?

হঠাৎ বর্ষা নেমে যাওয়ায়, এখানে খোবানীর (চুলী) বেশ ক্ষতি হয়ে গেলো। আর যদি ক'দিন রোদ না ওঠে, তবে প্রচুর ফল পচে যাবে। তখন সারা বছরটা এদের কষ্টে কাটবে।

ব্লেডের যুগে, দাড়ি কামানোর কোনো সমস্যা নেই। তবুও ন-মাসে ছ-মাসে নাপিতের মুখ একবার দেখতেই হয়। কিন্তু এই হিমালয়ে নাপিত কোথায় পাব? হঠাৎ মনে হলো পুণ্যসাগরের বন্ধু কমলানন্দের কথা। সে এই বাগানের মালী। কিন্তু বাগানের মতো, তার দাড়ির অবস্থা তো অত অসংস্কৃত নয়। পনেরো দিন অন্তর একবার করে ওদের দুই বন্ধুর মুখেই শুক্লপক্ষের উদয় হয়। এখানে নাপিত পায় কোথায়? খুঁজে দেখতে হয়। এক ভূতপূর্ব শিক্ষক, বর্তমানে দোকানদার, তরুণ নেগী বলবন্ত সিংকে ডেকে সমস্যাটার কথা বললাম। নেগী বলল, 'ওঃ চুল কাটবেন? তা আর অসুবিধে কি? আমাদের হেডমাস্টার মশায় চমৎকার চুল দাড়ি কাটেন।' ভুল শুনিনি তো? কিন্তু না! হেডমাস্টার মশায় এলেন, তাঁর দক্ষ ক্লিপ-চালন কৌশলেই বুঝলাম তিনি পেশাদার। জন্মান্তরে বিশ্বাস নেই, নইলে বলতাম—পূর্বজন্মের অভ্যেস!

কাল কুঠিতে বিখ্যাত গায়িকা 'হিরুপোতী' ('পোতী' মানে 'বতী' এটা বুঝেছি, কিন্তু মাথা খুঁড়েও 'হিরু' শব্দের কোনো অর্থ বোধগম্য হলো না) এসেছিল গান শোনাতে। লোকে কথায় বলে, কিন্নরকণ্ঠী। প্রাচীন কাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত কিন্নরদের গানের গলা প্রশস্তি পেয়ে এসেছে। হিরুপোতী গাইতে এসেছিল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তার গান শোনা আমার কপালে নেই। আমায় লিখতে বসতে হবে। না লিখলে, গান শুনতে পারতাম। কিন্তু তা'হলে 'কিন্নর দেশে' লেখা হয় না। বই না বেরুলে আপনারা পাঁচজন পড়তে পান না। কাজেই হিরুপোতীর গান না শোনার জন্যে যা ত্রুটি হয়েচে, তার জন্যে আপনারা আমার সঙ্গে সমান দায়ী।

শিল্পী হিরুপোতী ছুতোর বংশের মেয়ে। ওদের বংশটা কিন্তু কলারসিক ও বিদগ্ধজনের বংশ। ওর দুই পিসি 'বনাছো' আর 'খইছো' (তারা দু'জনেই জীবিতা, বয়স তিন কুড়ি দশের আশপাশে) কিন্নর দেশের নাম-করা কবি। কাজেই জেনে রাখুন, কিন্নর দেশের ছুতোর শুধু বিশ্বকর্মাই নয়, তারা সরস্বতীও।

মানুষ নিজেকে যত বেশী ছড়ায়, বাইরের আঘাত তত বেশী করে লাগে। ব্যক্তিত্বের দিগন্ত বাড়লে, যন্ত্রণার সীমারেখাও প্রসারিত হয়। ডাক-ব্যবস্থা ভালো নয় বলে হিমাচলের লোক অন্ধকারে থাকে, পৃথিবীর খবরাখবর পায় না। সেই সঙ্গে অনেক ধাক্কাও তাদের কাছে পৌঁছায় না। এটা একদিকে থেকে ভালো। অবশ্য আমার কথা আলাদা। বাইরের সুখ-দুঃখ বোধটা বেশ লোপ পেয়ে আসছে। ওরা যেন কিন্নর পাহাড়ের চটি। এই আছে, এই নেই— রাত পোহালেই নতুন জায়গা। কাজেই মায়া করব কার জন্যে! এর নাম যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, তা'হলে বলব, গীতা-শাস্ত্র নয়, ভবঘুরে শাস্ত্রই এ শিক্ষা আমায় দিয়েছে।

শুধু ফল নয়, কিন্নর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর খনিজ ধাতু মাটির ভেতর লুকিয়ে আছে। তা দিয়ে এ দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পারে। 'কার শ্রাদ্ধ কেবা করে'—এই ভাব ছেড়ে দিয়ে সরকার যদি এ বিষয়ে সচেষ্ট হন, তো আমার বিশ্বাস, খুব অল্পদিনের মধ্যেই দেশের চেহারা বদলে যাবে। দরকার প্রথমে একটা জিনিসের—ভালো মোটরোপযোগ রাস্তা ও যানবাহনের উন্নত ব্যবস্থা।

দেবীর মেলা

এ বছর কিন্নর দেশে ছাগলের মহামারী হয়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি প্রচুর ছাগল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে বেশীরভাগই মরেছে সেটা বলাই বাহুল্য। যে দেশে মানুষের জন্যেই ডাক্তার-ওষুধের ব্যবস্থা নেই, সেখানে ছাগলের কি যে হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। পঙ্গী গ্রামের একশোটি পরিবারের কম করেও হাজার খানেক ছাগল ছিল, তার মধ্যে আড়াইশো প্রাণী মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিঙে ফুঁকেছে। কোঠির চণ্ডিকা দেবীর শরণ নেওয়া হলো। শুনলাম তিনি কিছু ছাগল বলি চেয়েছেন। তা মন্দ কথা কি? মড়কে যখন এতই মরছে সে জায়গায় ক'টা ছাগল চণ্ডী খাবেন, এ আর এমন কি বেশী?

দেবীর মেলায় বলিদানের ব্যাপারটা রীতিমতো বীভৎস। দেখে-শুনে দেবী আর তার চেলাদের ওপর আমার পিত্তি চটেই ছিল। পরদিন সন্ধ্যেবেলা এক বিরাট সভায় তাদের ক'জনকে বেশ ধমকানি লাগালাম। বললাম, 'দেখ বাপু তোমাদের দেবী, তোমাদের দেশের শুধু নয়, সারা ভারতের পক্ষে কলঙ্কজনক কাজ করছেন, তা কি বুঝে দেখেছ।' কাল মেলায় বলির সময়ে আমি ক্যামেরায় ফটো তুলেছিলাম। শ্রোতাদের বললাম, 'বিদেশীরাও এই বীভৎস বলির ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরের পৃথিবীতে দেখিয়ে বলবে যে, ভারতবর্ষে এই রকম করে পূজো হয়। কেন বাপু? এ সব করার দরকার কি? দেবী মদ-মাংস খান তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি নিজে মদ না খেলেও মাংস খাই। ছাগল ভেড়া গোপন জায়গায় মেরে, তারপর ভালো করে ঘি-মশলা দিয়ে রান্না করে দেবীর ভোজ হোক। কিন্তু হাজার হাজার লোকের সামনে দেবীর এই খেচেকুঁদে কাঁচা মাংস খাওয়া—এ চলতে পারে না।'

সকলেই 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' করে ব্যাপারটা মেনে নিল দেখলাম। দেখে শুনে আমার বেশ ভরসা হলো। তাদের আরও কিছু জ্ঞান বিতরণ করে উঠব-উঠব ভাবছি এমন ওরা প্রশ্ন

করল, 'আচ্ছা পণ্ডিত, বিশ বছরের ওপর সবাইকার্ নাম লিখছে কেন বলো তো? তোমার কি মনে হয়?'

কে একজন বললে, 'মনে হয় যুদ্ধে পাঠাবো।'

আমার হাসি পেল। বললাম, 'আচ্ছা সে না হয় জোয়ানদের পাঠাল। ধরে নিলাম জোয়ান ছেলেদের সবাই যুদ্ধে যাবে, কিন্তু যাট-সত্তরের বুড়ো-বুড়িরা? তারাও কি বন্দুক কাঁধে করবে?'— আর জবাব নেই। আবার ঘন্টাখানেক ধরে তাদের বোঝাতে হলো যে, পুরনো ইংরেজ রাজা-রাণীর আমল আর নেই। এখন এ দেশে পঞ্চায়েতী রাজত্ব হয়েছে। তোমাদের পাঁচজনের মত নিয়েই পঞ্চায়েতী শাসন। তাই এই নাম লেখানো। বক্তৃতা শেষ করতে করতেই রাত হয়ে গেলো। চিনীর মাষ্টার মহাশয়রা চিনী চলে গেলেন। আমি নিচে ফিরে এলাম!

ডায়বেটিসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর থেকে আমার ভরঘুরের ঝুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে জরুরী কয়েকটা ওষুধ। সেদিন যখন 'ডাক্তার' ঠাকুর সিং মুমূর্ষু এক রুগীর কথা বলছিলেন, তখন মনে পড়ল আমার ঝুলিতে গোটা দুই পেনিসিলিনের শিশি পড়ে আছে। রোগের যা বিবরণ শুনলাম, তাতে মনে হলো বাত-ব্যাধি। কিন্তু সমস্যা হলো—ইন্‌জেক্‌শন দেবে কে? আমি ইন্‌জেক্‌শন দিতে জানি, কিন্তু পেনিসিলিন দেবার আইনসঙ্গত অধিকার আমার নেই। ঠাকুর সিংয়েরও প্রায় ঐ দশা। সে আসলে কম্পাউণ্ডার আর পেনিসিলিনের নামও সে ইতিপূর্বে শোনেনি কখনও। অথচ রুগীর যদি, ঈশ্বর না করুন, ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায়—সেটাও ঠিক নয়! কাজেই দুগ্‌গা বলে ঝুলিয়ে দিলাম ঠাকুর সিংকে। কখন ক'ঘন্টা অন্তর দিতে হবে সব বুঝিয়ে তাকে এক শিশি পেনিসিলিন আমার ঝুলি থেকে দিয়ে দিলাম।

রুগী বাবু শ্যামাচরণ গত ছ'দিন ধরে অঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিলেন। তিন ঘন্টা অন্তর তিনটে পেনিসিলিন পড়তেই শ্যামাচরণ চোখ খুলে বলে উঠলেন, 'কেন খামোখা আমার শরীরটাকে ছুঁচ ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঝাঁঝরা করছ?' বুঝুন মহিমা পেনিসিলিনের! আমি আরেকটা শিশিও ঠাকুর সিংয়ের হাতে তুলে দিলাম। দাম জিজ্ঞেস করতে বললাম—এটা পুণ্যের দামে নিলাম।

খোয়াঙ্গী গ্রামে শ্যামাচরণের বাড়ি। তাদের বাড়ির লোকের পীড়াপিড়িতে তাদের ওখানে একবার যেতেই হলো। গিয়ে দেখলাম শ্যামাচরণের অবস্থা অনেকটা উন্নত। রোগের চিহ্ন নেই। তবে দীর্ঘদিনের রোগভোগে অপরিসীম দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মুখ দিয়ে ভালো করে কথা সরছে না। ছাগলের দুধ, ডিমের কুসুম, আঙ্গুরের রস আর টেংরির জুস পথ্য দিতে বললাম।

খোয়াঙ্গী থেকে শতদ্রুর সেতুর দিকে রওনা হলাম। সমস্ত রাস্তাটাই উৎরাই। এদিকে ভুট্টার ক্ষেত প্রচুর। ফসল ভালো হয়েছে। শতদ্রুর ওপর পারাপারের সেতু। এটাও ঝোলা সেতু। তা বলে লছমন ঝোলা ভাবলে ভুল করা হবে। সে রকম পাকা বন্দোবস্ত নয়। একটা মোটা লোহার তারকে দু'দিক দুটো শক্ত খোঁটা দিয়ে নদীর এপার-ওপার করে টেনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটা লোহার পুলি সেই তারের সঙ্গে লাগানো থাকে আর ওজনের পাল্লা তার গা থেকে ঝুলছে। সেই পাল্লাটার সঙ্গে কায়দা

করে একটা মোটা দড়ি বাঁধা। সেই দড়িটা নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত লম্বা করে বাঁধা। দু'পারে দু'জন লোক হামেশা মোতায়েন করা আছে, যাত্রী গেলে, তাকে টেনে পার করার জন্যে। যাত্রীর কাজ হলো সেই পাল্লা গোছের জিনিসটার ভেতর আশ্রয় নেওয়া। আমিও তাই করলাম। হুস করে ঝোলা সেতুর পাল্লা আমায় নিয়ে শতদ্রুর মাঝবরাবর ঝুলতে ঝুলতে চলে এল। নিচে গভীর নদী। আমার মাথার ওপরে আকাশ, আর নদীর মাঝখানের পায়ের নিচে অথৈ শূন্যতা। নিচে তাকিয়ে দেখলে মাথা ঘুরে যাবার কথা। আমিও ভয় পেতাম যদি এ সব অবস্থার সঙ্গে আগে থেকেই জানাশোনা না থাকত।

নদীর এ পার থেকে রাস্তা ক্রমশ ওপরমুখো গেছে। পথে পড়ল তঙলিঙের ক্ষেত। এককালে তঙলিঙ বেশ বড় গ্রাম ছিল। আজ সে গ্রামের চিহ্নও নেই। তঙলিঙের ক্ষেত-খামারগুলো এখন পোয়ারীর লোকদের হাতে চলে গেছে। ভালো ক্ষেত— চমৎকার ফসল হয় তাতে। বছরে দু'বার তো বটেই, 'এমন কি সময় বিশেষে তিনবারও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা শোঙঠঙ পৌছে গেলাম। শোঙঠঙে কোনো গ্রামবসত নেই। গ্রাম রারঙ এখান থেকে দু-তিন মাইল ওপরে শোঙঠঙে বন-বিভাগের ডাকবাংলো। বাংলোর গা দিয়েই শতদ্রু বয়ে গেছে। নদীর ওপারে বিশাল কর্কশ পাহাড় উঁচু পাঁচিলের মতো খাড়া হয়ে উঠে গেছে। ৫৭০০ ফিট উঁচুতে শোঙঠঙের ডাকবাংলোখানি ছোট হলেও মনোরম। খান দুই কামরা। ইচ্ছে করলে তাতে দু'জন কেন চারজনও কাটাতে পারে। কথায় বলে—যদি হয় সুজন, তো তেঁতুল পাতায় ন'জন।

বন-বিভাগের সহকারী সংরক্ষক ঢিলন সাহেবের সঙ্গে আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। এখানে তাঁকে দেখতে পাব আশা করিনি। পেয়ে খুশী যে হলাম সেটা বলাই বাহুল্য। একটু সঙ্কোচও হলো, দুটি মাত্র কামরা তার একটা আমি বেদখল করব ভেবে। ঢিলন সাহেব কাজে বেরিয়েছিলেন। ফিরলেন সূর্যাস্তের পর। আমায় আন্তরিক আপ্যায়ন জানাতে ক্রটি করলেন না। প্রমাণ হলো আমরা উভয়েই সুজন। আশপাশের পাহাড় থেকে ঢিলন এক রকম স্ফটিক সংগ্রহ করছেন। স্ফটিকগুলো বিশেষ জাতের এবং বহুমূল্য। এদিকে উপযুক্ত অনুসন্ধান চালালে খনিজ পদার্থের ব্যাপারে আমরা লাভবান হতে পারি। দেখলাম এ বিষয়ে ঢিলন সাহেব আমার সঙ্গে একমত। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, সরকারের তেমন কোনো নজর নেই এদিকে এবং আমারও ধারণা তাই।

যাত্রাপথ প্রায় শেষ হয়ে এল। ফেরার পথে চড়াই বিশেষ পড়েনি। তাই ক্লান্তিও তেমন বোধ করছি না। বাংলোয় বসে না থেকে ভাবলাম ক্ষেতের ধারে বেড়িয়ে আসি। ক্ষেতে রারঙ গ্রামের কিন্নরীরা খুরপি দিয়ে ক্ষেত নিড়োচ্ছিল আমাদের দেখে খুরপিগুলো সামনে ফেলে দিয়ে বসে রইল। অর্থাৎ 'পয়সা দাও গান খাব।' তিন-চারজন তরুণী কিন্নরীকে একটা টাকা দিয়ে আমি বললাম, 'গান শোনাও' কিন্নরীদের গান গাইতে সাধতে হয় না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেলো সুললিত কণ্ঠের 'গিত'।

'চুনীলাল ডাক্তারের' জীবন নিয়ে কাহাগাথা, প্রেম করে একটা মেয়ে কেমন করে ডাক্তার বেচারার জীবনটাকে চুরমার করে দিয়ে গেলো। [illegible]

সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে লাগল—সেই গীতি-আলেখ্য। এইসব মানবিক প্রেমের ব্যাপারে দেবদেবীরাও ঘন ঘন লিপ্ত হয়ে পড়েন, সে ঘটনাও এদের গানে শোনা যায়। গান শুনিয়ে মন তৃপ্তিতে ভরে দিতে পারে কিন্নরীরা।

পরদিন সকালে পৌনে আটটায় প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম শোঙঠঙ থেকে সাঙলার পথে। এ রাস্তাও প্রায় সমতল। বিশেষ চড়াই-উৎরাই নেই। কিছুদূর এগোবার পরই চোখে পড়ল সবুজ শোভায় ভরা শতদ্রুর ওপারে তট। চোখ যেন জুড়িয়ে গেলো। ঠিক যেন পাড়ের ওপর সবুজ মখমলের কাজ করা। পুণ্যসাগর বললে, 'ঐ হলো 'রোগী'র আঙ্গুরলতা—সবুজ সবুজ লতায় নদীর পাড় ছেয়ে রয়েছে।' ঠাহর করে দেখলাম ছোট ছোট কাঠের খুঁটির গায়ে সযত্নে আঙ্গুর চারাগুলিকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই লতায় একদিন ফল ধরবে ছোট ছোট কালো আঙ্গুর। সে আঙ্গুর আমি খেয়ে দেখেছি। জগতে কোথাও সে আঙ্গুরের তুলনা নেই। যেমন মিষ্টি স্বাদ, তেমনি সুন্দর গন্ধ অথচ এ আঙ্গুর অন্য কোথাও থেকে চারা এনে কিন্নর দেশে লাগানো হয়নি। এ কিন্নর দেশের ঘরের জিনিস। একান্ত নিজস্ব।

পাক্কা আড়াই ঘণ্টা অর্থাৎ পুরো সাত মাইল চলবার পর, আমরা শতদ্রুর ধার ছেড়ে বস্‌পার দিকে মুখ ফেরালাম। এখান থেকে সাঙলা এগারো মাইল। ক্রুয়া থেকে নতুন মালবাহক নেওয়া হয়েছে। মালপত্তর নিয়ে তারা এগিয়ে গেছে। পেটপুজো করতে খানিক সময় গেলো। কিছু কিছু মাল বনবিভাগের ঝোপড়ীতে ফেলে রেখে আমরা এ বার সাঙলার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। নম্বরদার আমীচন্দের ঘোড়াটা ভালো ছিল, কিন্তু আমি মাত্র ফারলঙ দুই সে ঘোড়ায় চড়ে গেছি—বাকি সবটা পথ হেঁটেই মেরেছি। রাস্তায় চড়াই কম ছিল। তবু দমিনি। এদিকে প্রচুর বর্ষা হয়—চিনীর তুলনায় অনেক বেশী। দেবদারু জাতের গাছে চারদিক সবুজে ভরে আছে। শতদ্রুর সঙ্গমস্থল থেকে তেরো মাইলের মাথায়, ৮৫০০ ফিট উঁচুতে সাঙলা। বস্‌পা ৩০০০ ফিটের বেশী নয়। পথের মাঝখানেই ক'বার দু'পশলা বৃষ্টি নেমে আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে গেলো। তাইতে মনে পড়ল আগস্ট মাসটা বর্ষার মাস।

পৌনে পাঁচটা নাগাদ ডাকবাংলোয় পৌঁছে গেলাম। বাংলো নদীর এ পারে, গ্রাম ও পারে। এ বাংলোটিও চিনীর বাংলোর মতো বেশ বড়সড় গোছের। তিন চারজন সাহেব যাতে বেশ আরামে বাস করতে পারেন, তাই ভেবে কায়দা করে করনো। এ সব প্রাসাদোপম বাংলোগুলো সেকালে করানো হয়েছিল প্রমোদগৃহের প্রয়োজনে। সাহেব-সুবোরা শিকার করতে এসে, বিশ্রাম করতেন এখানে। তা সাহেব বাহাদুরের দল তো চলে গেছেন, এখন আমার মতে সমস্ত কিন্নর-লোকেরই বাংলোয় প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

সাঙলা বেশ বড় গ্রাম। দুশো সাতাশটি পরিবারের বসতি। রুই মাছ এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু আমি এখানে বাংলোয় বসে রুই মাছ শিকারের আয়োজন করতে আসিনি। আমার এখানে আসার খবর সকলেরই জানা তবু এখনও কেউ দেখা করতে এল না। কাল সন্ধ্যেবেলাও কেউ আসেনি। আজ বেলা আটটা বেজে গেলো, এখনও না। এসেছি মানুষ দেখতে—মানুষ আমার কাছে না এলে, আমাকে যেতে হবে তাদের কাছে।

বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর উৎরাই পথ, একটা কাঠের সেতু, তারপর কিছুটা চড়াই পথ পার হলেই সাঙলা গ্রাম। গলি, ঘুঁজি, নালা-নর্দমা, লোকে সব জায়গাই পায়খানার মতো ব্যবহার করছে। দেখে মনে হলো এ জায়গায় আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। মাথার ওপরে বৃষ্টি। ভাগ্যে দিনের বেলা পথ চলছি, তাই রক্ষে। এত নোংরা কোথাও দেখিনি। জঙ্গীতে না, স্পুতে না। এইখানেই বৌদ্ধ সভ্যতা আর ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রভেদ। ব্রাহ্মণেরা পায়খানাকে মহানিষিদ্ধ বলে গণ্য করেন কি-না তাই সারা গ্রামটাকেই লোকে পায়খানাতে পরিণত করেছে! এই পায়খানার অভাব এবং গ্রামের যত্রতত্র নির্বিচারে পায়খানা করে বেড়ানোর কু-অভ্যাস এ যে শুধু এই গ্রামেরই নিজস্ব ব্যাপার তা নয়। সারা ভারতবর্ষ আজ এই এক রোগে ভুগছে। নোংরামি অপরিচ্ছন্নতার বিষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

সাঙলা থেকে মাইল খানেক দূরে কামরুতে থাকে মোনে রৌলা। তার সঙ্গে তার গুহায় গেলাম। গাঁয়ের বাইরে একটা বড় পাথরের নিচে, গুহার সামনের অংশটায় মাটির দেওয়াল তুলে বেশ ঘরের মতো করে নিয়েছে মোনে রৌলা। সেইখানেই তার চালচুলো, সেইখানে বসেই সৎসঙ্গ আর রামানুজী বাণীর প্রচারকার্য হয়ে থাকে। সাঙলা গ্রামের বদ্রীনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আমার অভ্যর্থনা সভায় গ্রামের লোক সবাই ভিড় করে জুটেছিল। আমাকে সংবর্ধনা জানানো ছাড়া, সভার আরও একটা 'অ্যাজেণ্ডা' ছিল, কিন্তু সভায় কিছু কিছু শিক্ষিত লোকের সমাগম হওয়ায় সেই প্রস্তাবটা আর উত্থাপিত হতে পারেনি। ব্যাপারটা আমি পরে জানলাম, নইলে আমিই প্রস্তাবটা করতাম। আসলে, লোকে বাঁদরের উপদ্রবে বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তারই প্রতিকারকল্পে বদ্রীনাথের শরণাপন্ন হওয়া। সে যাইহোক, আমি আগে জানলে তাদের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারতাম ·

মন্দির দেহলীতে কোমর বন্ধ না বেঁধে প্রবেশ নিষেধ। আমি আমার প্যান্টের বেল্ট দেখিয়ে বললাম— এই তো রয়েছে কোমরবন্ধ। উঁহুঁ তা চলবে না। দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন। তাঁর কাছে অতিথি অভ্যাগত নেই। আমার কোটের ওপরে একটা শালুর কাপড় উঁচু করে বেঁধে দেওয়া হলো। আমি প্রবেশাধিকার পেলাম। এরপর আমায় ভেতরে বসিয়ে মন্দির তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। নেগী শ্যামসুন্দর দাস আর নেগী বুজুক সেন মন্দিরের 'মাথ্‌স্' বা প্রধান ব্যবস্থাপক। পূজারীর নাম জোয়ান দাস। তিনজন গ্রোক্‌স যাঁদের মুখ দিয়ে বদ্রীনাথ কথা বলেন তাঁরা হলেন, পুরনজিৎ (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), পালুরাম আর সুন্দর সেন। কারদার—গঙ্গারাম আর গোকর্ণদাস। কৈতস বা কায়স্থ হরিনামদাস, নেগী বদ্রীবর, শামাসুখ, দেবলাল, কিষণগোপাল এরাও কারদার। ফাল্গুন মাসে বদ্রীনাথের বিশেষ মহোৎসব হয়। সে সময় দু'জন বিশেষ কারদার নিযুক্ত হয়। তাদের বলা হয় চোখেস্। তারা বিচিত্র পোশাক পরে। পায়ে তিব্বতের ছাগলের চামড়ার জুতো, পরণে সিরমৌরের চুড়িদার পায়জামা, গায়ে সাদা পশমের গাঢ়োয়ালি চোগা। মাথায় দিল্লীর জাতাদার পাগড়ি। এখানে এমনিতে পৈতে পরার রেওয়াজ নেই, কিন্তু এই কারদারেরা পরে। প্রশ্ন করে জানলাম, অভিষেকের সময়ে রাজা ধুতি পরেন, পাজামা নয়। চোখেস্‌রা পরের সময়ে

তিন দিন কাউকে শরীর স্পর্শ করতে দেয় না। তারপর কৈলাস (ভূয়ো-কৈলাস) থেকে আগত গঙ্গারঙধারায় স্নান করে গ্রামের ভেতর পা দেয়।

মানে বা কাম্‌রু (কাম্‌রুকেই কিন্নর ভাষায় মোনে বলে) আর সাঙলার সামনে বিস্তৃত উপত্যকা। উপত্যকার মুখ সামনে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীন যুগে এখানে একটা বিশাল ঝিল কিংবা গ্লেশিয়ার ছিল। তারপর সেই অবরুদ্ধ জলরাশি কোনো একদিন পাহাড় ভেঙে পথ করে নিয়েছিল। তবে ব্যাপারটি প্রাগৈতিহাসিক। মানুষের জন্মের অনেক আগের ঘটনা। মোনের লোকেরা কিন্তু অন্য কথা বলে। তারা বলে এখানে এক সময় একটা মস্ত দীঘি ছিল। লোকে তাদের বাড়ির ছাদ থেকে বালতি ফেলে সব জল তুলে নিত! তখন রাগ করে চাঁদ আর সূর্য তেজ দেখিয়ে পুকুরটাকে শুকিয়ে দিলেন।

দেবদেবী নিয়ে কিন্নরদের বেশ কিছু গল্প প্রচলিত আছে। বদ্রীনাথ বিষয়ে বলা হয়—তাঁরা তিন ভাই, বড় ভাই গেলেন গাড়োয়ালে, সেখানে গিয়ে শিব পার্বতীকে কৈলাসে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে জেঁকে বসলেন তপস্যা করতে। মেজো ভাই তেহরীর সাম্রাজ্য গড়লেন। আর ছোট ভাই রইলেন এখানে এই মোনেতে বদ্রীনাথ হয়ে।

কামরুর নিচে নদীর ধারে অনেক সমতলভূমি পড়ে আছে। অনায়াসেই এখানে একখানা বড়সড় বিমানবন্দর বানানো যেতে পারে। বড় বড় ক্ষেত, বেশীর ভাগই সরকারী। কামরু আর সাঙলার ক্ষেত দেখলে বোঝা যায় যে, দুটো ফসল হয়। কিন্তু নিচের ক্ষেতগুলোর অবস্থা অন্য রকম। সেগুলোর জমা-বরফ গলতে বড়ই দেরী হয়।

সাঙলাতে দুটা জিনিস নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে দেখলাম। এক, তেহরী থেকে একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী এসেছে। সবাই উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের জন্মকুণ্ডলী নিয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টা কৌতুক উদ্দীপনার কিছু নয়। বরং দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ব্যাপার বলেই মনে হলো।

কিন্নর এলাকায় ঘরে ঘরে বন্দুক রাখার রেওয়াজ। কিন্তু শুনলাম, হালে বন্দুকের হিসেব নেওয়া হচ্ছে। সব বন্দুক না-কি থানায় জমা করে দিতে হবে। ব্যাপারটা গুরুতর বিবেচনার বিষয়। কিন্নর দেশের এই এলাকাগুলো ডাকাত উপদ্রুত অঞ্চল। তিব্বত সীমান্ত খুব কাছেই। সেখানে হানাদার তিব্বতী দস্যুরা দিনরাত খোলা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এইসব বিবেচনা করেই বিনা দ্বিধায় কিন্নরবাসীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। এখন সে অধিকার কেড়ে নিতে গেলে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ আছে বই কি। তাদের মনে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগা বিচিত্র নয় মোটেই। আর সত্যি বলতে কি, বিপদ যে-কোনো মুহূর্তেই আসতে পারে। কে তার দায়িত্ব নেবে?

আমি চীফ কমিশনার মেহতা সাহেবের সঙ্গে পরে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, কনৌরকে তাড়াতাড়ি করে নিরস্ত্র করার কোনো ব্যগ্রতা নেই তাঁদের। তবে ব্যাপারটা কি? থানার বিজ্ঞপ্তি আমারও নজরে পড়েছিল। মনে হয়, এ সব ছোট অফিসারদের বাড়াবাড়ি। সব জায়গায় এই ছোট অফিসারেরাই গোলোযোগ পাকায় দেখছি। তারা তাদের ইচ্ছেমতো অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন

অনুসারে হুকুম জারী করে দেয়। আর তাদের খেয়াল-খুশীর ফল ভোগ করে সাধারণ লোক আর সরকার।

রাজনৈতিক দিক দিয়েও কিন্নরদের হাতে বন্দুক থাকা দরকার। পাশেই তিব্বত—তিব্বতী ডাকাতরা যদি জানতে পারে যে এরা নিরস্ত্র তবে চড়াও হয়ে দখল করে নেবে এসব এলাকা। লুটতরাজ, মারপিট, খুন-জখমের বন্যা বয়ে যাবে। কাজেই নিরস্ত্রীকরণ তো নয়ই, বরং সরকারের আনুকূল্যে এসব অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বন্দুক দেবার বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

*　　　　*　　　　*

হিমাচল সরকার নিজের রাজ্যে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করেছেন। অথচ একজন ছোট অফিসার তাঁর এলাকায় ইস্তেহার দিয়ে ইংরেজী চালু রেখেছেন। অপরাধ? না, তাঁর কাজের চাপে হিন্দী শেখার অবসর নেই। তা তো হবেই! নিজে ব্রিজ খেলতে জানেন, ঘরে সুন্দরী শিক্ষিতা ব্রিজ' পারদর্শিণী স্ত্রী —তাঁর সময় কোথায় হিন্দী শেখবার?

যাত্রাশেষের পালা

ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে গোল মন্দিরে দেবী দর্শন করতে গেলাম। দেবীর মন্দিরের গায়েই বুদ্ধদেবের মন্দির। সেখানেও গেলাম। দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত আর মৌদগল্যায়ন সমভিব্যাহারে বিরাজ করছেন শাক্যমুনি—মৃন্ময় মূর্তিতে। মাটির ঢিপির প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। পুথি-পত্তর নিয়ে পড়লাম। এখানে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কপি দেখতে পেলাম। পুথিখানি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ড দুটি রয়েছে। প্রথমখানির হদিস মিলল না।

বাংলোর পাশেই স্কুল। স্কুলে চারটি ক্লাস। এই স্কুলও মোনে রৌলার তপস্যার ফল। মোট ছাত্র সংখ্যা তিরাশি। মাইল তিনেক পথ হেঁটে আসে ছাত্রেরা। বট্‌সেরী আর চান্‌সু গ্রামের বাসিন্দাই বেশী। হিমাচল প্রদেশে শিক্ষাপ্রসার সার্থক হবে তখনই, যখন চল্লিশ ঘর বসতিওয়ালা সব গ্রামেই অন্তত একটি করে প্রাথমিক স্কুল খোলা হবে।

এখন আমরা বস্‌পা নদীর কিনারা ধরে নিচের দিকে নামছি—অধোগতি মানুষের দ্রুতই হয়। কাজেই পা বেশ ঘন ঘন উঠছে পড়ছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। পুণ্যসাগরকে পেছনে ফেলে আমি এগিয়ে চললাম। বস্‌পার যে রমণীয় উপত্যকাটির বুকে আমরা হেঁটে চলেছি, সাঙলা পর্যন্ত এমন কি সাঙলা ছাড়িয়েও কোথাও তার সৌন্দর্য কম হয়নি। সাড়ে আটটায় আমরা রওনা হয়েছি আর এখন বেলা প্রায় দুটো। বস্‌পার উপত্যকা ছাড়িয়ে, শোঙঠঙে যাবার সেতুকে পাশে ফেলে আমরা শতদ্রুর উপত্যকায় এসে পড়লাম। আমরা এখন ৫৫০০ ফিটের ওপর, তবুও গরমে রীতিমতো কষ্ট পাচ্ছি—শেষের ক'মাইল তো প্রায় অসহ্য।

ঠিক বেলা দুটোর সময় কিলবা পৌঁছালাম। কিলবায় বন-বিভাগের বাংলো আছে। বাংলোটি হালেই তৈরি। নতুন বাংলো—ভেতরে বাইরে ঝকঝক তক্‌তক করছে।

চৌকিদারটিও বেশ ছিমছাম। বাংলোর বাগানের সাদা আঙুর প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কালো আঙুর এখনও পাকেনি। পাকলেও 'রোগী'র মতো অমন উঁচু জাতের হবে না।

ক্ষিধে পেয়েছে বেশ। পুণ্যসাগরের এখনও দেখা নেই। কখন এসে পৌছবে, কে জানে। শুনলাম, এ গ্রামে দেবমন্দির ছাড়া একটা বুদ্ধ মন্দিরও আছে। পুরোহিত বললে, 'বুদ্ধ মন্দির খুবই নতুন। পুরনো জিনিস কিছু নেই।' অরও শুনলাম 'চুনীলাল ডাক্তার' কাব্যগাথার নায়িকা জঙমোপোতী এই কিলবাতেই থাকে, আর সে না-কি বয়সে এখনও তরুণী। তা হোক—ও সব গানের ব্যাপারে আর বেশী উৎসাহ দেখাতে আমি প্রস্তুত নই। ঐ গানের রচয়িত্রীর মতো আমি জঙমোপোতীকে দোষ দিই না, ডাক্তারকেও নয়। আমার মনে হয় এ সব হৃদয়ঘটিতে কাণ্ডের জন্যে ঐ তরুণ বয়সের তারুণ্যটাই দায়ী।

চুনীলাল ডাক্তার পাঞ্জাবের লোক। ১৯৪০-৪৪ সাল নাগাদ তাঁকে বন বিভাগের তরফ থেকে কিলবার হাসপাতালে নিয়োগ করা হয়। এই প্রেম-গাথাটি সেই সময়কার রচনা। গীতিকাব্যের মর্মার্থ—কিলবার হাসপাতালটি যেন একটি সুন্দর বাড়ি। সেই হাসপাতালে এসেছেন নতুন ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুর নাম চুনীলাল। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার জাহর সিং তাঁর প্রাণের বন্ধু। থঙগরের মেয়ে সুন্দরী ভদ্রাবতী ('বনঠিন জঙমোপোতী') হলো ডাক্তারের প্রণয়িনী। সে প্রায়ই তার সখী কৃষ্ণভক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কিলবার উঁচু পাহাড়ে প্রেমাভিসারে আসত। সেখানে তার সঙ্গে মিলন হতো চুনীলালের। একবার ভদ্রাবতী কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে চুনীলালকে চিঠি দিলো। চিঠি পেয়েই চুনীলাল ছুটল। অনেক যত্নে, অনেক সেবা শুশ্রূষা করে, হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করে চুনীলাল তো ভদ্রাবতীকে সারিয়ে তুলল। ভালো হয়ে উঠে ভদ্রাবতী চুনীলালকে প্রতিশ্রুতি দিলে যে, এই উপকারের ঋণ সে শোধ করবে তার জীবন দিয়ে। বললে, 'আমি শুধু এ জন্মেই তোমার নই, জন্মজন্মান্তরেও তোমার...'

জন্মান্তর তো অনেক দূরের কথা। এ জন্মেই ভদ্রাবতী সত্যপালন করল না। কিছুদিনের মধ্যেই কুঠিদারের ঘরের বউ সে চুনীলালের প্রেমকে অস্বীকার করল। বলল, ঐ সমতলের বিদেশীর সঙ্গে কোন দুঃখে প্রেম করতে যাব আমি! চুনীলাল বললে, নারী চিরদিনই অবিশ্বাসিনী। আমার প্রেম হয়ত আজ আমার দেওয়া রূপোর চিরুনি আর সোনার কণ্ঠহারের মতোই মিথ্যে হয়ে গেছে, কেন না কোনো প্রশান তো নেই। কিন্তু তুমি যে হীরের আংটিটা পরে শ্বশুরবাড়ি চলেছ ওটাও যে আমারই দেওয়া!

পরের দিন, ১৩ই আগস্ট সকালবেলায় প্রাতরাশ খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ ছোলটুতে পৌছালাম। এখানে ঘোল আর ফল দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সমাধা করে হাতে ডাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। সঙ্গে পুণ্যসাগর, কাজেই ঝোলা বইবার অসুবিধে নেই। ভারবাহকদের সঙ্গে কথা বলা আছে, এখান থেকে দু'মাইল দূরের চটি থেকে তারা মাল বইবে। তাদের আসতে এখনও দেরী।

শতদ্রুর ওপরের লোহার সেতু পার হয়ে আমরা পৌগ্র হয়ে সরাহনের দিকে পা বাড়ালাম। পথে কিছুদূর গিয়ে শুনলাম একটু আগে এই পথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে

গেছে। একটি কুমারী তরুণী মেয়েকে জনকয়েক লোক এই দিন দুপুরে পথ থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েটির চীৎকার অনেকেই শুনতে পেয়েছে। শুনে আমাদের যতই রাগ হোক বা আশ্চর্য লাগুক এ বিধান স্বয়ং ভগবান মনু দিয়ে গেছেন। তিনি আর সব বিবাহের মতো এই জাতীয় রাক্ষস বিবাহ বা বলপূর্বক ধৃতা কন্যার বিবাহকেও বৈধ বলে স্বীকার করে গেছেন। আজ এই মাত্র যারা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেলো, তারা মেয়ের মা-বাবার হাতে কিছু টাকা-পয়সা গুজে দিতেও কার্পণ্য করবে না। বাপ-মা'র সম্মতি আদায়ের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট, বাকি থাকে মেয়ের নিজের সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্ন। তা ওটা হলো আমার মতো নাগরিক সভ্যতা-শেখা লোকের সমস্যা! মনু-ভগবান তো তাঁর সংহিতায় একে স্বীকার করেন না। কিন্তু মনু যাই করুন বা না করুন, সত্যি-সত্যিই আজকের দিনে এ সব মেনে নেওয়া চলে না। রাক্ষস বিবাহকারীকে নারী অপহরণের দায়ে বছর দশেক শ্রীঘরের হাওয়া খাইয়ে দিলেই, দেখতে দেখতে রাক্ষস বিবাহের শখ মিটে যাবে।

সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই আমরা সরাহন পৌছে গেলাম। আজ কিন্নর দেশের সীমা (মন্যোটি ধারা) পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষা প্রবল বেগে শুরু হয়ে গেলো। অগত্যা, অনুমতিপত্র না থাকা সত্ত্বেও সরাহনের ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিতে হলো।

আজ ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট। ঠিক এক বছর হলো ভারত ইংরেজ শাসন-মুক্ত হয়েছে। ১৫ই আগস্ট আমাদের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় দিন। গত এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ আজ আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন ছায়াছবির মতো ভেসে যাচ্ছে। এই এক বছরে আমাদের দেশ যে অনেক সুসংগঠিত, অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস নেতৃত্বের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা যতটা বলা যায় দেশের নব রূপায়ণে এই সরকারের ব্যর্থতার কথা ততটাই বলা চলে।

এ সব বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মনে পড়ছে লাদাখের কথা। ঐ অঞ্চলে, সিন্ধু উপত্যকা, নুব্রা উপত্যকা এবং জাংস্কর উপত্যকায় সংখ্যালঘু নিরীহ বৌদ্ধদের ওপর পাকিস্তানী ধর্মান্ধের দল অকথ্য অত্যাচার করে চলেছে। বহু গৃহস্থ, বহু ভিক্ষু তাদের তলোয়ারের শিকার হয়েছে। একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনের সংরক্ষণাগার ছিল আলচী আর সুম্‌রার বিহার দুটি। তার যে কি হাল হয়েছে তাও জানা যায় না। মানুষ মরলে, তার জায়গায় নবজাত মানুষ আসতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির এই অপমৃত্যুর কি দিয়ে ক্ষতিপূরণ হবে? চিন্তার স্রোত গড়িয়ে চলে কুলু-লাহুল-লাদাখের পথে। লাদাখ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করতে হলে কুলু-লাদাখের রাস্তা দিয়েই ফৌজ পাঠাতে হবে। এ রাস্তা পাঠানকোট, যোগেন্দ্রনগর হয়ে চলে গেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে এই রাস্তাটা সঙ্কটমুক্ত তো থাকবেই না বরং কাশ্মীর পাঠানকোট অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। কাশ্মীর হয়ত বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়তে পারে।

এইসব নানা কথা, নানা চিন্তা আমার মনে ভিড় করে এল আজ এই ১৫ই আগস্টের পুণ্য দিনে। আজ যে আমাদের হিসাব-নিকাশের দিন, আত্মানুসন্ধানের দিন।

আজ সারা ভারতে খুব ধুমধাম হচ্ছে। কিন্তু এখানের পাহাড়ে, উৎসব আয়োজনের চিহ্নমাত্র নেই। সমস্ত নিস্তব্ধ—বৈচিত্র্যহীন। এর জন্যে এদের দোষ দেওয়া যায় না। এক বছর হলো স্বাধীনতা এসেছে দেশে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ কি কোথাও দেখা গেছে? নজরে পড়ছে কোনো পরিবর্তন?—পড়েনি। কোনো রকম যদি চেষ্টা হতো, লোকে যদি উপলব্ধি করতে পারত স্বাধীনতার কথা, তবে দেখতেন উৎসব আমোদে মশগুল হয়ে যেত পাহাড়ী মানুষেরা—এদের মতো আমোদপ্রিয়, উৎসব-প্রেমিক লোক হয় না।

পরদিন সোজা ভীমাকালীর মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। বাইরের ফটকের ওপর এক জায়গায় খোদাই করে লেখা রয়েছে সংবৎ ১৮৭১। ফটক পার হয়ে আমরা ভেতরের উঠোনে পা দিলাম; উঠোনের চারপাশে গোবর ছড়িয়ে রয়েছে। বাইরের বায়োয়ারী গরুর যে তীর্থস্থল এটা বোঝা গেলো।

ভীমাকালী বেশ ঐশ্বর্যশালিনী। রামপুর আর চিনী তহশীল থেকে যত রাজস্ব আদায় হয়, তার ওপর একটা নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ আছে ভীমাকালীর নামে। টাকায় চার আনার মতো ভাগ তাঁর। জানি না নেহেরু সরকারও এই প্রথা চালিয়ে যাবেন কি-না। ধর্মনিরপেক্ষ কোনো শাসন-ব্যবস্থায় এই জাতীয় ধর্মীয় উৎপীড়ন কি চলতে দেওয়া উচিত?

মন্দির ঘোরা-ফেরা সাঙ্গ করে আমি গেলাম বিস্ট সাহেবের খাস কামরায়। ইচ্ছে, কিছু পুরনো কাগজপত্র, পুঁথি-পত্তর দেখব। কিন্তু দেখে শুনে মনে হলো তাঁর কাছে বড় জোর দশ-বিশ বছরের পুরনো কাগজপত্র, নথি, পড়ে আছে। তার বেশী প্রাচীন কিছু আশা করা বৃথা।

আমি তাঁকে বললাম—মন্দিরের আদিযুগের নথিপত্র দেখতে চাই।

বিস্ট সহজ সুরে জবাব দিলে—সে সব তো পুড়ে গেছে।

—পুড়ে গেছে! মন্দিরে তো কখনও আগুন লাগেনি, পুড়ল কি করে?

—গত চোত মাসে সরদার সাহেব সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

—সরদার সাহেব পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন! বলেন কি?

—হ্যাঁ। যখন তিনি কাগজ পোড়ান তখন আমি ছিলাম আর তহশীলদার দেওকীনন্দও ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শনকে কোনো শিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক যে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে, এ কি বিশ্বাস হয়? মেহতাজীও সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারবেন না, কিন্তু কাগজপত্র যে নেই এও তো সত্যি। আর এই কাগজ পোড়ানোর কথাটা সরাহনের মুখে মুখে ফেরে। একশো চল্লিশ বছর আগে এমনি নির্মম বর্বরতা করেছিল রামপুরের গোর্খরা। এটা দ্বিতীয় ঘটনা, দেশের মূল্যবান ঐতিহ্যের ওপর এই অত্যাচারের কঠোরতম দণ্ড হওয়া উচিত।

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে শুনলাম এস. ডি. ও. সায়েব এসেছেন। তিনি তাঁর কামরায় বিশ্রাম করছেন। আমি গেলাম আমার কামরায়। তিনটে চারটে নাগাদ বাইরে

বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম, এস. ডি. ও. প্রেমরাজ আর তাঁর স্ত্রী বারান্দায় বসে তাস খেলছেন। খেলায় বিঘ্ন ঘটাবার আমার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু শিষ্টাচার বলেও একটা জিনিস আছে। আমি কাছে গিয়ে নমস্কার জানালাম। তিনি ফিরেও দেখলেন না—খেলা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। তবু ভালো যে, আমার এই অন্যায় আচরণে রেগে গিয়ে ধমকে ওঠেননি। হাকিম সায়েবের মুখের দিকে চেয়ে দেখি—যেন আমাবস্যা নেমেছে।

প্রেমরাজজী আমায় চিনতেন না। কিন্তু আমার পরিচয় তিনি ভালো রকমই পেয়েছেন। রামপুর বুশহরের সমস্ত রাজকর্মচারীর কাছেই আমার নাম-পরিচয় তিনি শুনেছেন। তবু তিনি যে ব্যবহার করলেন তাতে আমি বিন্দুমাত্র অপমানিত বোধ করিনি। আমার শুধু আশ্চর্য লাগল এই ভেবে যে, চেনাই হোক আর অচেনাই হোক যে লোকটা নমস্কার করেছে, তাকে প্রতিনমস্কার করাটা তো সাধারণ ভদ্রতা। এটুকু শিষ্টাচারবোধের অভাব হলো কেন তাঁর? আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম অনেক পরে। যখন শুনলাম প্রেমরাজজীর শরীরে রাজামাত্য বংশের নীল রক্ত বইছে, তখনই বুঝেছিলাম। চম্বার মহারাজার মুখ্যমন্ত্রীর পৌত্র, কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর জামাইয়ের কাছে আর বেশী কি আশা করা যায়!

এখন বুঝেছি চিনী তহশীলে সমস্ত সরকারী কাগজপত্র ইংরেজীতে লেখবার হুকুমটা এই হাকিমেরই দেওয়া। তিনি তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। হিন্দীকে সরকারী ভাষা ঘোষণা করে হিমাচল সরকার দারুণ পাপ করেছেন!

১৭ই আগস্ট রামপুর রওনা হলাম। গত তিনমাস পুণ্যসাগর আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সে থাকায় আমি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত ছিলাম। খাওয়া দাওয়া হিসেব-নিকেশ সব কিছু তার জিম্মায় দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। আমার শরীরের যত্ন নেওয়ার ভারও ছিল তার। প্রাইমারী স্কুলের মিডিল পাস করা টিচার এটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। ধর্ম আর আদর্শের সুসমন্বয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনটা মহিমান্বিত। তাদের সামাজিক প্রথানুযায়ী যৌথবিবাহ তাকেও করতে হয়েছিল। কিন্তু তার সাধুসন্তসুলভ চালচলন আর ভবঘুরেবৃত্তি দেখে বউ পালিয়ে গেলো। তখন ছোটভাই আলাদা বিয়ে করে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে বললে। পুণ্যসাগর বললে, 'ভাগবাঁটোয়ারা দরকার কি? আমি পরিব্রাজক, সম্পত্তি তোমার একারই থাক— আমার কিছু দরকার নেই।' সেই থেকে ঘর ছেড়েছে পুণ্যসাগর। তার মায়ের খুব অসুখ তাই অনেক দিন পরে আজ মাকে দেখতে বাড়ি যাবে। নইলে আরও কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবার তার ইচ্ছে ছিল। আজ আমার বন্ধু বিচ্ছেদের পালা। একজন সরল, সহৃদয়, অন্তরঙ্গ সুহৃদকে আজ ছাড়তে হচ্ছে।

সরাহন যখন ছাড়লাম তখন বেলা ন'টা। রামপুর এখান থেকে একুশ মাইল দূরে। রাস্তা কোথাও কোথাও ভেঙেছে। তবে খুব একটা খারাপ অবস্থা হয়নি। মঙলাউখণ্ড পর্যন্ত সামনে উৎরাই। আসবার সময়ে এইটাই ছিল চড়াই। ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের নাম-গোত্র শ্বরণ করিয়ে দিয়েছিল।

সামনেই মঁঝোলী গ্রাম। জনা দু-তিন গুজর আসছিল রামপুরের দিক থেকে। মোষ চরাতে ওপরের কাণ্ডায় গিয়েছিল। কথাবার্তা হলো। ওরা অনেক দুঃখ জানাল। বলল,

'গত বছর স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয়েছিল। তাদের বক্তব্য, ভালো চাও তো পাকিস্তানে চলে যাও, নইলে প্রাণে মরবে। তা আমরা বলি, পাকিস্তান আমরা চিনি না। মারতে হয় মারো। এখানে বসেই মরব। এখনও এই কাণ্ডায় মোষ চরানো নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। ওরা শাসায়, চোখরাঙায়। আমাদের কি উপায় হবে বাবুজী? আবার মারধর করবে না তো?

আমি তাদের অভয় দিয়ে বললাম, 'আমাদের সরকার হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বরদাস্ত করবার পাত্র নয়। তোমাদের দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই।' তাদের ঘর-দোর বলতে কিছু আছে, না ঘুরে ঘুরেই বেড়ায় জিজ্ঞেস করতে বললে, 'ঘর আছে। শীত পড়লে নদীর ধারের গ্রামে ঝোপড়ীতে (পাতা-লতার কুটির) থাকে।'

আমি বললাম, 'তা'হলে তোমরা এক কাজ কর। যে গ্রামে তোমরা থাকো, সে গ্রামের পাটোয়ারীর কাছে নাম লিখিয়ে এস। যাতে তোমরা ভোট দেবার অধিকার পাও।' আরও বললাম যে রাজা-রাণীর রাজত্ব ঘুচেছে। এখন প্রজাদের রাজত্ব। তোমরা তোমাদের মুখপাত্র নির্বাচন করতে পার।

গুজর দলটিতে দু'জন পুরুষ আর একজন যুবতী ছিল। সকলেনই শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, সুসমন্বিত পেশীতে সুঠাম দীঘল গঠন, তীক্ষ্ণ নাসা। আমি ভাবছিলাম এই গুজরদেরই পূর্বপুরুষ সেই শক যাযাবরেরা। যারা আজ থেকে ২১০০ বছর আগে ভারতে এসেছিল। তাদের দল-প্রধানেরা ভারতে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছে। এমনি অনেক জাঠ-গুজর পরিবার রাজপুত নাম নিয়ে সমতলে বসবাস করছে। তাদেরই কোনো কোনো শাখা এই দলটির মতো পাহাড়ে পর্বতে পশুচারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শকরা যখন প্রথমে ভারবর্ষে বসবাস করতে থাকে ভারতীয় ধর্মকেই তারা গ্রহণ করেছিল। পরে সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম-ধর্ম নেয়। সেই সুযোগ আজ দুর্যোগ হয়ে দেখা দিয়েছে। আগে পাহাড়ে জনসংখ্যা ছিল কম। কাণ্ডার (পাহাড়ের মাথার দিক) খবর নিয়ে কেউ সেকালে মাথা ঘামাত না। এখন মানুষ বেড়েছে, কিন্তু মাটি এক আঙুলও বাড়েনি। কাজেই কাণ্ডারচারী গুজরেরা এখন অন্যান্য পাহাড়ীদের চক্ষুশূল হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিভেদ আসলে একটা অজুহাত। গুজরদের প্রকৃত সমস্যাটা হলো আর্থিক।

বিকেল পাঁচটায় রামপুর পৌঁছে গেলাম। পথে এক জায়গায় মালবাহকদের জন্যে একটু দাঁড়াতে হয়েছিল। এ ছাড়া কোনো বিরতি বা ব্যাঘাত ঘটেনি আমার পথ-চলার ছন্দে। যখন যাই তখন এ পথে গরমে কষ্ট পেয়েছিলাম। আজ ফেরার পথে দেখছি বর্ষা তার দেহে যৌবন-সম্ভার সাজিয়ে বসে আছে। কিন্তু এখন যে আমার ফেরার তাড়া!

রামপুরের ডাকবাংলো আর গেস্ট হাউস দুটোই শহরের বাইরে, বেশ খানিক দূরে। আমার এ বারে রামপুরে আসার উদ্দেশ্য কিছু কাজ করা, নেহাত নিভৃত-বাসের বাসনায় আসা নয়। তাই পণ্ডিত দৌলতরামকে আগেভাগে চিঠি দিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখতে লিখেছিলাম। তিনি শহরের ঠিক মাঝখানে রেজ্ঞার্স কোয়াটারে আমার বাসা ঠিক করেছিলেন। খবর পেয়ে বিদ্যাধর তর্কালঙ্কারজী এসে আমায় গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

ইতিমধ্যে কাগজ আর চিঠি এসে স্তূপাকার হয়ে জমেছিল। কুশল বিনিময়, ভোজনপর্ব ইত্যাদি সমাধা করে বসে গেলাম সেইসব নিয়ে। বন্ধুরা চলে গেছেন, নিরিবিলিতে রাত্তিরে বসে সব কাগজপত্র শেষ করব ভাবলাম। কিন্তু রাতভোর জেগেও যে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে এমন ভরসা নেই। যাইহোক মাথার শিয়রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দুর্গা বলে কাজ আরম্ভ তো করে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই কানের-কাছে ভোঁ-ভোঁ করে মশককুলের উচ্চ বিলাপ শুরু হয়ে গেলো। সঙ্গে চাদর ছিল। তাই দিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে রইলাম। কিন্তু রামপুর গরম জায়গা। গরম চাদর চাপা দিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে নেয়ে একসা। এতেও রেহাই নেই—নিচে থেকে সহস্রমুখী জ্বালাময়ীর তীব্র আক্রমণ। চোরালণ্ঠন তুলে দেখি কাতারে কাতারে ছারপোকা। সেই ছারপোকার অক্ষৌহিণী আমায় চতুর্মুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত করে ফেলল। শোয়া যখন অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন বাতি জ্বেলে বাইরেই বসে রইলাম। বসে বসে অখণ্ড মনোযোগে পাঠক্রিয়া চালালাম। অভিজ্ঞ মন কানের কাছে এসে বারবার বলতে থাকল—আর কেন, এখানকার পাট কাল সকালেই ওঠাও। আলাপ আলোচনা করেও এইটুকু বুঝেছিলাম যে, রামপুরে থেকে কাজের জিনিস পাবার আশা বিশেষ নেই।

পরদিন সকালে পণ্ডিত দৌলতরামকে আমার সঙ্কল্পের কথা শোনালাম, তিনি তো হেসেই অস্থির। ভাবখানা—আপনি লোকটা তো নিতান্ত কাপুরুষ দেখছি। ছারপোকার ভয়ে কেউ দেশ ছেড়ে পালায়! তা আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি যে, আমি একবার কেন একশোবার কাপুরুষ! ছারপোকা, মশা আর পিসু এই ত্রিমূর্তির কাছে বীরত্ব দেখাবার সাহস আমার নেই। হাসি থামিয়ে দৌলতরাম বললেন, 'এখন ছুটি যাচ্ছে। আপনি স্বচ্ছন্দে স্কুলে শুতে পারেন। হাওয়া ওখানে খুব কাজেই মশা তো কামড়াবেই না আর ছারপোকার নামমাত্র নেই স্কুলে।'

আমার জলখাওয়া শেষ হতে না হতেই আমার মালপত্তর সব স্কুল-বাড়িতে চলে গেলো। তারপর আমি গেল্যম বিদ্যাধরজীর সঙ্গে বাজারের দিকে। আগে এখান থেকে খান দুই পশমী চাদর কিনেছি। এ বারেও একখানা সাদা রঙের পশমী চাদর কেনার ইচ্ছে। এ অঞ্চলে রামপুরই পশমী চাদর বুনোনির প্রধান কেন্দ্র। চাদর বেশ মোলায়েম এবং সূক্ষ্ম কাজেরও অভাব নেই। কিন্তু কাশ্মীরী কাজের সৌন্দর্য বা কারুকার্য এতে কোথায়? প্রায় পঞ্চাশখানা চাদর বাছাই করলাম কিন্তু একটাও মনের মতো হলো না। পরের দিন বিদ্যাধরজী আরও খানকয়েক চাদর দেখালেন। শেষে পঁচাশি টাকা দিয়ে একখানা মোটামুটি চাদর নেওয়া হলো।

ছারপোকা আর মশার উপদ্রব থেকে রেহাই পেয়ে আমি লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা, কথাবার্তা বলবার সুযোগ পেলাম বেশী। শুনে খুশী হলাম যে, রাজা পেন্সন পেয়েছেন আর রাণী গরম কাটাতে সরাহন চলে গেছেন। বিধবা রাজবধূ সরকারের কাছে আরজি করেছিলেন যে অত কম টাকায় তাঁর চলে না। তাঁকে দেওয়া হচ্ছিল মাসে হাজার টাকা। তাঁর দেওয়া দরখাস্ত পাবার পরে সরকার পুনর্বিবেচনা করে দেখলেন যে, একলা মেয়েমানুষের অত টাকার প্রয়োজন নেই, এবং এক কলমের

খোঁয়ায় হাজারকে আটশো করে দেওয়া হলো। তাই নিয়ে রাণী আবার মামলা-মকদ্দমা করবার তোড়জোড় করছেন। বেচারী মহিলার জন্যে দুঃখ হয়, জানেন না, প্রজার রাজত্বে রাজার ভোগবিলাসের দুঃখ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। মিথ্যে উকীল-মোক্তার করে টাকার শ্রাদ্ধ করছেন।

২১শে আগস্ট রামপুর ছাড়লাম। ঘোড়ার ব্যবস্থাও করা হলো। ন'টা নাগাদ নওগড়ীর লালা খুশিরামের সঙ্গে পথে দেখা, তিনিও সঙ্গী হলেন। নওগড়ীতে লালা খুশিরাম নিজের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে একটি সুন্দর শিল্পকর্ম করেছেন যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বোঝা যায়, ইচ্ছে থাকলে, অধ্যবসায় থাকলে এই দুর্গম হিমালয়ের বুকেও অল্প খরচে সার্থকভাবে শিল্পকর্ম করা সম্ভব।

খুশিরাম মামুলি হিন্দী-উর্দু জানা লোক। খুব যে একটা কইয়ে বলিয়ে লোক তাও নয়। লালা খুশিরামের বাবা সামান্য ঠিকাদার ছিলেন। যখন মারা গেলেন, তখন ছেলের জন্যে রেখে গেলেন শুধু কিছু দেনা। খুশিরাম যখন রাজার কাছে এক টুকরো জমি ইজারা নিলেন, তখন সে জমিতে ঘাস জন্মাত না, আজ সেখানে সবুজ ক্ষেত, বাগান। পাশেই একটা ছোট্ট সুন্দর কারখানা চলছে। ভাবলে মনে হবে বুঝি মায়া। কিন্তু এর পেছনে ছিল একজনের সুতীব্র সাধনা। দিনের পর দিন পাথর ভেঙে হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। তারপর, পাশের খদ্দ থেকে অনেক কসরৎ করে জল নিয়ে এসে, ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তারপর তা থেকে হলো পান্‌চাক্কি। পরে ধীরে ধীরে সেই অবরুদ্ধ জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ তৈরির আয়োজন করা হলো! একদা পতিত সেই পাহাড়ী পাথুরে জমিতে আজ একদিকে শস্য-শ্যামল ক্ষেত আরেকদিকে চলছে দুটি আটা পেষানোর চাকি। তেল কল আর চাল কলের মেশিনগুলোও যথারীতি কাজ করে চলেছে। কাঠ চেরাইয়ের মেসিনও লাগানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একশো দশ ভোল্টের ডায়নামো বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, যদিও বিদ্যুতের ব্যবহার বিশেষ ব্যাপক এখনো হয়নি। বাতি জ্বালানো আর রেডিও-র ব্যাটারি চার্জ করা ছাড়া আর কোনো বৃহত্তর উপযোগ এ যাবৎ সাধিত হয়নি।

লালা খুশিরামের ক্ষেত-খামার আর কারখানা দেখা শেষ করে, পংগী ব্রহ্মাচারীর দেওয়া লম্বা লাঠিগাছা হাতে নিয়ে পথে পা দিলাম। নওগড়ী থেকে চার মাইলের পথ দত্তনগরে পৌঁছালাম—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।

দত্তনগরের দোকানগুলোয় মাছিরাই হলো বড় খদ্দের। ঐতিহাসিক নিদর্শন বলতে এখানে যা কিছু আছে তা দেবীর মন্দির ও গোটাকয়েক পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি। সম্ভবত মাটি খুঁড়লে আরও কিছু পাওয়া যেতে পারে।

বর্ষা মাথায় করেই আরও চার মাইল রাস্তা পাড়ি দিলাম। এ জায়গাটার নাম নিরত। নিরতের সূর্য মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর বলে প্রচলিত। কথাটায় সন্দেহ করবার কিছু আছে বলে মনে হলো না। মন্দিরটি বিশেষ বড় না হলেও সুন্দর। সমস্তটা পাথরের তৈরি—গুপ্তযুগের শিখদার মন্দিরের আকৃতি। মন্দির চত্বরে একটা বহু প্রাচীন বটগাছ আছে। আমি তার নাম দিলাম অক্ষয়বট। অক্ষয়বটের নিচে কয়েকটা পুরনো ভাঙা মূর্তি আমাকে আকৃষ্ট করল। একটা মূর্তি লম্বোদর গজাননের। তার পাশেই

একটা অতি রমণীয় দ্বিভুজ-মূর্তি। আর একদিকে একজোড়া বুটজুতো পরা সূর্যদেবের বিগ্রহ। তার দু-হাতে সূর্যমুখী ফুল। হিন্দুরা নিজেদের ঘরের ভেতর জুতো পায়ে দেয় না, তাদের দেবতা কি হিসেবে বুট পায়ে দিয়ে মন্দিরে গিয়ে বসে! কথাটা নিয়ে মন্দিরের পূজারীও দেখলাম দেখলাম বেশ খুঁত-খুঁত করছে। ব্যাপারটা যে তার ভালো লাগছে না, এটাও বুঝলাম। আমার হাসি পেল। বেচারা সরল সাদাসিধে পাহাড়ী ব্রাহ্মণ। কি করে জানবে যে, এ দেবতা আদৌ হিন্দুদের সূর্যদেবতার বিগ্রহ নয়। এও শকদের আমদানি। যেমন বহু শক কালে হিন্দু হয়ে গেছে, তেমনি শকদের এই উপাস্য দেবতাও ক্রমে হিন্দু দেবতা সূর্যদেবে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। বেচারা গ্রাম্য ধর্মভীরু পুরোহিতকে সেই জ্ঞানের কথা বলে, তার মধুর ভুলটুকু ভাঙিয়ে দিয়ে কি লাভ! আবার পথ চলা। একটা বিরাট চড়াই অতিক্রম করে যখন ঠানদার পৌছালাম তখন সাতটা বেজে গেছে। ঠিক করলাম, ঠানদারে রাত না কাটিয়ে কোটগড়ে ভগবান সিংহের বাসায় যাওয়া যাক। যত সহজে কথাটা বললাম, ব্যাপারটা মোটেই অত সুবিধের নয়। সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। আড়াই মাইল পাহাড়ী রাস্তা। একটু এদিক ওদিক হলেই পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। তবুও সাহসে বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ মনে হচ্ছে আমি এতদিন ধরে ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করছিলাম আর এ বারে ঘরে ফেরার পালা এসেছে। ডাক্তার ভাগবান সিং আর তাঁর সহধর্মিণী যেভাবে আমায় আপ্যায়ন করলেন, তাইতেই যেন গোটা যাত্রার রূপটাই বদলে গেলো। এ পর্যন্ত এমন সব জায়গায় কাটিয়েছে, যেখানে পকেটের পয়সা পকেটেই থেকে যায়, কোনো কাজে লাগে না। এখানে ঠানাদারে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সব সরঞ্জামই হাতের কাছে মজুত। মোটরবাস বর্ষার জন্যে কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখনও নিয়মিত চলাচল আরম্ভ হয়নি। আগামি দু-চার দিনের মধ্যেই হবে। কাছেই লোকালয়ের কোলাহল আমার মনের কোণে ঘন্টাধ্বনি করছে। কাজেই পার্বত্য প্রশান্তি আপাতত বিঘ্নিত।

ভাগবান সিং ডাক্তার মানুষ। যদিও আমার প্রস্রাবে আপাতত চিনি পাওয়া যাচ্ছে না, তবুও আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। সাবধানেই আছি আর কান পেতে দিন গুণছি—কবে যে সিমলাগামী বাসের হর্ন শুনব।

ফার গ্রোভ

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যানন্দ স্টোক খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে কোটগড়ে আসেন। স্টোক জন্মসূত্রে আমেরিকান। কার্যত পুরোপুরি ভারতীয়ই হয়ে গেয়েছিলেন। ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দীর্ঘ সাত বছর ধরে গুহায় বসে তপস্যা করেন। কোটগড় থেকে ঠানদার যাবার পথে একটা বড় খদ পড়ে। সেই খদের ধারে সড়কের নিচে একটা গুহা আজও দেখা যায়। এটাই স্টোকের সাধনাস্থল। গুহাবাস ত্যাগ করার পর স্টোক এক পাহাড়ী তরুণীকে বিয়ে করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই সময়ে ভারতের বেদ-উপনিষদ তাঁকে আকৃষ্ট করে

তিনি নিষ্ঠাভরে এই ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন আরম্ভ করে দেন। এসেছিলেন এখানকার লোককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে, উল্টো নিজেই হিন্দু হয়ে গেলেন।

স্টোকের প্রায় একশো বছর আগে গঙ্গোত্রীর হরশিল অঞ্চলে এসে বাসা বেঁধেছিলেন উইলসন। তাঁর আর স্টোকের উদ্দেশ্য একই ছিল বলা যায়। কিন্তু স্টোক যে সাফল্য লাভ করেছিলেন উইলসন সেটা পারেননি। এ ব্যাপারে স্টোকের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতেই হয়। উইলসনও স্থানীয় লোকের যথার্থই অনেক উপকার করেছিলেন।

এ অঞ্চলে আলু চাষের প্রচলন তিনিই করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গঙ্গার স্রোতের সাহায্যে ওপর থেকে নিচে কাঠ ভাসিয়ে নেবার কৌশল লোককে শেখান। উইলসনের ও পাহাড়ী সহধর্মিণী ছিল। তাঁর কাঠের তৈরি মজবুত গৃহদুর্গ আজ এত বছর পরেও অটুট আছে। হয়ত তাঁরও সাধ ছিল কালে তাঁর সন্তান সন্ততি ভারতীয় বলে পরিচিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি। তাঁর ছেলেপুলেরা পুরোপুরি ভারতীয় হতে পারেনি—হয়েছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। হরশিল ছেড়ে তারা চলে গেছে। হরশিলবাসী তাদের স্মৃতিকে মনের কোণেও স্থান দেয়নি।

স্টোক কিন্তু নিজেও যেমন অন্তরে-বাইরে ভারতবাসী হয়েছিলেন, তাঁর ছেলে-মেয়েদেরও তেমনি শুদ্ধ ভারতীয় করে যেতে পেরেছিলেন। এইখানেই তাঁর বিশেষ সার্থকতা।

১৯২১সাল। আমি তখন অসহযোগে আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক। কূর্গ থেকে বিহারের পথে চলেছি আন্দোলনে যোগ দিতে। পথে বোম্বাইয়ে এক জনসভায় শুভ্র খাদির ধুতি-কোর্তা শোভিত এক শ্বেতাঙ্গের বক্তৃতা শুনলাম। —তিনিই স্টোক। সারা ভারতের খাদি ও অসযোগে আন্দোলনের তখন যৌবন মধ্যাহ্ন। তার প্রখর দীপ্তিতে দাউদাউ করে জ্বলছিলেন অসহযোগে আন্দোলনের সৈনিক শ্বেতাঙ্গ স্টোক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ভারতীয় সৈনিক সংগ্রহ করতে গান্ধীজীর মতো স্টোকও প্রবল উৎসাহ নিয়ে নেমেছিলেন। তারপর, তার প্রতিক্রিয়া দেখে গান্ধীর অনুগামী এই তরুণ-সৈনিক তীব্র অসন্তোষ বহ্নিতে জ্বলে উঠলেন। শুধু বক্তৃতা নয় কেবল আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে বেড়ানো নয়, এই নব দীক্ষিত হিন্দুবীর, যুদ্ধ জয় উপলক্ষে স্থাপন করা ইংরেজদের বিজয়স্তম্ভ ভেঙে ফেলে সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু দেবমন্দির। সেই দেবালয়ের প্রকোষ্ঠে, কাষ্ঠফলকে উৎকীর্ণ উপনিষদ আর গীতার মূল সংস্কৃত বচন আজও দেখা যায়। এগুলিও স্টোকেরই কীর্তি। তাঁর ছেলে লালচান্দের মুখে শুনেছি, এইসব খোদাই কাজের অনেকগুলি তাঁর নিজের হাতে তৈরি। কোটগড়ের জনজীবনে সত্যানন্দ স্টোকের দান অপরিমেয়।

কোটগড়ের লোককে তিনি খৃশ্চান করেননি, বরং নিজেই খৃষ্টধর্ম ছেড়ে হিন্দুত্বে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্ত কোটগড়ের আমূল পরিবর্তন করে দিয়ে গেছেন স্টোক। কোটগড় আজ যে উৎকৃষ্ট জাতের আপেলের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেই আপেলের বেসাতি করেই কোটগড়ের জীবনযাত্রায় সাধারণ মান অনেক উন্নত হয়েছে। নিজের চেষ্টায় স্টোক এখানে হাইস্কুলে বসিয়েছিলেন। তাই শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলে ঐ শিক্ষা-নিকেতনটির ব্যাপক প্রভাব লক্ষিত হয়। উদার হৃদয়

অমায়িক স্টোক সাহেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোটগড়ের কিসে ভালো হবে সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। গরীব কিষাণ ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে নিজের জমি মহাজনকে বেচে দিতে বাধ্য হতো। স্টোক, সেই কিষাণদের বিনা সুদে ঋণ দিতেন। বলে দিতেন—খবরদার জমি বেচবে না। জমি থাকলে আখেরে কাজ দেবে। উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে স্টোক মারা গেছেন। কোটগড়ের লোক মনে করে, তাদের পিতৃ-বিয়োগ হয়েছে। তারা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করে।

খবর পেলাম রাস্তা আবার খারাপ হয়েছে। বাস চলাচলের আশা মিথ্যে। বৃষ্টির কামাই নেই। রাতদিন ধারাপ্রপাত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে সিমলা পৌছে যাব ভেবেছিলাম। তা সে গুড়ে কয়েক মণ বালি দেখছি। অতঃকিম? ডাক্তার ভগবান সিংহেরই শরণাপন্ন হলাম। আমার যাবার দিন যখন পিছিয়ে যাচ্ছে, তখন একটা বড়সড় দেখে বাড়ি দেখুন। ভালো করে ডেরাডাণ্ডা জমাই। যে কথা সেই কাজ। আগস্ট মাসটা পুরো এখানে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে একখানা বাড়ি ভাড়া করা হলো। ডাক্তার ভগবান সিংহ করিৎকর্মা পুরুষ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৭ সালে লাহুল উপত্যকায় কেলঙ এলাকায়। ভদ্রলোক বৌদ্ধ— জন্মসূত্রে নয়, সৎসংসর্গজনিত প্রেরণার ফলেই তিনি বৌদ্ধ হয়েছেন। কাজেই নিষ্ঠাটা আন্তরিক। নিজের নামের সঙ্গেও উনি 'বৌদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করেন। তাঁর স্ত্রী লাজদেবীও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিনী। তিনিও ডাক্তার। লাজদেবী আসলে তিব্বতী মেয়ে।

২৩শে আগস্ট, মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম শ্রীমতী সুভদ্র দেবী আমচন্দ্রের বাড়ি। তিনি এখানকার তহশীলদারণী, তাঁর বাড়িতেই প্রথমে আমার থাকার কথা হয়েছিল। কিন্তু আমি 'শাসন শব্দকোষ' বলে যে পূর্ণাঙ্গ তথ্যগ্রন্থখানি রচনা করবার বাসনা পোষণ করছিলাম, ওখানে বসে সেটা সম্ভব নয়। তাই ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।

সুভদ্র দেবীর বড় ছেলে প্রকাশচন্দ্র কৃষি বিজ্ঞানে এম. এস. সি. এবং উদ্যান-বিদ্যায় প্রকৃত পন্ডিত। কিন্তু দোষের মধ্যে একটু কেমন যেন জনমজুর ঘেঁষা। এমনিতে সুভদ্রা দেবীও শ্রমজীবীদের প্রতি অপ্রসন্ন নন। কখনও তাদের মজুরী কম দেন না, কিন্তু ছেলের যেন কেমন লাল-লাল কথা। ঐ একটি ব্যাপারে বড় মনোকষ্টে আছেন সুভদ্রা দেবী।

২৪শে আগস্ট পর্যন্ত যখন রাস্তার কোনো সুরাহা হলো না তখন বুঝলাম আর আশা নেই। ঠোগ ছাড়িয়ে এদিকে মোটরবাস আসতে পারবে না। বর্ষা সমানে হচ্ছে। একমাত্র সর্বগামী জীপ এ সব অবস্থায় কার্যকরী হতে পারত, কিন্তু জীপের আশা-ভরসা কম। রেলওয়ে এজেন্সি অফিস ঠানাদারে। অফিসার রমেশচন্দজীও কিছু বলতে পারলেন না যে, কবে নাগাদ জীপ পাওয়া যাবে। তিক্ত বিরক্ত হয়ে শেষটায় ঠিক করলাম—বর্ষা বৃষ্টি একটু কম পড়লেই খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নারকাণ্ডার পথে হাঁটা দেবো। তারপর দেখা যাবে।

২৫শে আগস্ট প্রাতে দ্বার খুলেই দেখলাম, আমার জীবন সফল করে সূর্য উঠেছে। মন যাব-যাব করে নেচে উঠল। কিন্তু জীপের লোভ দেখিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখলাম।

২৬শে আগস্ট দিনটাও ভালোয় ভালোয় কাটল। সে দিন বিকেল নাগাদ বেড়াতে বেড়াতে ঠানাদারে চলে গেলাম। রমেশচন্দ্রের কথায় আজও জীপের ব্যাপারে কোনো আলোর আভাস দেখতে পেলাম না। অগত্যা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্টোক ভবনে চলে গেলাম। লালচন্দজী (স্টোকের ছেলে) উদ্যানবিদ্, এ সময়ে ঘরে থাকবার কথা নয় তাঁর। যাইহোক আমাদের আসার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বাগান থেকে চলে এলেন। তারপর গল্পগজব চলল প্রায় আদ্ধেক রাত্তির পর্যন্ত। পার্বত্য জীবন দিয়েই বেশীরভাগ কথাবার্তা হলো। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে একবার মন্দির দর্শনও করে এলাম।

কোটগড়ের হর্টিকালচারিস্ট ভদ্রলোক চামচিকের উপদ্রবে অস্থির। লালচন্দজী বন্দুক দিয়ে কটাকে সাবাড় করেছেন কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল দেখা যায়নি। আমার মনে পড়ল কিন্নর দেশের বিভিন্ন জায়গায় বানরের উৎপাতের কথা। বললাম, 'একটা রীতিমতো নিধনযজ্ঞ হওয়ার উচিত।' লালচন্দজীরও সেই মত। বললেন, 'বাগান-মালিক সংঘের কাছে তিনি এই ধরনের একটা প্রস্তাব দিয়েছেন।'

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে স্থির করলাম কাল সকালে যদি জীপ না আসে তবে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়ব। সঙ্কল্প নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

২৭শে আগস্ট। যথারীতি আজও জীপ আসেনি। খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই করে নারকাণ্ডার পথের রওনা হলাম। এগারো মাইল রাস্তা। তার মধ্যে মাইল দু-আড়াই চড়াই ভাঙতে হবে। এক জায়গার দেখলাম সড়ক একেবারে ভেঙে পড়েছে। তবুও জীপের আসা-যাওয়া আটকাতে পারেনি। ভাঙা রাস্তার ওপরেই টায়ারের ছাপ দেখতে পেলাম।

নারকাণ্ডার মাইল চারেক আগেই বাঘী যাবার বড় রাস্তা দেখলাম। বারো মাইল লম্বা এই পাকা সড়কটি হালেই বানানো হয়েছে। আশা করা যায়, অল্প দিনেই মধ্যেই এ রাস্তায় খদ্‌রালা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। এই সড়কের ধারেই কুটির রচনা করার নেমন্তন্ন পেয়েছি ঠাকুর গোবিন্দ সিংয়ের কাছ থেকে।

প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা হেঁটে দুপুর নাগাদ নারকাণ্ডায় পৌঁছে গেলাম। নারকাণ্ডা, আসলে নাগকাণ্ডা শব্দে অপভ্রংশ। কাণ্ডা শব্দের অর্থ হলো পর্বতের শীর্ষদেশ। নারকাণ্ডার উচ্চতা ৯১৬০ ফিট। অর্থাৎ প্রায় চিনীর সমান। যাবার সময়ে এ জায়গাটা যেমন ঠাণ্ডা মনে হয়েছিল, এখন কিন্তু ততটা মনে হচ্ছে না। নারকাণ্ডার ডাকবাংলোটি চমৎকার। হিমাচলের সব ক'টি ডাকবাংলোই এর আদর্শে তৈরি করা উচিত। তিন টাকা দক্ষিণা দিয়ে যে-কোনো পথচারী এখানে থাকতে পারে। ভোজ্যবস্তুর দামও নিয়ন্ত্রিত আর রন্ধনপটু পাচকও হাতের কাছে পাওয়া যায়।

আশা যদি সফল হবার সম্ভবনা থাকত তবে না হয় বাসের জন্যে আর দু-চার দিন বসে থাকতাম অপেক্ষা করে, কিন্তু দেখলাম বৃথা প্রত্যাশা।

সিমলা থেকে রুগী নিয়ে একটা রিক্‌শা রামপুর গিয়েছিল। ফেরবার সময়ে সেটা খালিই যাচ্ছিল। সেটাকেই আঠারো টাকায় ভাড়া করে নিলাম, ঠ্যোগ পর্যন্ত যাবে।

এক গণ্ডা আণ্ডা সেদ্ধ আর বেশ গোটা কয়েক আপেল পকেটে পুরে ঠ্যোগের পথে রওনা হয়ে গেলাম। দুটো বাজবার বেশ খানিক আগেই পৌঁছেও গেলাম। রাস্তায়

আসতে আসতে দেখতে পেলাম কতকগুলো আলকাতরার পিপে রাস্তার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তাদের জঠর থেকে রাশি রাশি আলকাতরা গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হচ্ছে। সড়কের মেরামতীর জন্যেই এইসব জিনিস পাঠানো হয়। খুব সম্ভব হোলি খেলার জন্য নয়, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের কষ্ট আর জাতীয় সম্পদ নষ্ট এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা!

যদিও যাত্রী নেবার উদ্দেশ্য, কৈলাস কোম্পানীর মোটরবাস এল, নিল কিন্তু বস্তা বস্তা আলু। তা তো নেবেই, মানুষের মাথা পিছু তাদের আয় হবে মাত্র দেড় টাকা। সে জায়গায় আলুর রাহা খরচ মণ পিছু চার টাকা! আলু ফেলে মানুষ নেবে—কোন দুঃখে। কাঞ্চন ফেলে কাঁচ? জনাকয়েক কালোবাজারী মুনাফাখোরকে চৌমাথার মোড়ে ফাঁসীতে লট্‌কালে এ রোগ সারে। কিন্তু তা কি আর হবে?

প্রথমবারে তো অবাক হয়ে চেয়েই রইলাম। আমার বিস্ফারিত নেত্রের সামনে দিয়ে হু হু শব্দে বেরিয়ে গেলো বাস। তারপরে আবার প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। এমনি কয়েকটা প্রতীক্ষা-কণ্টকিত প্রহর পার করে বাস আবার এল। এ বারেও আমার ভয় ছিল প্রচুর। হয়ত এ বারেও পারব না উঠতে। হয়ত জায়গা পাব না। আলুর চেয়ে আমার মূল্য যে খুব কম নয়, সেটা বিচক্ষণ বাসওয়ালার কাছে প্রমাণ করতে পারব না! সাতপাঁচ ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম, কিন্তু না—আমি যথার্থই ভাগ্যবান। বসবার জায়গা পেলাম। অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তনের পালা......

*   *

রাত ন'টায় সিমলা পৌছে গেলাম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই 'ফার গ্রোভ'-এ ফিরে এলাম নায়ার পরিবারের স্নিগ্ধ প্রীতির কবোষ্ণ সান্নিধ্যে।

স মা প্ত

কিন্নর দেশে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

